রাজনীতি ও সমাজতন্ত্র

সন্ধানী

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীপ্রকাশনী
১।১২২, যতীন দাস নগর
কলিকাতা-৫৬

দাশগুপ্ত প্রকাশন
সি ১৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

প্রকাশক :
শ্রীতপনকান্তি দাস
শ্রীপ্রকাশনী
১।১২২, যতীন দাস নগর
কলিকাতা-৫৬

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

অবজ্ঞা আর বঞ্চনাকেই একমাত্র
প্রাপ্য জেনে যারা বিদায় নিচ্ছে
এই ধরাপথকে অশ্রুসিক্ত করে
তাদের হাতে তুলে দিলাম এ-বই।

—সন্ধানী

রাজনীতি ও সমাজতন্ত্র

সমাজ সমীক্ষা

'মানুষের শ্রেষ্ঠ কামনা কী?' এই যদি প্রশ্ন থাকে তবে কারো উত্তর হয় 'সম্পদ', আবার কেউ বলেন 'শান্তি'। কিন্তু 'শান্তির প্রকৃত সংজ্ঞা ও পথ কী?' প্রশ্ন থাকলে খুব কম ব্যক্তিই তার স্পষ্ট উত্তর দেন, কিংবা যে-সব উত্তর দেন সকলের তা মনঃপূত হয় না, অনেকের হয়ত বোধগম্যও হয় না।

ঠিক এমনি 'শ্রেষ্ঠ সমাজের সংজ্ঞা কী?' প্রশ্ন থাকলে অনেকের বক্তব্যে থাকে একটা ধোঁয়াটে ভাব বা অতিদার্শনিকতার অস্পষ্টতা, আবার কেউবা এর উত্তরে বলেন, 'কোন অন্যায়ের প্রয়োজন ও সুযোগ যেখানে নেই অথবা সত্য, সততা ও সর্বক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য সমদর্শীতা যেখানে সতত বিদ্যমান সেটাই শ্রেষ্ঠ সমাজ', অনেকে আরও স্পষ্ট করতে যেয়ে বলেন, 'সত্য, সততা আর সমদর্শীতা থেকেই বিকাশ ঘটে মনুষ্যত্বের আর এর স্থিতি ও ব্যাপ্তি ঘটলে দেখা দেয় প্রকৃত শান্তি ও সমাজের সমৃদ্ধি, কাজেই এ-বস্তু শুধু শ্রেয়ই নয়, যেহেতু এই উপলব্ধির শক্তিই মানুষকে পশুত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, শ্রেষ্ঠ করেছে, তাই এ-শক্তি হারিয়ে ফেললে মানুষ প্রকৃতপক্ষে মানুষ হিসেবেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে।'

মনে হয় এই উত্তরই ঠিক, মানুষ হিসেবে কারো আত্মপরিচয়ে যেমন, তেমনি এই বোধটা তার আত্মবিকাশেরও শ্রেষ্ঠ সম্বল, আর এটাই যেখানে সকল মানুষ নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে ও মেনে চলতে পারে এবং এতে তারা অন্তরের তাগিদও পায় সেটাই শ্রেষ্ঠ সমাজ।

কিন্তু এ-সমাজের ঠিকানা কি? এবং কারা ও কী ভাবে গড়েছেন? এর অবশ্যই সন্ধান হওয়া দরকার। আরও সন্ধান দরকার, সত্য, সততা ও ন্যায় যেখানে নিয়ত দলিত, মথিত আর অন্যায়, অসত্য ও আসুরিক শক্তিই যেখানে গর্বিত ও বিকশিত, সেখানে এমন একটি

সমাজের আত্মপ্রকাশ আদৌ সম্ভব কিনা? যদিও এই শেষোক্ত সমাজই আমাদের পরিচিত, এবং খুঁজতে হবে না কারা এই সমাজ গড়েছেন, গড়ছেন এবং নিয়তই এর বিকাশ ঘটাচ্ছেন তাঁদেরও। সভ্যতার আদি থেকেই এঁরা আমাদের চেনা, সকলের ঘনিষ্ঠ। এঁদের দেখেছি, দেখছি আমরা বহু পরিচয়ে, বিভিন্ন সাজে, তবু একটা খটকা হয়ত এর পরেও আছে,—এঁদের আমরা সকলেই সঠিক ভাবে চিনেছি কী? এ-প্রশ্ন বোধ হয় অবজ্ঞা করার মত নয়। কারণ শ্রেষ্ঠ সমাজের যে-সংজ্ঞা আমরা জানতে পেরেছি সেখানে এই সকল গড়ুয়াদের ভূমিকা কী ও কতটা মানানসই সেটা জানতে হলে সব জানা, সব দেখাটাই নির্ভুল হওয়া চাই। বিশেষ ভাবে খতিয়ে না দেখে কিছু বলাই সংগত নয়। অবশ্য এও ঠিক যে, সত্য সুন্দর ও শান্তির ধারণাই সকলের সমান নয়। সংজ্ঞা আর পথ নিয়েও মতভেদ আছে। যেমন সংসার-ত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের অনেকেরই অভিমত, 'অন্যায় আর অসুন্দর হোল আসক্তিরই পরিণতি। আসক্তি থাকলেই অশান্তি আসবে এবং মনকে অন্যায়ের দিকে নিয়ে যাবে। কাজেই একমাত্র ঈশ্বর সাধনাই হোল সত্য, সুন্দর ও শান্তির শ্রেষ্ঠ পথ। কারণ আর সব চিন্তা ও কর্মেই আসক্তির বীজ নিহিত থাকে।'

কিন্তু এ-বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা অতীব শক্ত। তাছাড়া ঈশ্বর সাধনাও তো এক প্রকার আসক্তিরই পরিণতি; হয়ত কিছুটা কঠিন এবং পার্থিব নয়, কিন্তু পারলৌকিক ত বটেই। তবে এর চেয়েও বড় হোল, এই শক্তি অথবা নির্ভরতা সকলের নেই। এবং সম্ভবত বেশীর ভাগ মানুষের কাম্যও নয়। সবাই মিলে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে শান্তির এই সহজ পথ বেছে নিলে মানব জাতি অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে যেত। কাজেই সৃষ্টিকর্তারই যে এরূপ অভিপ্রায়ে সমর্থন থাকবে এটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বরং 'সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করে জগৎকে আরও সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত করার কাজে মানুষকে নিয়োজিত করাই যে তাঁর উদ্দেশ্য' এর পক্ষে যুক্তি আছে। সুতরাং সংসারত্যাগী সাধু-

সন্তদের বক্তব্য এখানে ধর্তব্য নয়। ওঁদের মত ও পথ দু'টোই স্বতন্ত্র। সংসারবাসীর ওতে কোন লাভ নেই, তারা চায় বেঁচে থাকতে। চায় এগিয়ে যেতে। জীব মাত্রই কামনা তাই। মুছে যেতে বা স্থবির হতে কেউ চায় না। আর শান্তি? সে ত সকলেই চায় এবং চায় একেবারে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। যদিও তা কোন জীবের পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ জরা, ব্যাধি, মৃত্যু—এর হাত থেকে কারো রেহাই নেই। বিজ্ঞান এর আগমন কালকে হয়ত বিলম্বিত করতে পারে কিন্তু বিলুপ্ত করতে পারে না। কাজেই মানুষও এদিক থেকে অসহায়।

কিন্তু প্রশ্ন ত এ নয়। প্রশ্ন হোল, অশান্তির সব হেতুগুলিই মানুষের নাগালের বাইরে কিনা? এবং যেটুকু তার আয়ত্বে এসেছে তা আয়ত্ত করার পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত কিনা? এখানে প্রতিবন্ধক থাকলে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্য। সত্য, সুন্দর ও শান্তির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কারণ শান্তি অন্তত মানুষের বাহ্যিক কামনা নয়; এরই জন্য তারা সারা জীবন সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে বলে অন্তরায় আর একজন মানুষ হলেও তাকে ক্ষমা করা হয় অতীব শক্ত কাজ। মানব চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিক হচ্ছে, ব্যক্তিগত শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ। প্রায় প্রত্যেকেরই সতর্ক চিন্তা ও চেষ্টা আত্মকেন্দ্রীক যতটা সার্বিক ততটা নয়, হয়ত সবটা তা সম্ভবও নয়। কিন্তু কতটা সম্ভব এবং এই আত্মকেন্দ্রীক প্রকৃতিটাই অপর কারো দ্বারা প্রভাবিত বা উদ্দীপিত হয় অথবা হতে পারে কিনা সেটা অবশ্যই জ্ঞাতব্য বিষয়, বিচার্যও বটে। কারণ এরই উপর নির্ভর করছে মানুষের সঠিক পথের নিশানা।

এ কথা ঠিক যে, আজকের বেশ কিছু মানুষ অনুভব করতে পেরেছেন এবং সে কথা বলছেনও—'শান্তি যদি সার্বিক না হয়, অন্তত এর কিছু অংশও যদি সকলে না পায়, তবে ব্যক্তিগত শান্তি বা সম্পদ কিছুই নিরাপদ নয়। এর স্থায়িত্ব, এমন কী নিরাপত্তা সম্বন্ধে কিছুতেই নিঃসংশয় থাকা যায় না।' যদিও এই বোধটা সকলের নেই, সকলের

ভিতর জাগিয়ে দেবার পরিবেশও নেই, ছিলও না কোনদিন। কিন্তু কেন? এ কী অজ্ঞতা? না পরিকল্পিত? এর সঠিক উত্তর অবশ্যই জানতে হবে। জানতে হবে সমগ্র মানবজাতির শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য। একটি সঠিক নিশানা পেতেও এ ভিন্ন পথ নেই। অকারণ অন্ধকারে হাতড়িয়ে ক্ষমতা লাভের তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না।

রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিবর্তন ও জনগণ

মানুষ মাত্রই কিছুটা আত্মসচেতন ও আত্মকেন্দ্রীক। প্রত্যেকের সত্ত্বা স্বতন্ত্র। রুচি, কৃষ্টি আর কামনাও কম-বেশী স্বতন্ত্র। একের সংগে অন্যের মিল হয় কদাচিৎ। কোথাও কিছুটা হলেও সবটা হয় না। স্বতন্ত্রতাই মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যদিও এই মানুষই যখন একজন সামাজিক মানুষ তখন তার এই বৈশিষ্ট্য সবটা রক্ষা পায় না। তা সম্ভবও নয়। এটা সামাজিক নিয়ম এবং মানুষের সমাজবদ্ধতার প্র'য় সমকাল থেকে চলে আসছে। নিয়মটা জোর করে কেউ চালু করেছে তা ঠিক নয়—হয়েছে প্রায় সকলেরই সম্মতিক্রমে বা প্রয়োজনে। অথচ লক্ষ্য করার বিষয়, ঠিক এই সময় থেকে এবং এই নিয়মের আড়ালেই একদল লোক ধীরে ধীরে সমগ্র সামাজিক মানুষের উপর প্রভুত্ব করার পথ করে নিয়েছে। কিন্তু এরা কারা? এবং কোন যুক্তি অথবা শক্তির প্রভাবে এরা এই প্রভুত্বের পথ পেল এ-তথ্য অবশ্যই জানতে হবে।

একথা ঠিক যে মানব সমাজে রাষ্ট্রকর্তারাই মূল গায়েন। সামন্ততন্ত্র থেকে আজ অবধি কার্যতঃ এঁরাই সমাজে সর্বেসর্বা। মুনি, ঋষি বা ধর্মগুরুদের প্রভাব এককালে যদিও বা কিছুটা ছিল কিন্তু সে-প্রভাব কোন ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রকর্তাদের প্রভাব ছাড়িয়ে যায়নি। রাষ্ট্রসীমাও নিরূপিত হয়েছে এঁদেরই প্রয়োজন বা ক্ষমতার হ্রাস-

বৃদ্ধিতে। প্রায় সর্বত্রই এককালের সীমা আর এককালে মেলে নাই, এটাই নিয়ম। এ-নিয়ম যুক্তিযুক্ত কিনা এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ, সম্মান বা অভিমত স্বীকৃত কিনা সে-প্রশ্ন কোথাও কিছুটা দেখা দিলেও তা বাধা হয়নি, যেমন হয়নি ভারত ও ভারতবাসীর ক্ষেত্রে। হয়নি জার্মানি, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম ও আরও বহু ক্ষেত্রে। ভারতের ভৌগোলিক সীমা পূর্বে যা ছিল আজ তা নেই। সেদিনের ভারতবাসীর অনেকেই আজ পরবাসী। আর মাত্র কয়েক ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতেই এটা সম্ভব হয়েছে। হয়ত আরও কিছু লোক এঁদের সাহায্য করেছেন, কিন্তু বাকী সমগ্র দেশবাসীর এটা অবশ্যই মেনে নিতে হয়েছে। কাজেই সীমা, সমাজ, অর্থনীতি, শান্তি, সমৃদ্ধি এর কোন কিছুই বোধ হয় দেশের সাধারণ মানুষের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। দেশের উত্থান পতনেও জনসাধারণের বড় কোন ভূমিকার আন্তরিক স্বীকৃতি নেই। তারা বড়জোর বলতে পারে 'কী হওয়া উচিৎ' এই অবধি।

নীতি হিসেবে এ এক যুক্তিহীন অবস্থা। তবে এর কোন গুরুত্ব যে নেই তার কারণ, কোনটা যুক্তিযুক্ত আর কোনটা যুক্তিহীন এ-তত্ত্ব জনগণ জানলেও এবং যুক্তিহীন বিষয়ে তারা প্রতিবাদমুখর হলেও রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা আরও বেশী জানেন, কী কৌশলে তাদের নিবৃত্ত করা যায়। কোটি কোটি মানুষ এই কৌশলের শিকার। কোন তত্ত্ব থেকে এ-কৌশল কতটা শক্তি পেয়েছে সেটা তর্কের বিষয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ কোন তত্ত্ব বা তন্ত্র থেকেই যে এই কৌশল এড়াবার কিছুমাত্র শক্তি পায়নি এতে একটুও মিথ্যা নেই।

কিন্তু উত্তেজিত মন কোন সমাধানের হদিস পায়না। এটা পেতে হলে মনকে শান্ত রাখতে হয়। চেতনাশক্তিকে যুক্তিমুখী করতে হয়। এবং অপরের প্রভাবমুক্ত থেকে সব কিছুই বিচার করতে হয়। এটাই যুক্তিগ্রাহ্য একমাত্র পথ। যা কিছুই ঘটে থাক কোথাও তার সবটাই 'অন্যায় ও অযৌক্তিক' এবং কোথাও সবই 'ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ' কিংবা কোথাও সবই 'অস্বার্থক' বা 'উদ্দেশ্য প্রণোদিত' আর কোথাও

সবই 'স্বার্থক' বা 'সততার ফল' বলে যা কিছুই প্রকাশ পাক তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া চলে না। সার্থক কোন নজির থাকলেও সেটাই 'চূড়ান্ত' এ ধারণাও যুক্তিসিদ্ধ নয়। বরং এটাই যুক্তিগ্রাহ্য যে, সব কিছুরই কিছু-না-কিছু মূল্য আছে এবং সব অভিজ্ঞতাই কাজে লাগে। সঠিক কোন নিশানা পেতে গেলে কোন কিছুই তাচ্ছিল্য করা চলে না। কারণ শেষ সত্য যে কী আজও তা জানা যায়নি। আর এটা না জেনে কোন কিছুর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে যাওয়াও অর্থহীন।

আসলে মানব চেতনা ও তার গতির শেষ সীমা আমরা সবটাই জেনে ফেলেছি, এই অহংভাব যদি না থাকে—তবে তার সমাজের চূড়ান্ত রূপ কী হবে তা বলার অধিকার আমাদের কিছুতেই অর্জিত হতে পারে না। বড়োজোর বলা চলে, আজকের মানুষের অথবা আরও কিছুকালের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার স্বার্থক পরিণতি ঘটবে অমুক ব্যবস্থার আশ্রয় নিলে, কিংবা এও হয়ত বলা চলে, কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণী বিশেষ নয়, সমাজের সকল মানুষই শান্তি ও সমৃদ্ধির চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ পাবে অমুক কর্মসূচী গ্রহণ করলে। কিন্তু এ-কথা কিছুতেই বলা চলে না যে, এটাই একমাত্র পথ বা শেষ লক্ষ্য। প্রস্তর যুগের মানুষ যেমন রকেট, আণবিক শক্তি কিংবা ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের হদিস পায়নি, কল্পনাও করেনি, অথবা সামন্ত যুগে যেমন গণতন্ত্রের স্বরূপ জানা সম্ভব হয়নি, তেমনি আজকের মানুষও অনন্তকালের মানুষের গতিসীমা বা চরম লক্ষ্য নির্ণয় করতে পারে না। মানব প্রগতি এগিয়ে চলবে নিয়ত তার গতি বৃদ্ধির দিকে আর তারই চিন্তারাজ্যে থাকবে একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা স্থায়ী হয়ে, এ কিছুতেই যুক্তি সমর্থিত নয়, এই স্তব্ধতা মানুষের কাম্যও নয়। আর বেশীর ভাগ মানুষই চায় জড় সমাজের পরিবর্তন ও পরিশুদ্ধি। যদিও এর পথ নিয়ে বহুজনেরই ভিন্ন ভিন্ন মত গড়ে ওঠে এবং এই গড়ার কাজে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা নেন তাঁরা

প্রত্যেকেই নিজের মতকে ন্যায্য ও চূড়ান্ত বলে মনে করেন। সর্দার, সামন্ত, গণতন্ত্র মায় সমাজতন্ত্র অবধি-এর কোথাও নিজের ধারণার বাইরে আর কোন কিছুই ন্যায্য বলে বিবেচিত হয়নি। আর এদিক থেকে সব চেয়ে জোরালো যুক্তিই হোল কমিউনিস্টদের। এঁরা সর্বজ্ঞ।

কিন্তু 'এইই শেষ, এরপর আর কিছু নেই' কিংবা 'এটাই চূড়ান্ত' সমগ্র মানুষের চেতনার সামনে এই ধরনের যেকোন উক্তিই বোধ হয় অত্যন্ত ভ্রান্ত এবং বিভ্রান্তিকর। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত মানলে একে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলাও চলে। কারণ 'আমিই সর্বজ্ঞ' মার্ক্স-দর্শনের এই অহংভাবটা যে কতটা অসার ভূতাত্ত্বিক ও প্রাণীতত্ত্ববিদদের বক্তব্য থেকে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ সমীক্ষা ও গবেষণার ফল থেকে এঁরা বলেছেন, "মানব ইতিহাসের মাত্র কয়েকটি বছরই অতিক্রান্ত হয়েছে, অনাগত আরও লক্ষ লক্ষ কি কোটি কোটি বছরের ইতিহাস এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে।" অন্তত এটা যে থাকতে পারে এবং থাকাই সম্ভব তাতে কেউই সন্দিহান হননি। কাজেই 'মানব জীবনের সব সত্যই জানা হয়ে গেছে' এই সুর যদি কারো উক্তিতে ধ্বনিত হয় তবে তার চেয়ে অসত্য আর কী হবে ? সত্য উপলব্ধি মানেই শেষকে জানা। চিন্তার দীনতা বা অসত্যপ্রীতি না থাকলে এই শেষ জানার আস্ফালন আর কেউ করতে পারে কী ?

অবশ্য সাধারণ মানুষের কাছে তত্ত্ব আর যুক্তি সবই প্রায় সমান। যদিও কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব যাঁরা করেন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য সাধারণ মানুষ নয়—লক্ষ্য প্রতিপক্ষ। অর্থাৎ যাঁরা ওটা ছিনিয়ে নিতে বা ভাগ বসাতে পারেন। এঁদের ধোঁকা দিতে পারলে জনগণকে সহজেই বোকা বানান যায়। কিন্তু এর জন্য যত তত্ত্ব আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়েছে তার ভিতর কমিউনিস্ট তত্ত্বই বোধ হয় সব থেকে জুতসই। এর প্রমাণও আজ সর্বত্র। তবে কিছুটা সূক্ষ্ম, সহজে

নজরে আসে না। কিন্তু ঘায়েল হচ্ছে প্রায় সকল প্রতিপক্ষই। আর জনগণ? কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকদের বহু বক্তব্যের ভিতর এদের জন্য আছে 'কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ভিন্ন মানুষের আত্মবিকাশ ও উন্নততর জীবন প্রবাহের অবকাশ নেই', এবং 'মানুষের প্রধান কামনা যে শান্তি আর সমৃদ্ধি তাকেও চূড়ান্ত শিখরে তুলে দিতে পারে একমাত্র কমিউনিস্ট শাসিত সমাজই।'

বঞ্চিত মানুষের কাছে এ-চিত্র অবশ্যই লোভনীয়। আব বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে লোভের তীব্রতা স্বভাবতই কিছু বাড়ে—অন্য সব যুক্তিই স্তব্ধ হতে চায়। বঞ্চনাই এর মূল কাবণ। ধনের ক্রিয়া, বিশেষ করে তার শোষণশীল অংশের চরিত্রটা ঠিক কী, সেটা এদের কাছে স্পষ্ট নয় বলেই শুধু 'ধনী ও বণিকরাই যে তাদের শোষণ করে থাকে' এই উক্তিকে তারা একমাত্র সত্য বলে মেনে নেয়। নেওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ অন্য অভিজ্ঞতা তাদের নেই। আর কোন মানুষ যদি বুঝতে শেখে যে সে সত্যই শোষিত হচ্ছে এবং শুধু এটুকুই দেখে ও শুনতে পায় যে, তার সেই বিশেষ সমাজটিতেই কেবল এই শোষণ কার্য চলেছে,—অন্য এক বা একাধিক সমাজে এর অস্তিত্ব নেই, তবে অবশ্যই সে এর পরিবর্তন চাইবে। আর এতে অপবের সমর্থন পেলে এমন ব্যস্ততার সংগে চাইবে যে, অন্য কিছু জানবার বা এর পবিণতি নিয়ে চিন্তা করবার অবকাশই থাকবে না। অথচ প্রায়শই দেখা যাবে, মার্ক্সভক্তদের লোলুপ দৃষ্টি থাকে ঠিক এই দিকেই। মানুষের বিচারবিমুখ উত্তেজিত অবস্থাকে এঁরা অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ হিসেবেই গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সুস্থ চিত্তকে এঁরা সমীহ করতে পারেন না—করেন ভয়, আশ্রয় খোঁজেন অসুস্থ চিত্তে। ১৯৬৭-৭১ এই সময়কার পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে এই বক্তব্যের সমর্থনে প্রচুর তথ্য চোখে পড়বে।

অবশ্য মার্ক্স শিষ্যদের সকল উক্তির অর্থ উদঘাটন করা অতি শক্ত কাজ। এঁদের অর্থনীতিটা আরও জটিল। অথচ অন্য সমগ্র নীতির

তুলনায় অর্থনীতির সংগেই মানুষ বেশী জড়িত। এর প্রভাব কেউ এড়াতে পারে না। কিন্তু এর স্বরূপ যদি অজ্ঞাত থাকে তবে কে প্রকৃত শোষক আর কে নয়, তার সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এ-দিক থেকে বরং অকমিউনিস্ট সমাজের অবস্থাটা কিঞ্চিৎ সরল। সেখানে শ্রেণী প্রভাব, শ্রেণী স্বার্থ, বা শ্রেণী কর্তৃত্বের কৌশল লোকে চেষ্টা না করেও কিছুটা দেখতে পায়। শোষণ করার পদ্ধতিটাও সকলে কম বেশী জানে। কিন্তু কমিউনিস্ট অর্থনীতিতে সঞ্চয়, বিনিয়োগ, বণ্টন, এর কোন ক্ষেত্রেই জনগণের প্রবেশাধিকার নেই। সবটাই হয় সরকারী আমলাদের মাধ্যমে এবং এক উচ্চতর কর্তৃত্বের নির্দেশে। সুতরাং এর প্রকৃত চরিত্র অবশিষ্ট দেশবাসীর জানবার কথা নয়, তার প্রয়োজনও কর্তারা স্বীকার করেন না। তাঁরা বরং বলেন, 'অকমিউনিস্ট সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হোল শ্রেণী পুষ্টির হাতিয়ার। কারণ ওখানে সঞ্চয়, বিনিয়োগ সবই হয় ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে। আর কমিউনিস্ট সমাজে হয় সর্বসাধারণের কল্যাণের নিরিখে। কাজেই গণস্বার্থ বা গণ-স্বাধীনতার প্রকৃত যে মূল্য তা শুধু কমিউনিস্ট সমাজের জনগণই ভোগ করতে পারে।

কথাগুলো শুনতে চমৎকার। যুক্তির ভঙ্গিমাও বেশ আকর্ষণীয়, কিন্তু ভিতরের আদত বস্তু কী? এক দিকে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীর জোট ও তার মদতদার রাষ্ট্রশক্তি আর একদিকে জনা কয়েক রাষ্ট্রকর্তা এবং তাদের আমলাকুল,—পার্থক্যত এখানেই? কিন্তু তাই যদি হয় এবং জনগণ এর কোথাও যদি গ্রাহ্যের মধ্যে না থাকে, অর্থাৎ একের উপর অন্যের কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব করার প্রধান হাতিয়ার যে অর্থনীতি, তার সমগ্র দিকের সব কর্তৃত্ব থাকে কেবল কয়েক ব্যক্তিরই জিম্মায়, তবে তাঁদের ভিতর কোন পার্থক্য থাকলেও থাকবে শুধু তাঁদের সততায়। আর এই সততার বিচার করতে বসে এঁদের একদলকে 'অক্ষম বা অসৎ' এবং আর এক দলকে 'সম্পূর্ণ সৎ ও বিরূপ ধারণার ঊর্ধে', অথবা একের 'ক্ষমতা ও ভোগলিপ্সাটাই মুখ্য' এবং অন্যের ভিতর এর

'লেশমাত্র নেই'-যদি ধরে নেওয়া হয় তবে মনে করার যুক্তি মেলে ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠাও তারা উল্টে দেখার সুযোগ পায়নি।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের স্বরূপ বর্ণনাকালে কালমার্ক্স একস্থানে বলেছিলেন 'কমিউনিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠা পেলেই এই দ্বান্দ্বিকতার অবসান হবে।' তাঁর মতে 'যতদিন শ্রেণী সংঘাত থাকবে, দাসরা প্রভুদের বিরুদ্ধে, প্রজারা সামন্ততন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকরা শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামলিপ্ত থাকবে ততদিনই সামাজিক স্ববিরোধীতা থাকবে। শ্রমিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে এই স্ববিরোধিতা স্তিমিত হয়ে যাবে।' যদিও গত ৫০ বছর যাবৎ তথাকথিত শ্রমিক রাষ্ট্রগুলিই এ-বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। তবে কমিউনিস্ট শাসনের নতুনত্ব বা বিশেষত্ব এই যে, অন্য শাসকের অবলম্বন যেখানে জনগণের শান্তি, সমৃদ্ধি ও তার গতির প্রতিশ্রুতি, সেখানে কমিউনিস্টদের প্রতিশ্রুতি সকল দায়িত্ব আর কর্তৃত্ব ওই জনগণের হাতেই ন্যস্ত করা। কাজেই এর আকর্ষণ স্বভাবতই কিছু বেশী। যদিও এর পরিণতি ঘটে আত্মসমর্পণে। কারণ গণতন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট স্থায়ী কর্তৃত্ব পেতে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনগণের দ্বারস্থ হতে হয় এবং দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালিত হলে তবেই টিকে থাকা ও সে-দ্বারে পুনঃ উপস্থিতি সম্ভব হয়। কিন্তু কমিউনিস্ট শাসনে এর প্রয়োজনই হয় না। এই ব্যবস্থাটাই সেখানে 'বুর্জোয়া'—তাই পরিত্যজ্য। আদিতে একবারই মাত্র এঁদের জনসমক্ষে উপস্থিত হতে হয় এবং উজাড় করা সমগ্র আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির আবেগে জনগণকে আকৃষ্ট করতে হয়। কিন্তু একবার এ-ফাঁদে পা দিলে আর তাদেব পরোয়া করার দরকার পড়ে না। কারণ এখান থেকে বের হওয়ার রাস্তা আর কখনই উন্মুক্ত হয় না। ঘটনা-নির্ভর ইতিহাস এখানে আর কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি।

বস্তুত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রমানুষের উপর কর্তৃত্ব করতে যত কৌশল এ যাবৎ প্রয়োগ করা হয়েছে, এই কমিউনিস্ট কৌশল তার ভিতর

সর্বশ্রেষ্ঠ, আধুনিকতম এবং নিশ্ছিদ্র। এর ধারও অনেক তীক্ষ্ণ। কাজেই জনগণের দৃষ্টি সহজেই নিবদ্ধ হয়। তবে কাউকেই উপেক্ষা করা চলে না। সেটা যুক্তিযুক্তও নয়। আসলে এঁরা প্রত্যেকেই প্রায় এক শ্রেণীভুক্ত। যার সংগে জনগণের মিল খোঁজা নিষ্ফল। কোথাও একে অপরের পরিপূরক কল্পনা করলেও দুয়ের স্বার্থ ও লক্ষ্য ভিন্ন। জনগণের ভিতর থেকে কারো হাতে শাসন ক্ষমতা গেলেও তিনিও কয়েক দিনেই একজন সম্পূর্ণ শাসক হয়ে ওঠেন। এর ব্যতিক্রম সহজে চোখে পড়ে না। যে বা যাঁরাই রাষ্ট্রক্ষমতায় বসুন, তাঁদের কাউকেই আলাদা করা চলে না। 'শাসক' এই জাতীয় একটি শব্দের উৎপত্তি ঘটেছিল হয়ত সর্দার নিয়ন্ত্রিত সমাজেই প্রথমে। পরে সামন্ত বা রাজতন্ত্রে এ-শব্দ স্পষ্ট হয়েছে, প্রভাব বেড়েছে। এ-প্রভাব কেবল শাসন ও শোষণেই নিবদ্ধ থেকেছে তাই নয়, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দৈহিক শক্তির প্রভাবও এর সংগে যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ঠেঙানো, শাসানো, শোষণ ও শাসন প্রভৃতি ক্রিয়ার সংগে শাসক শব্দের যে একটি আত্মীক সম্বন্ধ থাকা খুবই সম্ভব, এ-কথা অস্বীকার করা শক্ত। অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠছে, গণতন্ত্র এবং বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের সংগে এর সম্বন্ধ কী? প্রশ্নটা স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে ন্যায্য। আর কিছুটা সরল বলে প্রায় প্রত্যেকেই এ প্রশ্ন করেও থাকেন। যদিও একটু সতর্ক থাকলে এও দেখা যেত, একদল ঝানু ব্যক্তির দাঁতের ফাঁকে এই প্রশ্নেই একটি বিশেষ হাসিও ফুটে উঠেছে। এঁদের কথা পরে। কিন্তু এখানে পাল্টা প্রশ্নও ত আছে—সম্বন্ধ নির্ভর করে কী কেবল তত্ত্ব বা তন্ত্রের উপরই? তত্ত্ব ও তন্ত্র নির্ভর বাইরের অতিঘন সম্বন্ধও ত অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আসলে ভুয়ো। কাজেই 'গণতন্ত্র' বা 'সমাজতন্ত্র' শুধু মাত্র এই বাক্য দুটিকে আশ্রয় করে না থেকে ব্যক্ত তথ্যের চরিত্র যাচাই করলে তবেই হয়ত এর একটি যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর পাওয়া সম্ভব। অন্য আর সব শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে এই দুই প্রস্ত তাত্ত্বিক শাসনের মূল প্রভেদ কোথায় ও কতটুকু এবং সাধারণ মানুষের উপর তার প্রতিক্রিয়া

কী? ব্যক্ত তথ্য থেকে তার সন্ধান পাওয়াও কিছুমাত্র শক্ত নয়। যদিও তত্ত্বপ্রেমীরা এর সঙ্গে একমত নন। কিন্তু যাঁরা এ সন্ধান করেছেন তাঁরা স্পষ্টই দেখেছেন, তাঁদের উদ্যোগ পর্ব শেষ হওয়ার আগেই ওই প্রভেদটা আপনা থেকেই মিলিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, যে-প্রভেদ অন্তত সাধারণ মানুষ কামনা করে এবং যে-প্রভেদ সম্বন্ধে নিয়ত প্রচার কার্য চলে, একটু সন্ধান করলে দেখা যাবে সবচেয়ে বেশী প্রভেদ ঘুচেছে সেখানেই। এটা সকলের চোখে ধরা পড়েনি বা এই আগ্রহ সকলের জাগেনি বলেই সত্য তার গুরুত্ব হারাবে তা নয়। তাছাড়া রাজতন্ত্র প্রভৃতির স্বরূপ জানতে মানুষের হাজার হাজার বছর কেটেছে। আর রাজনৈতিক দলের জন্মই ত প্রায় সেদিনের।

অবশ্য সত্য জানার আগ্রহ কিছু জেগেছে এবং রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে দলতন্ত্রীদের সত্যই কোন মৌল প্রভেদ আছে কিনা সে-সন্ধানের ঝোঁকও বেড়েছে। তবে বেশীর ভাগ মানুষ আজও রাজনৈতিক দল প্রভাবে অভিভূত। এবং এঁদের বিশ্বাস 'রাজনৈতিক দল ভিন্ন জনগণ আকাঙ্ক্ষিত কোন শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠতেই পারে না। রাজতন্ত্র কিংবা জঙ্গীতন্ত্র খতম করতেও যে-কোন একটি রাজনৈতিক দল অপরিহার্য'। আর কমিউনিস্টদের যুক্তি ত এখানে কোন সন্দেহকেই আমল দেয়নি। অবশ্য রাজতন্ত্র বা জঙ্গীতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে রাজনৈতিক দল যতটা স্পষ্ট হতে পেরেছে রাজনৈতিক দলের বিকল্পটা তা হয়নি বলেই হয়ত এই সব যুক্তিবাগীশরা শক্তি পাচ্ছেন। কিন্তু ধৈর্য ধরে একটু কান পাতলে একথা অনেকেই শুনবেন, বিকল্পের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে এবং তার সন্ধানও চলেছে। আর এটা যেদিন আরও স্পষ্ট হবে সেদিন ওই যুক্তিবাগীশরাও হয়ত সংশয়মুক্ত হবেন।

বাস্তব ঘটনা তথা ব্যক্ত তথ্য থেকে সত্য যাচাইয়ের সহজ অবলম্বন আর নেই। সত্যকে চিনে নিতে হলে ঘটনার যথার্থতা যাচাই অধিক যুক্তিযুক্ত। ঘটনা প্রমাণ করেছে, মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করার প্রধান অবলম্বন হোল রাষ্ট্রক্ষমতা।

অন্যত্র প্রতিষ্ঠা পেতেও এ-ক্ষমতায় মদতদান তার সহজ পথ, আর এই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্যই হয়েছে রাজনৈতিক দলের জন্ম। যদিও পরাধীন দেশে এর চরিত্র থাকে স্বতন্ত্র। জনমানসে এর ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে ত্রাতা রূপে। কারণ শেষ পরীক্ষা তখনও বাকী থাকে। কিন্তু স্বাধীন দেশে কর্তৃত্বই হয় একমাত্র সাধনা। বিরোধী দল থাকলে হয়ে ওঠে প্রায় 'শত্রুপক্ষ', সমালোচকরা হতে চায় 'দুষ্টগ্রহ'। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকার পেলে ভিতরেই স্বার্থের সংঘাত দানা বাঁধতে থাকে। নেতা ও কর্মীর ভিতর দূরত্ব বাড়ে, ক্ষমতার কাড়াকাড়ি তীব্র হয়ে ওঠে। আর সবশেষে এটা বাইরেও প্রতিফলিত হয় এবং জনগণকে জড়িয়ে তাঁদের কাছ থেকে মূল্য আদায় করতে থাকে। একে প্রতিরোধ করা শক্ত। কারণ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর দলীয় কর্মী ও ঘনিষ্ঠ সমর্থকদের খুশী-অখুশীর সম্বন্ধটা শুধু তত্ত্বকথা আর আশ্বাসের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না, নগদ প্রতিদান আদায়ে তৎপর হয়ে ওঠে। এ-ক্ষেত্রে এক যাত্রায় পৃথক ফল মেনে নেবার মত মানসিকতা খুব কম ক্ষেত্রেই থাকে। তবে এ-তত্ত্ব কোন রাজনীতিক কর্তৃক স্বীকৃত নয়। বিশেষ করে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজনীতিকরা এমন তথ্য প্রত্যক্ষ করলেও সত্য বলে স্বীকার করতে পারেন না। ক্ষমতা এবং তার সম্ভাব্যতার সেটা পরিপন্থী। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সরল চোখে যেটা সত্য, ওই বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিব্য দৃষ্টিতে সেটাই হয়ে পড়ে অসম্ভব রকম অসত্য। স্বাধীন ভারতে যে-সব ঘটনা ঘটেছে ও নিয়ত ঘটছে তাকে মতবাদমুক্ত নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করলে হয়ত এ-বক্তব্যের যথার্থতা আর একটু স্বচ্ছ হবে। এবং অন্য তন্ত্রের সঙ্গে তথাকথিত গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের প্রভেদ বা একাত্মতাও পরিষ্কার হবে।

১৯৪৭—১৯৬৭ এই বিশ বছর কংগ্রেস দলই ছিল সর্ব ভারতের শাসক দল। কী করে ভারত স্বাধীন হোল এবং তার ভিতর গলদ কিছু ছিল কিনা আর ভুল ভ্রান্তিও যদি কিছু থেকেই থাকে তবে তার সব দায়িত্ব শুধু কংগ্রেসের কিনা সে-প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কারণ সেদিনের সর্ব-

ভারতীয় রাজনীতি, বিশেষ করে মুসলিম লীগের ভেদনীতি, কোন কোন ব্যক্তি ও দলের পূর্বাহ্নেই দেশ বিভাগের পরিকল্পনা ও তার জন্য দখলদার শাসকদের কাছে তদবির বা তাদের মদত দান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতি আর সর্বশেষে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে সাম্প্রদায়িক হানাহানি—এই সব কিছুকেই এর জন্য আলোচ্য-ভুক্ত করতে হয়। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান এবং এই বৃহৎ রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণে সক্ষম একটি যোগ্য দল হিসেবেই যে কংগ্রেসের উপর এ-দায়িত্ব বর্তেছিল এটা যুক্তিগ্রাহ্য সত্য। আর কংগ্রেস যে এর জন্য অপ্রস্তুত ছিল তাও ঠিক নয়।

অনেক ঘাত প্রতিঘাতের বাধা অতিক্রান্ত হয়ে কংগ্রেস তার শেষ লক্ষ্য স্থির করেছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। আর স্বাধীন ভারতের অধিবাসীর জন্য স্থির হয়েছিল সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বা শান্তি সমৃদ্ধি ও সমদর্শীতা। ব্যক্তিগত মুনাফার আশায় যারা এর সংগে পিরিত করতে এসেছিল তারা তাদের হিসেব মতই সরে পড়েছিল। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রভাবে লোক চরিত্র যে ভাবে গড়ে ওঠে তাতে বৃহৎ কোন দল বা সঙ্ঘে এমনটি ঘটেই থাকে। কিন্তু প্রায় প্রথম থেকে শেষ অবধি যাঁরা একে বাঁচিয়ে রেখে দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পোঁছে দিয়েছিলেন এবং স্বাধীন ভারতের শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা যে সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন ও বরেণ্য ব্যক্তি ছিলেন একথা অন্তত সুস্থ কোন মানুষ অস্বীকার করবেন না। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, রাজাগোপালাচারী, আচার্য কৃপালনী, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি ব্যক্তিদের আত্মস্বার্থবাদী, অক্ষম কিংবা অবিবেচক বলে কেউ কখনই মনে করেনি। আর এঁরা যে একদিন স্বাধীন ভারতের রাজা-উজীর হবেন এবং সেই আশাতেই জীবনের অমূল্য সময়, সম্পদ ও পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এ-ধারণাও কিছুমাত্র যুক্তিসিদ্ধ নয়। কিন্তু পরাধীন ভারতে

স্বাধীনতা সংগ্রামরত এই সকল সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য ব্যক্তিরাই যখন শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হলেন তখন আর পাঁচজন শাসক থেকে এঁদের কী আলাদা করা গেছে? জনগণ এবং এই সব শাসকদের ভিতর দুটি ভিন্ন ধর্মী শ্রেণীর একটি ভাবমূর্তিই কী ব্যক্ত হয়ে পড়েনি? সম্ভবত খুব কম ভারতবাসীই বলবেন 'না, দুয়ের ভিতর কোন ব্যবধান ঘটেনি।'

অথচ এই ব্যবধান যে এঁদের ইচ্ছাকৃত ছিল তাও নয়। আসলে এও সেই শাসক সংজ্ঞারই প্রতিক্রিয়া। এখানে যে কোন পরিবর্তন—এমন কি একান্ত আকাঙ্ক্ষিত বা কঠিন শোণিত মূল্যে অর্জিত পরিবর্তন শেষেও এর আবেগময় মুহূর্ত শেষ হওয়ার সংগে সংগে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক দাবীর সংগে বাস্তব বুদ্ধির যে ঘনিষ্ঠতা ঘটে এ তারই পরিণতি। সম্পূর্ণ শুভবুদ্ধির নাও যদি হয় কিন্তু সমদর্শী চেতনার এখানে পরাজয় ঘটেই, এর মূলে থাকে প্রধানত শাসনযন্ত্রের সংগে নানা স্তরের সুযোগ সন্ধানী স্বার্থের আতাত। সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ভিন্ন সর্বাধিক শক্তিশালী কোন রাষ্ট্রনায়কের পক্ষেও দীর্ঘকাল এ আঁতাত ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এবং সম্ভব নয়, শাসক ও শাসিত এই দুটি চরিত্র সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করা। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা এবং এ-প্রসংগের সেটাই সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—আত্মত্যাগ ও আত্মপীড়নের এতখানি ঐতিহ্য সত্ত্বেও যে ক্ষেত্রে এই সব কংগ্রেসী রাষ্ট্রনায়ক আর জনগণের ভিতর দুটি ভিন্ন স্বার্থ ও শ্রেণী চরিত্র রুদ্ধ হয়নি এবং এঁদেরই নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থার সংগে জনসাধারণ একাত্ম হতে পারেনি, সেখানে অন্য কোন শাসক বা এমনিই আর একটি দল সফল হবেন এটা যুক্তিগ্রাহ্য কী? সভ্যতার ইতিহাস হাজার হাজার বছরের, আর গণ নির্বাচিত রাষ্ট্র পরিচালকদের আবির্ভাবও বহুকালের কিন্তু শাসক তথা, রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তি ও জনসাধারণ যে দুটি আলাদা শ্রেণী নয়, এই তথ্যই কী কেউ তুলে ধরতে পেয়েছেন? বরং ঘটনা এটাই প্রমাণ করবে, শ্রেণী শাসিত

সমাজে রাষ্ট্রকর্তৃত্বে যাঁরাই থাকুন, শাসক ও শাসিত এই তুটি শ্রেণী-চরিত্র সেখানে কিছুতেই প্রতিরোধ করা যায় না। হয়ত উৎকোচ, উৎপীড়ন বা পরিকল্পিত প্রচারে এর বিকৃতি ঘটানো যায়, অস্বীকার বা ক্ষেত্র বিশেষে সাময়িক স্তব্ধ রাখাও যায়, কিন্তু কিছুতেই এর অবশ্যম্ভাবীতাকে থামিয়ে দেওয়া যায় না। কোন একজন বিশেষ ব্যক্তি বা দলের ভাল মন্দ বা যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রভাব এক্ষেত্রে একেবারেই সীমিত। সমগ্র বিষয়টিই প্রভাবিত এবং তার পরিণতি প্রতিফলিত হয় 'শাসক' ও 'শাসিত' এই শব্দ তুটির উৎপত্তিগত অর্থ আর তার সংগে শাসন যন্ত্রের সম্বন্ধ থেকে।

গান্ধীজী বিষয়টি জানতেন। দীর্ঘ দিনের সাধনায় ও রাজনৈতিক জীবনের মূল্যবোধ থেকে তিনি গণচরিত্র, রাজনীতিকদের চরিত্র এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনীতিকদের প্রশাসনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত চরিত্র অত্যন্ত নিখুঁত ও নির্ভুল ভাবে দেখতে পেরেছিলেন বলেই স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে দিতে বলেছিলেন। 'সর্ব জনের প্লাটফরম থেকে কংগ্রেসকে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিণত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল' এই অভিমত গান্ধীজীর সমগ্র জীবন চরিতের সঙ্গে আদৌ সংগতিপূর্ণ নয়, বরং রাজনীতির অপরিহার্য শ্রেণী চরিত্রের কুফল থেকে মুক্ত সার্বিক জনমতনির্ভর একটি সামাজিক দলের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই যে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে বেশী সংগতিপূর্ণ, এর পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু তা হয়নি, এবং হয়নি তারও একমাত্র হেতু রাজনীতির গতির সঙ্গে এ-চিন্তার কোন সংগতি নেই।

বলা হয়ে থাকে, 'প্রগতিশীল মানব সমাজের সামনে রাজনৈতিক দলই হচ্ছে আলোর বর্তিকা।' কিন্তু কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে নকল করে এখানে বলা যায় এ-বর্তিকা পথে না পড়ে যদি চোখে পড়ে তবে কাউকেই হোচট্ না খাইয়ে ছাড়ে না। আদত কথা, রাজনৈতিক দল কতটা পথ দেখায় আর কতটা চোখ, অর্থাৎ চেতনা

ধাঁধায় সেটা জানা শেষ হলে একজন ব্যক্তিশাসকের সঙ্গে কোন একটি দলশাসকের ব্যবধান সহজেই ঘুচে যায়। তবে এ থেকে কোন শিক্ষা নিতে গেলে সব জানাটাই নির্ভুল হওয়া চাই।

গণস্বার্থ ও দলীয় গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের হাঁকডাক আজ বিশ্বজোড়া। গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে কম-বেশী সবাই ব্যস্ত। সকলে সজাগ ও সতর্কও। যেন 'সামাজিক ন্যায় রক্ষার এমন অবলম্বন আর নেই' এক দল মানুষের এমনিই এক প্রগলভ আস্ফালন বা আবেগ। এর ভিতর বিশেষ কয়েকটি দেশে আবার এই হাঁকডাক আরও বেশী। অথচ একটুখানি সতর্ক দৃষ্টি মেললেই দেখা যাবে, শ্রেণীস্বার্থ, শ্রেণীপ্রভাব, শ্রেণীকর্তৃত্ব এবং শ্রেণীবিশেষেব প্রভুত্ব করার সুযোগ ও ক্ষেত্ররাজতন্ত্র বা নিন্দিত আরও কোন কোন তন্ত্রে যতটা ছিল, কিছু কৌশলগত উৎকর্ষতাব প্রভাবে এই গণতন্ত্রে তা আরও বহুগুণ বেড়েছে। যদিও এর পরেও রাজতন্ত্র বা ওই জাতীয় অন্য কোন তন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যুক্তি মেলে না। কিন্তু শুধুমাত্র একের অযোগ্যতার যুক্তিতেই অন্যটি যোগ্যতার দাবী করবে এর স্বপক্ষেই কী কোন যুক্তি মেলে ?

সংবাদে প্রকাশ সার্থক গণতান্ত্রিক দেশ ইংল্যাণ্ডের বেসরকারী মোট সম্পত্তির ৩/৪ অংশের মালিক সমগ্র অধিবাসীর মাত্র পাঁচ ভাগ এবং আমেরিকা সহ অন্যান্য বেশীর ভাগ উন্নত গণতান্ত্রিক দেশের চিত্রটাও নাকি এই একই প্রকার। এর সঙ্গে ভারত অবশ্য তুলনীয় নয়। কারণ এদেশ অনুন্নত এবং শুধু গণতন্ত্র নয়, স্বাধীন সত্তাটাই এর প্রায় সেদিনের। তবে পৃথিবীর বৃহত্তর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং অন্য সব তন্ত্রের ভিতর সার্বিক মানুষের কল্যাণের পক্ষে এটাই যে শ্রেষ্ঠতর তন্ত্র, পৃথিবীর ইতিহাস ঘেঁটে এই জ্ঞান লাভ করেই দেশের নেতৃবৃন্দ একে গ্রহণ করেছেন, শিক্ষা গ্রহণের বহু উপকরণ এঁরা পেয়েছেন আর দেশবাসীর সংশয়হীন সমর্থন ও সহযোগিতাও পেয়েছেন। কিন্তু এ থেকে কার ভাগ্যে কী জুটেছে সেই হিসেব

মিলাতে গেলে প্রতিটি সৎ ভারতবাসীই বলবেন, পূর্ববর্তীদের সঙ্গে আরও কিছু অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কেবল এই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বকে কাজে লাগাতে পেরেছেন এবং তাঁরাই রাষ্ট্রের ধন-সম্পত্তিতে ভাগীদার হয়েছেন, অথচ গণতন্ত্রের 'গণ' অর্থে যে প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ, তাদের দারিদ্র্য ও পরনির্ভরতা আরও কয়েকগুণ বেড়েছে তাই নয়, বাকী ২০ ভাগ মানুষের প্রভুত্বটা যে অধিকার সম্মত এটাও মেনে নিতে হয়েছে।

তথাকথিত এই গণতন্ত্রের একটিই বোধ হয় বৈশিষ্ট্য, ঘটনার তাত্ত্বিক অংশ ব্যতীত অধিকাংশের জ্ঞাত হতে বাধা নেই। সম্ভবতঃ সার্থক (?) গণতন্ত্রে এর মূলে থাকে প্রাচুর্য আর অন্যত্র অভাব ও অশিক্ষা। যদিও প্রাচুর্যের পাশেও অভাবের জ্বালা কিছুটা আছে। এ-অভাব খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানে হয়ত তেমন নেই, কিন্তু সামাজিক ন্যায় বিচার, বিশেষ করে সম্পদ বণ্টনে যে আছে ব্যক্ত তথ্যই তার প্রমাণ। হয়ত একদিকের প্রাচুর্য সীমাহীন তাই অন্য দিকের অভাব বোধটাও কিছু বেশী। কিন্তু এত হাঁক-ডাকের পর অভাব ও প্রাচুর্যে ওই যে ব্যবধান তারই বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কী?

এর উত্তর সহজ নয়। আর যদিও বা হয় তবে তা দিতে পারেন একমাত্র ওই রাষ্ট্রকর্তারাই। হয়ত উত্তর তাঁদের কিছুটা দিতেও হয় আর সে-উত্তরে সত্যের পরশ নাও যদি থাকে অধিকাংশ মানুষকে শান্ত রাখার মত আবেগ থাকে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনও কেবল ওইটুকুই। তবে যাঁদের খুশী-অখুশী বোধটা কিঞ্চিৎ যুক্তিনির্ভর এবং যাঁরা সব তত্ত্বই কেবল বাস্তবের আলোয় বিচার করতে অভ্যস্ত, তাঁদের অভিমত কিন্তু অন্য কোন আত্মসচেতন বঞ্চিতের অভিমত থেকে মোটেই ভিন্ন নয়। কারণ তাঁরা জানেন, গণতন্ত্রের যে-অংশটি অন্যের তুলনায় অবাধ মত প্রকাশের অধিকার স্বীকার করে কেবল সেটাই এখানে সার্থক। কিন্তু যে-অংশ সার্থক হলে সকলের সবকিছুর উপর অংশের অধিকার ও কর্তৃত্ব বর্তে এবং তা আদায় করার শক্তিও জোটে তার অস্তিত্ব সর্বত্রই অনুপস্থিত। যেমন ভারতে একজন কৃষকপুত্র এবং কোন মন্ত্রী বা বিড়লাপুত্রের ভোটাধিকার ও মতামত প্রকাশের অধিকার

প্রায়শঃ এক থাকলেও সামাজিক মর্যাদা লাভে এবং আর সব ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই দুয়ের মূল্যে রয়েছে আসমান-জমিন ফারাক। যদিও এ-ফারাকটা প্রায় সব তন্ত্রেই সমান। কোথাও ব্যক্ত, কোথাও অব্যক্ত। কোথাও ব্যক্ত হতে তেমন কোন বাধা নেই, কোথাও বা সে-পথই রুদ্ধ। আর আজকের এই গণতন্ত্রের সার্থক-অসার্থক সংজ্ঞাটাও নির্ণীত হয়ে থাকে মূলতঃ ওই ফারাকটা মেনে নেওয়া বা সহ্য করার শক্তির উপরই। এক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতিবিদদের বেশ কিছুটা অবদান থাকে। আর তথাকথিত সার্থক গণতন্ত্রে এঁদের অবদান আরও বেশী। 'সম্পদ নির্দিষ্ট বা নির্বাচিত শ্রেণীর হেফাজতে সঞ্চিত হয়ে বিনিয়োগ না হলে দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পদ সৃষ্টির উৎসগুলি বিকশিত ও গতিশীল হতে পারে না' অথবা 'অধিকাংশ ব্যক্তিরই সঞ্চয়স্পৃহা বা সঞ্চিত সম্পদ উপযুক্তক্ষণে ও ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ক্ষমতা থাকে না'—এই জাতীয় অভিমত এঁরা নিয়ত প্রচার করতে থাকেন। সঙ্গে একটি কল্পিত আশার আলোও এঁরা অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। জনগণ সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে এসব বিশ্বাস করে, আশ্বস্ত হয় এবং শাসক শ্রেণী একে কাজে লাগান।

সমাজে আশ্বাস বাক্যের একটা আলাদা প্রভাব আছে। রাষ্ট্রীয় আশ্বাসের প্রভাব আরও বেশী। বঞ্চিত মন একে উপেক্ষা করতে পারে না, বরং আকৃষ্ট হয়। আর অপরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রয়োজন না থাকলে, কিংবা কারো করুণাপ্রার্থী না হতে হলে মানুষের বিবেক যতটা যুক্তিবাদী হওয়ার সুযোগ পায় পৃথিবীর সমগ্র শাসককুল সর্বাধিক ভয় করেন সেই অবস্থাকেই। এই চেতনা জাগার উপযোগী পরিবেশই এঁরা চান না। বঞ্চিতকেই যে আরও বেশী বঞ্চনা করা চলে এবং তাদেরই যে অতিমাত্রায় অনুগত ও আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ করা যায় মনস্তত্ত্বের এই গূঢ় তত্ত্বটাই হোল খাঁটি শাসক ও রাজনীতিকের প্রধানতম মূলধন। আর একে ফলপ্রসূ হাতিয়ার করতে চাই ওই অর্থনৈতিক তত্ত্বকথা ও আশ্বাসবাক্য।

অস্বীকার করে লাভ নেই যে, ধনকুবের আমেরিকার মাটিতেও

অভাবী লোক আছে, বেকার আছে। প্রতিবাদ আন্দোলন আর ধর্মঘটও আছে। সে দেশের প্রায় পাঁচ কোটি নিগ্রো আজও শোনা যায় দুর্বিসহ জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ এ যে একটি কঠিন ব্যাধি এবং সামাজিক অবিচারেরই পরিণতি, এই অতি সত্যটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কণ্ঠেই প্রতিকারমুখী প্রতিবাদের শক্তি পায় না। পায় না তার প্রধান কারণ ওই আশ্বাস বাক্য। বেকারভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ সেখানে বহুলাংশেই আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেটা তাদের প্রাপ্য অধিকার বা প্রাচুর্যের একটি দেয় ন্যায্য অংশ। মূল উদ্দেশ্য হোল, সাধারণ মানুষেব দৃষ্টি থেকে শ্রেণীস্বার্থরক্ষাকারী একটি বিশেষ ব্যবস্থাকে আড়ালে রাখা। সমগ্র সমাজের বুকে শ্রেণী-কর্তৃত্ব বা শ্রেণীপ্রভুত্বের ট্রাস্টী আজকের এই গণতন্ত্রের আত্মরক্ষার তাগিদেই এ উদারতা। দেশের বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে রাষ্ট্রপ্রশাসন এবং এই প্রশাসন অনুগ্রাহী শ্রেণীর মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য করতে না পারলে এ গণতন্ত্র বাঁচতে পারে না। একে বলা চলে ন্যায়, যুক্তি এবং প্রতিকার-আকাঙ্ক্ষা থেঁতিয়ে দেবার এক তাত্ত্বিক কৌশল। আর এই কৌশল সফল হলে আমরা ভাবি গণতন্ত্রও সার্থক হয়েছে। কিন্তু গণস্বার্থ ও গণ-অধিকারের পরিধি কতটা বিস্তৃত হওয়া সম্ভব এবং যুক্তিযুক্ত, সে-সম্বন্ধে সঠিক একটি ধারণা থাকলে স্পষ্টই দেখা যেত, সার্থক গণতন্ত্র বলতে যা বুঝা সংগত, তা পৃথিবীর কোথাও নেই এবং ছিলও না কোন কালে। গণতন্ত্রের নামে যা আমরা দেখতে পাই তাকে একটি 'তামাসা' বলার মত বাস্তব জ্ঞান নাও যদি থাকে কিন্তু রাজতন্ত্রের চেয়ে বেশী মূল্যবান হয়ে যে এ-বস্তু ওঠে নি এ-জ্ঞান আজ বহুজনেরই জন্মেছে।

সাম্যবাদী সমাজের আত্মকথা

মানুষের সচ্ছল জীবনের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে আত্মচেতনার সাথে সাথে। আর উন্নততর ও গতিশীল সমাজের সন্ধান চলে সচ্ছলতার সঙ্গে সমতালে। সভ্যতার বিকাশ এই চেতনারই ফল। প্রগতিশীল

সমাজ-সংস্কারক ও চিন্তাবিদেরা নিয়ত এই কাজেই ব্যাপৃত রয়েছেন। তাঁদের সন্ধানকার্য শেষ হয়েছে বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে, এ কেউ বলেন নি। অথচ কার্ল-মার্ক্স তত্ত্বে এমন একটি সুর ব্যক্ত হয়েছে, যা থেকে মনে হওয়া উচিত, নতুন করে এই সন্ধানের আর কোন প্রয়োজনই নেই।

কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার, যা ১৮৪৮ সালে লণ্ডনের বুকে বসে এই মতবাদস্রষ্টা কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ কর্তৃক রচিত হয়েছিল, তার মোদ্দা কথা হোল, 'শ্রেণীসংঘর্ষকে দাবিয়ে রাখার জন্যই রাষ্ট্রের জন্ম। রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের একটি যন্ত্রবিশেষ। বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করছে শ্রমিক শ্রেণীকে দলনের কাজে। অতএব শ্রমিক শ্রেণীকে যদি শোষণমুক্ত হতে হয় তবে রাষ্ট্রক্ষমতায় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্থলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে। তারপর নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে নয়া রাষ্ট্রযন্ত্র চালু করতে হবে, এক কথায় বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্থলে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

কেমন যেন অদ্ভুত এ-যুক্তি। যেন এখানে রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্বই থাকছে না। অন্যের নিয়ন্ত্রণে থাকলে সেটা হবে রাষ্ট্র। আর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণে এলেই তার সংজ্ঞা যাবে পাল্টে। 'শ্রমিক-শোষণের জন্যই রাষ্ট্রের জন্ম' বলার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকদের সেই রাষ্ট্রতক্তে বসবার প্রলোভন দেখান হচ্ছে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী এই ক্ষমতা দখল করবে কী করে? মার্ক্স বলছেন, 'শ্রেণীসংগ্রামের রাস্তায় এগিয়ে,—শ্রেণী-সমঝোওতার রাস্তায় নয়।' মার্ক্সের মোট কথা হচ্ছে, 'শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংঘর্ষ অনিবার্য এবং এই অনিবার্য শ্রেণীসংঘর্ষকে নিয়ে যেতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পর্যন্ত। শ্রেণীসংগ্রামকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখলে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি অসম্ভব। কারণ শ্রমিক তার শ্রমদ্বারা পণ্য উৎপাদনের মধ্য দিয়ে বস্তুর রূপান্তরই ঘটায় না, বাড়তি মূল্যও সৃষ্টি করে,—যে-বাড়তি মূল্য ব্যবসার নীট লাভরূপে চিহ্নিত করে

মালিক শ্রেণী আত্মসাৎ করে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথা মানেই শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমদ্বারা সৃষ্ট বাড়তি মূল্য আত্মসাৎ করা।'

এই ইশ্‌তেহারেরই একস্থানে বলা হয়েছে, 'কমিউনিস্টরা তাদের মতবাদ এবং লক্ষ্যকে গোপন রাখতে ঘৃণা করে। তারা খোলাখুলিভাবেই ঘোষণা করে যে, বলপ্রয়োগের দ্বারা সমস্ত প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনের ভিতর দিয়েই একমাত্র তারা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।' কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ রচিত এই ইশ্‌তেহার কমিউনিস্টদের কাছে বেদবাক্য থেকেও সত্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু কার্ল মার্ক্সেরই বস্তুবাদ সম্পর্কীত দর্শনের মূল কয়েকটি কথা হোল,—

(১) 'এই জগৎ এবং জাগতিক সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল।'

(২) 'পরিবর্তনশীল এই জগৎ আমাদের চিন্তা ও চৈতন্যরাজ্যের বাইরে আপন অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান রয়েছে।'

(৩) 'এই বস্তুজগৎ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মানুষ এবং তার সমগ্র চিন্তারাজ্য।'

(৪) 'বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ দ্বন্দ্বমূলক। মানুষ বস্তু-জগতের শক্তির উপর নিজের শক্তির প্রতিষ্ঠা করতে সর্বদাই সচেষ্ট এবং এই চেষ্টার মধ্য দিয়ে বস্তুজগতকে মানুষ পরিবর্তিত করে। অর্থাৎ বস্তুজগৎ থেকে চেতনা লাভ করলেও মানুষের চেতনা নিষ্ক্রিয় থাকে না, সক্রিয় হয়ে ওঠে।'

(৫) 'বস্তুজগতের পরিবর্তন সাধন করতে গিয়ে মানুষ সমাজ-বদ্ধ হয়। এককভাবে চলতে পারে না। এই সামাজিক অবস্থান চেতনার গতি প্রকৃতিকে নির্ধারণ করে।'

(৬) 'সমাজে পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর আবির্ভাবে শ্রেণীচেতনা লাভ করে।'

(৭) 'সমস্ত রকমের পরিবর্তনের মূলে রয়েছে বস্তু বা ঘটনার অন্তর্নিহিত দুটি বিরোধী শক্তির সংঘাত।'

(৮) 'জগতে কোন কিছুই আকস্মিক বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কাজেই কোন কিছুকে চিন্তা করতে হলে আশপাশের সম্পর্ক-যুক্ত আর সবকিছুকেই গ্রাহ্যের মধ্যে টেনে নিতে হবে।'

সুতরাং মার্ক্স দর্শনের এই অংশকে যদি সঠিক ধরে নিতে হয় তবে এটাও অবশ্যই যুক্তিযুক্ত বলে ধরে নিতে হবে যে, জগতের সবকিছুই যখন পরিবর্তনশীল আর মানুষের চেতনাও নিষ্ক্রিয় থাকার নয় তখন নিত্য নতুন অনুভূতি থেকে তারা নতুন পথে চলতে উদ্বুদ্ধ হবে এটাই স্বাভাবিক। এখানে নির্দিষ্ট একটি পথ ধরে চলার নির্দেশ দিলে মানুষের চেতনার সক্রিয়তা বা অনুসন্ধিৎসাকেই স্তব্ধ রাখার প্ররোচনা থাকে। যদিও কার্ল মার্ক্স তাঁর স্বভাবসুলভ স্রষ্টার ভঙ্গীতে প্রায় এই নির্দেশই তার ভক্তগণকে দিয়ে গেছেন এবং পরবর্তী ঘটনার চরিত্র থেকে এও মনে করার হেতু ঘটেছে যে, অধিকার অর্জনে মূলতঃ বলপ্রয়োগের প্রেরণা দিয়ে তিনি হয়ত মানুষের যুক্তি প্রয়োগের শক্তিকেই হারিয়ে ফেলতে প্ররোচিত করেছেন, কার্ল মার্ক্স পথ-প্রদর্শক অবশ্যই! তবে সে পথ সঠিক বা মানুষের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের নির্দেশক কিনা আগামী দিনের বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ তার সন্ধান করবেই।

এই স্রষ্টা অবশ্য যোশেফ ওয়েড মেয়ারকে লেখা চিঠিতে নিজেই স্বীকার করেছেন, আধুনিক সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব আবিষ্কারের কৃতিত্ব মোটেই তার নিজের নয়। অনেক পূর্বেই বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশ ইতিহাস বিবৃত করেন। এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাই বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে গেছেন। তিনি নিজে যেটুকু করেছেন তার মূল কথা হোল,—

(১) 'বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রশ্নটি উৎপাদনের ক্রমবিকাশের পথে বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার সংগে অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত।'

(২) 'শ্রেণীসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবীরূপে পরিণতি লাভ করবে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে।' এবং

(৩) 'এই একনায়কত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিরোধী স্বার্থযুক্ত শ্রেণীব বিলুপ্তি সাধন করে শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণের রাস্তাটি।'

ব্যাপারটা যে অতীব সরল তা মনে করার হেতু হয়ত সেদিন অবশ্যই ছিল। আর এ তো গল্পের ঘোড়া নয় যে, কেবলই মগডালে

বিচরণ করে বেড়াবে। এ যে কার্ল মার্ক্সের থিয়োরী! সুতরাং বাস্তব সম্ভাবনার অনিবার্যতা ছাড়া অবাস্তব কল্পনার নামগন্ধও থাকতে পারে না।

কিন্তু 'শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব' বস্তুটি কী? এ কী সমগ্র শ্রমিক কর্তৃক স্বীকৃত একজন নায়ক? না সমগ্র শ্রমিককেই একটি নায়করূপে ব্যক্ত করা হচ্ছে? কিন্তু নায়ক যদি একজনই হয় তবে কোন রাজাধিরাজ বা অন্য আর একজন শাসকের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ কী? এবং তাঁকে আলাদা একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না করার যুক্তি কোথায়? আর যদি সমগ্র শ্রমিককে, অর্থাৎ সকল দেশবাসীকেই 'নায়ক' পদবাচ্যে প্রবোধ দেওয়া হয়ে থাকে তবে ধরে নেওয়াই সংগত, গল্পের ঘোড়া ডাল ছেড়ে এখানে পাতায় গিয়ে হাজির হয়েছে।

কমিউনিস্ট শাসনের এক তাত্ত্বিক অধ্যায়—কোন সম্পদই এখানে কারো নিজস্ব নয়, সবটাই রাষ্ট্রের। এমন কি দেশের সমগ্র অধিবাসীও রাষ্ট্রের সম্পত্তি। অর্থাৎ রাষ্ট্র মানুষের নয়—মানুষই রাষ্ট্রের। 'এই রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ ও রক্ষার দায় যেমন সকলের, তেমনি এর যাবতীয় সবকিছু ভোগের অধিকারও সম অংশে সকলের।' নীতি ও আশ্বাস হিসেবে এ-বক্তব্য অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু পূর্বেই প্রকাশ পেয়েছে, যুক্তি ও প্রচারের ভিতর সার্বিক মনে প্রচারের প্রভাবই অধিক। বিশেষ করে সরকারী প্রচারের। এই প্রচারের সামনে যুক্তি, তথ্য, সবই কিছু কমজোরী। তাছাড়া যুক্তি বা তথ্যের নিজস্ব চলৎশক্তি নেই, কিন্তু প্রচার এই শক্তি নিয়েই জন্মেছে। কাজেই গতিহীন ও গতিশীলের প্রতিযোগিতা যেমন অর্থহীন, তেমনি স্থবির উন্মুক্ত সত্য আর গতিশীল অবগুণ্ঠিত অসত্যের ভিতর নৈতিক মূল্যের ব্যবধান খুঁজাও বৃথা। কারণ গণদরবারে কেবল ওই অবগুণ্ঠিত তথ্যই হাজির হয়ে থাকে তার প্রচারকের হাত ধরে।

কমিউনিস্ট প্রচারে আছে, 'অর্থনৈতিক নিরাপত্তাই মানুষকে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করতে পারে। আর এই নিশ্চিন্ততাই হোল মানুষের ন্যায়বোধ ও কর্মশক্তি বাড়াবার শ্রেষ্ঠ উপাদান। অন্য আর কিছুর প্রভাব এ-ব্যাপারে গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না।'

অবশ্যই এই বক্তব্যকে শুধু 'প্রচার' বলে গুরুত্বহীন করতে যাওয়া মূর্খতা। এর চেয়ে যুক্তিযুক্ত মূল্যবান একটি তত্ত্ব খুঁজে পাওয়াও শক্ত। কারণ ভবিষ্যৎ-নিশ্চিন্ত মানুষই সহজে যুক্তিবাদী হতে পারে। কিন্তু এখানে আসল প্রশ্ন হোল, এই নিশ্চিন্ততা আত্মনির্ভর না পরমুখাপেক্ষী? সন্ধানের ও বিচার্য বিষয়ও এই। কারণ অপরের করুণা বা কর্তৃত্বনির্ভর নিশ্চিন্ততা মানুষের বিকাশশক্তি বাড়ায় না, বরং শিথিল করে। তার নৈতিক মূল্যবোধকে পঙ্গু করে এবং কর্মক্ষমতা ও সৃজনস্পৃহাকেও থেঁতলে দেয়। ব্যক্তি বা রাষ্ট্র—কোন আশ্বাসদাতাই মনের এই অবস্থা সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। অন্যদিকে আত্মনির্ভর মানুষই কেবল আত্মসচেতন ও পরিপূর্ণ বিকসিত হতে পারে। 'আরও চাই, বিশেষ করে ও একান্ত করে চাই, এই কামনা ব্যক্তির আত্মচেতনারই প্রকাশ। কিন্তু এই কামনায় নিজেকে গৌণ রেখে কেবল 'সমষ্টির জন্যই কাম্য' এই নির্দেশ থাকলে ব্যক্তি তার কর্মশক্তি সমষ্টির প্রযুক্ত কর্মশক্তির পরিমাপের ভিত্তিতে প্রয়োগ করার প্রেরণা মুক্ত হবে এ-ধারণার আদৌ কোন মূল্য নেই। একান্তভাবে নিজস্ব একটি গতিশীল পরিমণ্ডলের প্রতি লক্ষ্য সমগ্র আত্মিক ও কর্মশক্তির প্রধানতম উৎস। একে ত্যাগ করতে বাধ্য হলে ওই শক্তিরই অবলুপ্তি ঘটে। অন্তত কিছুটাও সঙ্কোচ ঘটে।

কিন্তু কমিউনিস্ট শাসকরা কী এ তত্ত্ব জানেন না? অবশ্যই জানেন। আত্মনির্ভর মানুষ যে বেশী আত্মসচেতন এবং এইসব মানুষই যে পার্থিব সমগ্র বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে, আসলে এই বোধটাই এঁরা সমাজ থেকে দূরে রাখতে চান। কর্তৃত্ব আর প্রভুত্ব কায়েম রাখার এটা সবচেয়ে শক্তিশালী নিঃশব্দ অস্ত্র। অবশ্য স্বতন্ত্র চেতনা যে এখানে আদৌ নেই তা নয়। যেমন স্ট্যালিনোত্তর যুগে কিঞ্চিৎ ব্যক্তি-স্বাধীনতার সুযোগে খারকভ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এভ্সাই লিবারমান প্রাভদায় লিখিত এক প্রবন্ধে লিখলেন, 'গভর্নমেণ্ট অফিসার দ্বারা সোসালিজম চলে না। লাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি না দিলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য।' এর কিছুদিন পূর্বেই ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন, 'বুরোক্রেসির

দ্বারা কৃষিকার্য চলে না।' রাশিয়ায় কৃষির অবনতির জন্য তিনি গভর্নমেণ্ট অফিসার ও কর্মীদেরই দায়ী করেন। লিবারমানের কথায় ক্রুশ্চেভ বলেন, 'এই উক্তিতে চিন্তার খোরাক আছে।'

রাশিয়ায় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ব করে সরকারী কর্মচারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়ায় এই সময় দেশব্যাপী নাকি এক ভয়াবহ জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং তখন এর নতুন সমালোচকরা অর্থনীতির যে ব্যাখ্যা করছেন তা আধুনিক পাশ্চাত্য অর্থনীতিরই সগোত্রীয়।

১৯৬২ সালেই ক্রুশ্চেভ কেন্দ্রীয় কমিটিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, লেনিন এক সময় বলেছিলেন, 'প্রয়োজন হলে ক্যাপিটেলিস্টদের কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং যা কিছু যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক তা মেনে নিতে হবে।' এই উপদেশ স্মরণের উদ্দেশ্য বোধহয় তাঁরও অভিমতঃ আদর্শ ও প্রয়োজন, এই দুয়ের ভিতর প্রয়োজনকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া সংগত।

সংবাদে প্রকাশ, এই সময় লিবারমান ও ক্রুশ্চেভের নয়া-মতবাদের পরীক্ষা চলে মস্কোর 'বলশেভিশকা' এবং গোর্কির 'মায়াক' কাপড়ের কলে। আর সরকারী কর্তৃত্ব শিথিল হওয়ার ছ'মাসের ভিতরই এই দুটি কলে বিপুল উন্নতি দেখা দেয়। যদিও এর অল্পকাল পরেই ক্রুশ্চেভের পতন ঘটে এবং কোসিগিন ক্ষমতায় বসেন। কিন্তু তিনিও এই নতুন উদ্যমকে প্রতিহত না করে বরং ১৯৬৫-র জানুয়ারীতে আরও ৪০০ পোশাক ও জুতার কারখানায় সরকারী কর্তৃত্ব শিথিল করে প্রকারান্তরে নাকি বলেন, 'প্রয়োজনে রাশিয়ায় সব কল-কারখানাতেই এই নতুন নীতি প্রয়োগ করা হবে।'

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পূর্বেই অর্থনৈতিক বিলি-ব্যবস্থায় বেশ কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল—যার ফলে ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে ক্রুশ্চেভ নাকি অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা থেকে আর্থিক সাহায্য নেবার বিষয়ও চিন্তা করছিলেন। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্ট্যালিন আমেরিকার সামরিক সাহায্যে আত্মরক্ষা, তথা দেশকে রক্ষা করেছিলেন। ক্ষমতায় থাকলে ক্রুশ্চেভের এ চিন্তা কি রূপ নিত বলা শক্ত। কিন্তু ক্রুশ্চেভের বহু উক্তি থেকেই

প্রমাণ হয় যে, এটা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি—মানব-সমাজ কতকগুলি অঙ্ক সমষ্টি নয়, উহা জীবন্ত এবং সতত সৃজনশীল। মানুষ শুধু শ্লোগানে বাঁচতে পারে না কিংবা তার প্রয়োজনকেও চিরকাল গণ্ডীবদ্ধ রাখা যায় না। তবে সংবাদ যেটুকু সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরে আসে তা থেকেই এ ধারণা করা চলে যে, রাশিয়ায় এই সত্য উপলব্ধির মত মননশীলতা ক্রমেই জাগ্রত হচ্ছে। যদিও চীনের অনুকরণে কিছু অতি বিজ্ঞ ব্যক্তি নাকি এই উপলব্ধিকে 'নয়া শোধনবাদ' আখ্যায় প্রতিহত করার চেষ্টাও করছেন।

রাশিয়া আজ যে অভ্যস্ত সোসালিজমের ধারণা থেকে নতুন পথের সন্ধান করছে বলে প্রকাশ এবং কিছুটা পাশ্চাত্য অর্থনীতির পথ ধরতে চাইছে, তার মূলে রয়েছে তাঁদের ঠেকে শেখা। রুশ-বিপ্লবের পর অর্ধশতাব্দীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কমিউনিস্ট নেতারা হয়ত উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের উদ্ভাবিত আর অনুসৃত সোসালিজমই বিশ্বের একমাত্র সোসালিজম নয়, এর আরও প্রকারভেদ আছে। অর্থনৈতিক পলিসি নির্ধারণ ক্ষমতা মুষ্টিমেয় সরকারী লোকের হাতে ন্যস্ত থাকলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয় তাই নয়, একদিন সম্পূর্ণ অচল অবস্থায়ও পৌঁছিতে পারে। সম্ভবতঃ নেতাদের এই মানসিক অবস্থানটাই তথাকার কিছু লোকের মনে একটি ক্ষীণ আশা এক সময় জাগিয়ে দিয়েছিল যে, হয়ত শীঘ্রই বর্তমান নেতৃত্ব এমন কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে যার ফলে কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণাই অনেকখানি পালটে যাবে। হয়ত এঁরা প্রোলিটেরিয়েটের ডিক্টেটরশিপ থিয়োরী বর্জন করে রাশিয়াকে জনসাধারণের স্বাধীন চেতনার উপর ছেড়ে দেবেন। অর্থাৎ রাশিয়া একটি সঠিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতই জনগণের রাষ্ট্র হয়ে উঠবে।

স্ট্যালিন দেহে এবং তাঁর সাধের থিয়োরীতে কয়েক বছর পূর্বেই সমাধিস্থ হয়েছেন। তাঁর কৃতকর্মের জন্য তথাকার প্রায় প্রতিটি লোকের কাছেই তিনি ধিক্কৃত। কিন্তু বর্তমান নেতৃত্ব অথবা আগামী দিনের কেউ যদি সত্য সত্যই জনগণকে মুক্তি দিতে পারেন তবে কার্ল মার্ক্স এবং লেনিনকেও হয়ত নতুন মূল্য প্রাপকের আসনে

হাজির হতে হবে। হবে প্রধানত এই যুক্তিতে যে, তাঁরা দলীয় দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার কোন পথ দেখিয়ে যান নি।

তবে এতটা আশা এখন না করাই বোধ হয় ভাল। কারণ কোন তরফ থেকে এ চেষ্টা যদি কোনদিন হয়ই তবে তিনি যত বড় শক্তিধরই হোন, আজ যাঁরা এই থিয়োরীর কৃপায় জনগণকে সম্পূর্ণভাবে আজ্ঞাধীন রাখার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা সর্বশক্তি প্রয়োগেই তা প্রতিবোধ করতে চাইবেন।

ভারতে মিশ্র অর্থনীতির চরিত্র

ভারতে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার জন্মলগ্নে এ দেশে নতুন একটি অর্থনীতিরও আবির্ভাব ঘটেছে এবং ওই সময় থেকেই এ নিয়ে জোরালো পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হয়ে গেছে। এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে মিশ্র অর্থনীতি। উদ্দেশ্য, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উদ্যোগকে যেমন মদত দেওয়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে সরকারী শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার চেষ্টাও চলতে থাকবে। সরকাবী কর্তা-ব্যক্তি ও তাঁদেব সমর্থক অর্থনীতিবিদদের যুক্তি—'এ ব্যবস্থায় দেশের অগ্রগতির বেগ শুধু দ্রুততর হবে তাই নয়, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেশের অবশিষ্ট মানুষের অর্থনৈতিক ভারসাম্যটাও রক্ষা পাবে।'

অর্থনীতিতে কল্পনা থেকে বাস্তবের প্রভাবই অধিক। ধোঁকা দেওয়ার প্রয়োজন না থাকলে অন্য কোন বক্তব্য এক্ষেত্রে থাকে না। কাজেই ধরে নেওয়া যায়, বাস্তবতাই এখানে একমাত্র লক্ষ্য। বিশেষ করে নির্বাচিত গণসরকার এবং যে সরকারের সমগ্র কর্ণধারই জীবনপণ করা স্বাধীনতা-সংগ্রামী, বহুদর্শী, অভিজ্ঞ আর এক নতুন সমাজের সন্ধানী। কাজেই কোন অবিবেচনা, অযোগ্যতা বা অবহেলার প্রশ্নই এখানে নেই। সবই যে সুচিন্তিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও নিষ্ঠাব প্রকাশ, এটাই সমগ্র দেশবাসী ধরে নেবে। আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনা? ঘটনা অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় ব্যক্ত ও মূল্যায়িত হয়েছে যার অনেকটাই সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। তাদের বোধগম্য

হতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার, মিশ্র অর্থনীতির ওই প্রচারিত 'বাস্তব'টা কী এবং কী আকারে প্রকাশ পেয়েছে? আর তাতে এর আকাঙ্ক্ষিত ভারসাম্যই বা কতটা রক্ষা পেয়েছে? দেখতে হবে, শুধু ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান নয়, যে পুঁজিপতিদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা রোধ করে জনগণকে এর শুভফলের অংশীদার করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য, তা কতটা সফল হয়েছে।

ইতিমধ্যে গোটা চারেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়েছে; বেশ কয়েকটি বৃহৎ শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি মোটা অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে। আর সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু জনগণ ওই জিজ্ঞাসার সঠিক কোন উত্তর পেয়েছে, অথবা উত্তর জানার প্রয়োজন হ্রাস হয়েছে এ অভিমত আজও কেউ প্রকাশ করেন নি। বরং বহু ব্যক্তির কণ্ঠেই এ প্রশ্ন রয়েছে,—মিশ্র অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গেই প্রচারিত উদ্দেশ্যের সংগতি ছিল কিনা? আর সে সংগতি যদি ছিলই তবে এর সফল পরিণতির জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা ছিল কিনা? এ প্রশ্নের হেতু বোধ হয় এই যে, এই পরিকল্পনার জন্মলগ্ন থেকেই এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষ নিয়ত পিছিয়ে পড়ছে। ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ এবং ভেজাল, কালো বাজার, মুদ্রাস্ফীতি এই সময় থেকে অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে বাড়ছে। একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির অভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। সমগ্র দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার একেবারে বাইরে চলে গেছে। যুদ্ধপূর্ব ৩ থেকে ৫ টাকা মণ দরের চাল ৩ থেকে ৫ টাকা কেজি হয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু মূল্যই ২০ থেকে ২৫—৩০ গুণ বেড়েছে। অথচ যাদের মঙ্গলের নামে এই পরিকল্পনার হাঁক-ডাক, দেশের সেই ৮০ ভাগ সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা পাঁচগুণও বাড়ে নি—দিনমজুর, ভাগচাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতির অনাহারে থাকার দিনের সংখ্যাই বরং বেড়েছে। এমন কী এরাও যে 'খেটে খাওয়া মানুষ' সেই তত্ত্বটাই আজ অস্বীকৃতির সামনে যেয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আরও কিছু জুড়ে দিয়ে এর হয়ত একটা কৈফিয়ত খাড়া করা চলে, কিন্তু সমাজে

পরস্পর অর্থনৈতিক ব্যবধানের পরিধি সে কৈফিয়তে ঢাকা দিতে চাইলে এর আসল চালাকীটাই একেবারে নগ্ন হয়ে পড়ে।

এ গেল মিশ্র অর্থনীতির ব্যক্ত চরিত্রের একদিক। কিন্তু স্বাভাবিক হিসেবের অনেক-অনেক বেশী অর্থ ব্যয়ে যে সরকারী প্রকল্পগুলি গড়ে উঠেছে এবং যে সব তৈরী শিল্প-ব্যবসা রাষ্ট্রাধীন করা হয়েছে তার চরিত্র কী? অবশ্য একে যদি দলীয় রাজনীতি বা রাষ্ট্রক্ষমতার মাধ্যম রূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে তবে এ প্রশ্ন অর্থহীন, তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎটা যে তুলনায় উজ্জ্বল ও গতিশীল হতে পেরেছে সেখানেও কোন প্রশ্ন নেই। যদিও এঁদের এই অবস্থাটা কতটা স্থায়িত্বের দাবী রাখে সেটা স্বতন্ত্র বিষয়, কিন্তু ব্যক্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে অবশিষ্ট মানুষের সম্বন্ধ? কিংবা উৎপাদনের হার? উৎপন্ন পণ্যের উৎকর্ষতা ও পড়তা খরচ? আর সবচেয়ে বড়—ভবিষ্যৎ মূলধন ও কর্মক্ষেত্রের যোগান দিতে এর অবদান? এর একটি প্রশ্নেরও সঠিক উত্তর কিন্তু দেশবাসী পায় নি। কাজেই যাঁরা বলছেন, 'সরকার, কিছু দলীয় রাজনীতি এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীরা আশান্বিত যতটা সাধারণ দেশবাসীর আশংকা ও দুশ্চিন্তা তার বহু গুণ বেশী'—ন্যায় যুক্তিতে তাঁদের স্তব্ধ করাও বোধ হয় শক্ত। কারণ 'অপচয়ের ভাগ জনগণকে নিতে হবে না' এ নিশ্চয়তা কেউ দেন নি। অনুরূপ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন হার, পড়তা খরচ এবং মূলধন ও কর্ম-ক্ষেত্রের যোগান তুলনা করেই হয়ত এঁরা এঁদের বক্তব্যের সমর্থন পাচ্ছেন। 'শ্রেণীস্বার্থ সুরক্ষায় সাধারণ মানুষকে মূল্য কিছু চিরকালই দিতে হয়। কিন্তু তাদের নৈতিক ও জীবনীশক্তিকে পঙ্গু করে দিতে, এই সব প্রকল্প যেন সর্বকালের সব ব্যবস্থাকেই হার মানিয়েছে'—এ মন্তব্যও কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঘটনার সঠিক মূল্যায়ন শেষে প্রতিবাদ করারই কি যথেষ্ট যুক্তি মেলে?

লাভের অংশ থেকে যে নতুন মূলধনের সৃষ্টি হয় সেটাই হয় আত্ম-নির্ভর ও গতিশীল মূলধন। এ তত্ত্ব সমগ্র গতিশীল সমাজের মূল মন্ত্র। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশেও এ ভাবেই মূলধন সংগৃহীত হয়ে থাকে। বরং সেখানে লাভের মোট অংশই নতুন মূলধনে বিনিয়োগ

হয়। কিন্তু যে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে ১ কোটি, সেখানে স্থবির বা ক্ষয়ধরা মূলধন তার মৃত্যুর পরোয়ানা ভিন্ন আর যে যুক্তিতেই প্রশ্রয় পাক মহৎ উদ্দেশ্য বলে কেউ স্বীকার করবে না।

এখানে একটি কথা প্রায়ই শুনা যায়,—'সরকারী প্রকল্পগুলি লাভের উদ্দেশ্যে নয়'। কিন্তু প্রশ্ন, কিসের উদ্দেশ্যে? সমগ্র জনগণের অর্জিত অথবা ঋণ করা অর্থে কিছু সংখ্যক লোককে স্ফীত হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে বাকী দেশবাসীকে নিঃস্ব করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই নয়। অথচ অনেকের ধারণা, এখানে তাই হচ্ছে। নতুন মূলধন বা কর্মক্ষেত্র সৃষ্টিতে অক্ষম তাই নয়, সরকারী প্রকল্পগুলিতে লগ্নিকৃত মূলধন নিজেই ক্ষয় হচ্ছে। মাঝে মাঝে উৎপন্ন পণ্যমূল্য ও ট্যাক্স বাড়িয়ে এই ক্ষয় পূরণের চেষ্টা চলেছে এবং তাতেও যখন সামাল দেওয়া যাচ্ছে না তখন বাড়তি নোট ছাপিয়ে দাবী মেটাতে হচ্ছে, যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া থেকেই আজ দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের চলার গতি চিরদিনের মতই স্তব্ধ হয়ে এসেছে। অর্থাৎ যে অর্থনীতিকে গতির উৎস বা সমাজতন্ত্রের বাহন ভাবা হয়েছিল তা শুধু এর চিরশত্রু ধনতন্ত্রের বাহন হতে চাইছে তাই নয়, অতি সন্তর্পণে হয়ত বা স্বৈরতন্ত্রের বীজও বপন করে চলেছে। অনেকেরই স্পষ্ট অভিমত শুনেছি 'এ সবই অনিবার্য পরিণতি'। রাশিয়া নতুন অর্থনীতির সন্ধান করছে সরকারী আমলা কর্তৃত্বের কুফল থেকে আর ভারতে এর মূল লক্ষ্যই ওই আমলা কর্তৃত্ব। কাজেই দুয়ের ভিতর প্রভেদ যতখানি এটা না বুঝার ভাণও ঠিক ততখানিই।

ভারত স্বাধীন হয়েছে প্রায় ২৮ বছর। কিন্তু এরই ভিতর এ দেশে বঞ্চনা ও শোষণের কৌশল মাত্র ২৮ গুণ নয়, অনেক বেশীই রপ্ত হয়েছে। লাইসেন্স, পারমিট আর নিয়ন্ত্রণের ছায়ায় মিশে এসেছে ভেজাল ও কালোবাজার। এসেছে ট্যাক্স ও বিদেশী মুদ্রা ফাঁকির জোয়ার। নিয়ত এগুলি চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে এবং একদল ফন্দিবাজ লোক এই পথেই জাতীয় আয়ের অধিকাংশ হাতিয়ে নিচ্ছে। কায়েমী স্বার্থান্বেষী আমলাতন্ত্র প্রয়োজনীয় বাধা দিতে পারে নি বা দেয় নি। আমলা-নির্ভর সমাজে সেটা সম্ভবও নয়। কিন্তু নির্বাচিত তথাকথিত

জনপ্রতিনিধিদের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্বভার ন্যস্ত না থাকলে জনগণ যতটা সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করত এ ক্ষেত্রে তারা তা করে নি। কাজেই জনগণের ভুল কিছু হ'লে হয়েছে সেখানেই এবং ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর কিছু করণীয় থাকলে তাদের শুরুও করতে হবে হয়ত সেখান থেকেই।

শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা চিরকালই কিছুটা জোটবদ্ধ। শুধু ভারতে নয়, সর্বত্র। কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই জোটকে এঁরা যেভাবে ও যতটা পোক্ত করতে পেরেছেন তার নজির বড় একটা নেই। শ্রমিক শোষণ, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, আর কৃষকদের নিংড়ে রস বের করা তো এঁদের ঐতিহ্যেরই ব্যাপার। কিন্তু স্বাধীন ভারতে এর পরিধি ও গতি যতটা বাড়তে পেরেছে—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও বিনিয়োগ সত্ত্বেও—ইতিহাসে তার সন্ধান পাওয়া শক্ত। মিশ্র অর্থনীতির সঙ্গে প্রচারিত গণস্বার্থের সংগতি খুঁজতে দূরবীণ যদি নাও লাগে কিন্তু সমাজতন্ত্রের ফারাকটা যে অনেক বেশী এতে সন্দেহ নেই। আসল কথা গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র যে সংজ্ঞাই থাক এবং তার অর্থনীতি মিশ্র অমিশ্র যাই হোক, সেটা যদি কেবলমাত্র দলীয় রাজনীতি-নির্ভর হয় তবে জনগণ হয় শিল্পপতি-ব্যবসায়ী, না হয় সরকারী আমলাদের দানের সামগ্রী হতে বাধ্য। এঁদের কাউকেই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা বা চটাবার ক্ষমতা কোন দলীয় সরকারের নেই। রাজতন্ত্রের সঙ্গে এর সংজ্ঞাগত সাদৃশ্য নাও যদি থাকে, চারিত্রিক সংগতি অবশ্যই আছে।

অনেকের, বিশেষ করে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের বক্তব্য ; 'ভারতে আয়কর ও সম্পদ করের পরিধি এত ব্যাপক যে, অতি মুনাফা কেন, তাদের ন্যায্য মুনাফাও অধিকাংশ এই জালে ধরা পড়ে।' যদিও এ বক্তব্যে সাধারণ মানুষের সায় নেই এবং এর বাস্তব কোন মূল্যও তাদের কাছে নেই। তাদের বরং অভিজ্ঞতা হয়েছে, মুনাফা যাঁরাই করেন তাঁরা হিসেবী লোক। আর অতি মুনাফা যাঁরা করেন তাঁরা যথেষ্ট আঁটঘাট বেঁধেই তা করেন। কাজেই করের জাল কেন, অনেকের বুদ্ধির জালেই তা ধরা পড়ে না। তা ছাড়া এ দেশে এই জাল যাঁদের হাতে থাকে তাঁদের অনেকেরই কর্তব্য ও দেশাত্মবোধটা

এমনই যে, কিঞ্চিৎ নগদ বন্দোবস্তের সন্ধান পেলে করের প্রশ্ন অদৃশ্য হতে কিছুমাত্র সময় লাগে না।

ভেজাল এদেশে আর এক সংক্রামক ব্যাধি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই এ-ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই, বিশেষ করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হলে এবং উৎপাদন ও বণ্টনে সরকারী আমলাকর্তৃত্বের বিস্তার ঘটলে এই ব্যাধি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আজ প্রায় প্রতিটি পণ্যের উপরই এ-ব্যাধি ভর করেছে এবং তা এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এদেশে 'খাঁটি' বলে কোন বস্তু আছে সে-কথাটাই লোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। অর্থাৎ খাঁটি কিছু যদি কোথাও থাকেও তবে তা সাধারণ মানুষের নাগালের ভিতর নেই। পৃথিবীর আর কোথাও এ ব্যাধি এতটা ব্যাপক হয়েছে সে-সংবাদ কেউ দেননি এবং কিছুটা কোথাও থাকলেও তার প্রতিষেধক সেখানকার সরকারের জানা নেই এও কেউ বলেননি। তবে ভারতে এর কোন প্রতিষেধক নেই। এখানে প্রায় ৫৫ কোটি মানুষ আছে, তাদের চেতনা আছে, শক্তি আছে এবং নিয়মতান্ত্রিক ও গণনির্বাচিত সরকার আর তার অতি বিপুল সংখ্যক কর্মচারীও আছেন, কিন্তু কারো কাছেই কোন প্রতিষেধক নেই। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকেই যেন নির্বিকার, নিরাসক্ত! কাজেই নাফাওয়ালারাও এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

কিন্তু যে-ব্যবসায়ী মনুষ্যখাদ্যের কোনও কিছুতেই ভেজাল দিতে কুণ্ঠিত নয়, শিশুখাদ্যে আর ঔষধে ভেজালের বিষ মিশাতেও বিবেকের বাধা পায় না এবং যে-সরকার এসব জেনেও তার প্রতিকার করতে পারেন না, ইতিহাস তাঁদের কাউকেই ক্ষমা করে না। আত্মরক্ষার সব ব্যবস্থাই একদিন চুরমার হয়ে যায়। আর যে-জাতি সমাজের নৈতিক অধোগতির এই স্তর অবধি সহ্য করতে পারে তাদের দুর্গতিও কেউ রোধ করতে পারে না। এ শুধু কথার কথা নয়, কঠিন বাস্তব। মৃত্যুর মতই সত্য।

শ্রেণীহীন সমাজের রূপকথা

শ্রেণীহীন সমাজের অগ্রগতি প্রসংগে কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন, 'ধনবাদী সমাজে কমিউনিস্টদের একটি প্রধান কাজ হবে ধনবাদের শক্তি, সামর্থ ও দুর্বলতার উৎসগুলি এবং স্ববিরোধিতা খুঁজে তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া।' তিনি মনে করতেন, এ-কাজ খুব কঠিন নয়। কারণ শ্রেণীহীন সমাজ ভিন্ন সর্বপ্রকার সমাজ ব্যবস্থার ভিতরই তার ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে।

যুক্তির মাপকাঠিতে এ-বক্তব্য অবশ্যই মূল্যবান। কারণ শ্রেণী প্রভাবিত সমাজে শ্রেণীস্বার্থ থাকবেই এবং শ্রেণীস্বার্থ থাকলে সেখানে সংঘাত যেমন থাকবে, সে-সংঘাত নিয়ত ধ্বংসের দিকেও তাকে নিয়ে যাবে। এখানে প্রতিরোধের প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন আছে শুধু সময় ব্যবধানের।

কিন্তু এ-প্রসংগের আদত বিষয় কী শুধু এইটিই ? সম্ভবতঃ নয়। আদত বিষয় হোল, এই সংঘাত অন্য সব ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পারলেও কেবলমাত্র শ্রেণীহীন সমাজের দিকেই এগিয়ে যাবে কিনা ? এবং যাঁরা এখানে নেতৃত্ব দেবেন (কার্ল মার্ক্সের ধারণা ছিল, এ যোগ্যতা থাকবে কেবল কমিউনিস্টদেরই) তাঁরা সেই নেতৃত্বে অবশ্যম্ভাবী শ্রেণীচরিত্র .প্রতিরোধ করে জনতার সঙ্গে সমশ্রেণীভুক্ত হতে পারবেন কি না ? আর সবশেষে সকলের সব কর্তৃত্বের অবলুপ্তি ঘটিয়ে একদিন রাষ্ট্রকে সার্বিক কর্তৃত্বে ন্যস্ত করা সম্ভব হবে কিনা ? কার্ল মার্ক্স যেভাবে এ-সম্ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্টরা কোথাও তা করেননি। আর যে-যুগ ও পরিবেশে দাঁড়িয়ে মার্ক্স ও-কথা বলেছিলেন এবং তাঁর চিন্তায় ওই সম্ভাবনাটা সহজ হয়ে উঠেছিল, সেযুগও বহু পূর্বেই গত হয়েছে। এরপর সমাজে নতুন চেতনা জেগেছে, নব নব অভিজ্ঞতায় সে-চেতনা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। কাজেই আজকের এই পরিবর্তিত সমাজে দাঁড়িয়ে মার্ক্স কী বলতেন সে-কথা কেউই স্পষ্ট বলতে পারেন না। কিন্তু এ-ধারণা

অনেকেরই কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন সমাজই এক অবাস্তব কল্পনা। এবং মার্ক্সের ওই কল্পিত সমাজেও আর পাঁচটি সমাজের মতই পরস্পর সংঘাত, সংঘর্ষ ও শোষণ চলতে পারে। একই স্ববিরোধিতা ও ধ্বংসের বীজও নিহিত থাকতে পারে। হয়ত তখনকার সেই পরিবেশের নির্মমতায় এই সত্য তাঁর চেতনায় জাগেনি, অথবা প্রয়োজনের তাগিদে একটি কল্পিত আশাবাদ এ-চেতনাকেই স্তব্ধ রেখেছিল। এতে তাঁর ক্রুটি নেই। মার্ক্স সে-যুগের পরিপূর্ণ চেতনালব্ধ মানুষ। যদিও তাঁর মানসপুত্ররা এই চেতনার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং যার ফলে তাদের প্রকৃত মূর্তি অদৃশ্য থেকে সেখানে এক অতিমানবীয় মূর্তির আবির্ভাব ঘটতে পেরেছিল। একে সত্য বলে মেনে নেবার প্রবৃত্তি হয়ত সকলের নেই, কিন্তু এর প্রাপ্য মূল্যটা যে মানুষকে কড়ায় গণ্ডায়ই মিটাতে হচ্ছে একটু দূরদৃষ্টি থাকলে সেকথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

মার্ক্স বক্তব্যে আছেঃ 'ধনতন্ত্রই শ্রেণীহীন বা সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রধান শত্রু'। 'প্রধান শত্রু' অর্থাৎ, একমাত্র শত্রু যে নয় এ-ধারণা তাঁরও ছিল। যদিও তাঁর বক্তব্যের সার কথা হোল, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকলে তবেই সে-ধন সার্বিক সমাজের ক্ষতি করার শক্তি পায়। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকলে এই শক্তি তার থাকেনা। এটা বোধ হয় তাঁর কল্পনা। তবে এ-কল্পনাও দানা বাঁধতে পারে সমাজে এক অতিমানবীয় সত্তার আবির্ভাব ধরে নিলে, কারণ সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত, তথা সরকারী আমলাধীন হলে ওই ধনই যে সমাজের বৃহত্তর ক্ষতি করতে পারে এবং কেবল শ্রেণীহীন সমাজ বা সমাজতন্ত্র কেন, অধিকাংশ মানুষের আত্মীক স্বাধীনতারই প্রধান শত্রু হতে পারে, এর কোন আভাস মার্ক্স বক্তব্যে নেই। মনে হয় সর্বরিপুজয়ী একদল কল্পিত প্রাজ্ঞ আর সদাশয় ব্যক্তি তাঁর সমগ্র চেতনাকে ঘিরে রেখেছিল, কাজেই এই সত্য উদ্ঘাটনের অবকাশ তাঁর ঘটেনি। যদিও সে-প্রয়োজন অবশ্যই ছিল, তবে সেদিনের পরিস্থিতি কতটা এর জন্য দায়ী সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু ধনের গতিই যে একচেটিয়া আধিপত্যের দিকে এবং কোন ব্যক্তি

গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রযন্ত্র একক ভাবে যার নিয়ন্ত্রণেই থাক জনগণ থেকে এ যে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেই, এতে সন্দেহের কিছু ছিল না। বরং অধিক যুক্তিসম্মত ছিল এই কারণে যে, এরূপ ক্ষেত্রে ধনের সার্বিক কল্যাণশক্তি হ্রাস পায় এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের চেতনাকে আত্মকেন্দ্রীক করে সমাজে পরস্পর ব্যবধান ও সংঘাত নিয়ত বাড়িয়ে দিতে থাকে। সভ্যতার সূচনা থেকে প্রশাসন চরিত্র পর্যালোচনা করলে এই অতি রূঢ় সত্যটি অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আশংকায় ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত আধিপত্যে ধনের আত্মকেন্দ্রীক গতি যেটুকুও বা সংযত থাকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রাধীন তথা আমলাধীন হলে সেই প্রয়োজনই আর থাকে না। উপরন্তু এ সব ক্ষেত্রে এর স্বাভাবিক স্ফীতির শক্তি হ্রাস পেয়ে দেশের সাধারণ মানুষের বৈষয়িক অগ্রগতির ক্ষেত্রকে সঙ্কোচ করে আনে। কাজেই তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের কিছুমাত্র যোগাযোগ রাখতে হলে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সমষ্টিগত মানুষের কর্তৃত্বের স্থলে যে কোন সংজ্ঞায় ব্যক্ত আংশীক মানুষের কর্তৃত্ব থাকলে ধনের চরিত্র হবে শ্রেণীহীন শুধু নয়, সুস্থ সমাজেরই অন্তরায়।

এ প্রসঙ্গে অধিকাংশ সমাজতন্ত্রীদের বক্তব্য মার্ক্স বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি। অর্থাৎ সব কিছুকেই রাষ্ট্রের তথা, প্রশাসন জিম্মায় ন্যস্ত করতে হবে এবং যার উপরে থাকবে তাঁদের মনোমত কোন রাজনৈতিক দল। জনগণ চলবে এঁদেরই অভিপ্রায় অনুযায়ী।

খুব নমনীয় সুরেও যা এঁরা বলেন তার আদত অর্থ; ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত একাধিপত্য রোধ করাই সমাজের প্রথম কাজ। আর এর জন্য বৃহৎ শিল্প-বাণিজ্যকে যেমন রাষ্ট্রায়ত্ব করতে হবে, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবসাকেও সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, আর সব শেষে সমাজগ্রাহ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমুদয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর এরূপ কর ধার্য করতে হবে, যেন কোন ব্যক্তির পক্ষেই অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় সম্ভব না হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হোল, প্রথমত কোন গণতান্ত্রিক সমাজে জনগণের সমগ্র অর্থনৈতিক অধিকার এবং কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে নিয়ে যাওয়া

সংগত কি না? এবং কর ধার্যের পরিধি প্রস্তাবিত স্তর অবধি নিয়ে যাওয়া যদিও বা সম্ভব হয়, সে ক্ষেত্রে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতিই অক্ষুণ্ণ থাকবে কিনা? দ্বিতীয়তঃ সব কিছুকে রাষ্ট্রায়ত্ব ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে এনে সরকারী আমলাকুলের জিম্মায় ছেড়ে দিলেই সমাজে শ্রেণী প্রভাব বা শ্রেণী স্বার্থের কুফল বন্ধ হবে এবং সব কিছুই জনকল্যাণমুখী হয়ে শ্রেণীহীন বা একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের নির্ভরযোগ্য বাহন হয়ে উঠবে এটা আদৌ সম্ভব কিনা? আর সব শেষে এর জন্য একমাত্র ওই আমলাকুলই ভরসা এবং আর কোন রাস্তাই খোলা নেই, এই যুক্তি ন্যায়গ্রাহ্য কিনা?—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানার মত কোন তথ্যই কিন্তু পাওয়া যায়নি। এর সম্ভাব্য পরিণতি ও পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে সে-বিষয়েও স্পষ্ট একটি রূপরেখা নেই, অন্য দিকে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার কিছুটাও যেখানে প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে একটি বিরূপ চিত্রই ফুটে উঠেছে। প্রকাশিত তথ্য প্রমাণ করেছে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী কর্তৃত্বে থাকলে যেটুকু সমাজ ক্ষতিকর শক্তি পায় রাষ্ট্র কর্তৃত্বে থাকলে তারই সঙ্গে যুক্ত হয় ন্যায়বোধ, সহনশীলতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাব।

অনেকের মতে, 'সার্থক গণতন্ত্রই সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পথ,' সমাজ-তন্ত্রীরাও তাই বলেন। তাঁরা আরও বলেন, 'সমাজ-ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যেন কোন ব্যক্তিই সর্বেসর্বা হওয়ার পথ না পায়,' যুক্তি ও প্রয়োজনের দিক থেকে এ সবই যে অভ্রান্ত এতে সন্দেহ নেই, কিন্তু 'সার্থক গণতন্ত্র' অর্থে এঁরা কী বুঝাতে চাইছেন? কোন দলতন্ত্রই যে সার্থক গণতন্ত্র নয়,—সম্পূর্ণও নয় এবং কোন দলের পক্ষেই যে তাদের রাজনৈতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে সঠিক গণতন্ত্রের পত্তন করা সম্ভব নয়, এই সরল সত্যটা স্বীকার করতে আপত্তি কোথায় তাই কেউ বলেননি। মনে হয় অধিকাংশ বক্তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটা এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাই রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশে তাঁদের বাধা আছে। অথচ বঞ্চিত মানুষ সর্বদাই দ্রুত ফল ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। অনাগত ভবিষ্যতের আশায় অপেক্ষা করার ধৈর্যও তাদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত নয়। সেটা

'সম্ভব' এ চিন্তা হয়ত হৃদয়হীনতারই নামান্তর। দীর্ঘ অনাহার শেষে ভূরিভোজের আশ্বাসে খুশী থাকার দিন এদের ক্রমশঃই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই শুধু তত্ত্বকথায় বাজিমাৎ করা আজ শক্ত। এ বোধ আছেও সকলেরই। কিন্তু বিশেষ একদল মার্কস ভক্ত একে যত সহজে কাজে লাগাতে পারেন অন্যের পক্ষে তা সম্ভব নয়। ওই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদেরও নয়। ধনের শোষণশীল ক্রিয়াগুলি এঁরা এমন নিপুণতায় জনসমক্ষে তুলে ধরেন, যা থেকে সহজেই ধারণা জন্মে যে, শুধু অ-কমিউনিস্ট সমাজেই মানুষ শোষিত ও বঞ্চিত হয়ে থাকে এবং কমিউনিস্ট সমাজ ব্যতীত এর প্রতিকার আদৌ সম্ভব নয়। এই ধূর্ত প্রচার সত্যকে দীপ্তিহীন করতে পারে না ঠিক, কিন্তু সমাজে বঞ্চিত যারা, শোষিত যারা তাদের মানসিক ও সামাজিক ধ্যান-ধারণার উপর অবশ্যই প্রভাব ফেলে। এর একটা বড় কারণ ঃ কোন আদর্শ আর আশ্বাসই এখানে ফেলনা নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় হোল, এই আদর্শ আর আশ্বাস যদি তার কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীর কুৎসা ভূষিত এবং তাকে পরাজিত করার আস্ফালন সমৃদ্ধ হয় তবে তার কার্যকারীতা আরও বাড়ে। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ কোন নেতৃত্বের প্রয়োজন পড়ে না। ভারতে নকৃশাল আন্দোলন এর জ্বলন্ত প্রমাণ। তবে এ থেকে শ্রেণীহীন বা সমাজতান্ত্রিক সমাজের নিশানা পেতে গেলে সকল যুক্তিই হয়ত খেই হারিয়ে ফেলবে।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট শাসন

রাষ্ট্র যদি হয় সমগ্র রাষ্ট্রমানুষের তবে কিছু বলবার বিষয় তাদের অবশ্যই থাকবে। বলার অধিকারও থাকবে। আর এই বক্তব্য বিষয় একই হবে এবং একই ঢংয়ে সকলে ব্যক্ত করবে এরও কোন যুক্তি নেই। রাষ্ট্রের উপর সর্বসাধারণের কিছুমাত্র অধিকার স্বীকার করলে তাদের অভিমত প্রকাশের অধিকার কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। বিশেষ করে শ্রেণীহীন সমাজ বা সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল চরিত্রই হোল সে-সমাজ সব দিক থেকে সম অংশে সকলের।

অথচ লক্ষ্য করার বিষয়, শ্রেণীহীন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের পথ নির্দেশক কার্ল মার্কসের মানসপুত্রদের সমাজে এই অধিকারই হোল সব থেকে গৌণ বিষয়। গণমনের ধ্যান-ধারণার স্বাভাবিক প্রকাশ অধিকার এঁদের যুক্তিতে 'বুর্জোয়া সমাজের তামাসা।' সমাজের আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা মতামতের কোন যুক্তিগ্রাহ্য মূল্য থাকা সম্ভব এও এঁদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ সঠিক কোন সিদ্ধান্তের প্রশ্নে এই মানুষগুলো 'মোটেই বিজ্ঞ নয়।' সেটা নাকি 'সম্ভবও নয়'। এই প্রাজ্ঞতা আছে কেবলমাত্র 'দলীয় নেতাদের।' এবং 'তারাই সঠিক ক্ষণে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আর প্রতিটি দেশবাসীর সকল জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর দিতেও পারেন।'

অতি গোঁড়া ধর্মগুরুরাও হয়ত তাঁদের অনুগত ভক্তগণকে এতটা অন্ধ বিশ্বাসের বাণী শুনাতে ভরসা পাবেন না। তবে কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্রীরা শুধুমাত্র বাণীর উপর নির্ভর করে থাকেন তা নয়, সে বাণী গদ গদ চিত্তে অনুসরণ করাবার জন্য বিকল্প পথও খোলা রাখেন।

এঁদের তত্ত্বে আছে, 'সঠিক সমাজতান্ত্রিক সমাজে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকা উচিৎ এবং তাঁদের হাতেই রাষ্ট্রকর্তৃত্ব থাকা চাই। কিন্তু যেহেতু আর সব রাজনৈতিক দলই বুর্জোয়া শ্রেণী চরিত্রে লিপ্ত, সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি ভিন্ন জনগণের দাবী মেটাবার সঠিক শক্তি আর কারো থাকতে পারে না।' এ তত্ত্বে আরও আছে 'রাজনীতির দিক থেকে জনগণ কখনই সচেতন নয়। আর কমিউনিস্ট পার্টি হোল এই জনগণেরই অছি। কাজেই এই অছির অধীন বা এর সাহায্যপুষ্ট মানুষের স্বতন্ত্র কোন চিন্তারই প্রয়োজন নেই।'

স্থায়ী আধিপত্য বিস্তারে এবং সরল বিশ্বাসী ও অজ্ঞ মানুষদের তাঁবেদার করে রাখার কী নিষ্ঠুর যুক্তি। অন্যদল থাকলে তার সন্ধানী দৃষ্টিতে ভিতরের আসল বস্তু ধরা পড়বে আর স্বতন্ত্র চিন্তার প্রশ্রয় থাকলে তার অনুসন্ধিৎসা সত্য সন্ধানে সক্রিয় হবে, সুতরাং শুরু থেকেই সে-পথ রুদ্ধ করা চাই।

এঁদের ভোট গ্রহণ আর নির্বাচন ব্যবস্থাও এক অভিনব আবিষ্কার।

দল একটিই—তার অপ্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ অথবা বাইরের কেউ নির্বাচন প্রার্থী হলেও দলীয় কর্তারা যাঁদের মনোনয়ন দেন সকলকে ভোট দিতে হয় তাঁদেরই। এক্ষেত্রে বিরোধীতার পরিণতি কখনই শুভ হয় না বলে লোকে ওপথে চলে না। ভোটাধিকার পাওয়ার পূর্বেই সকলে জেনে যায়; সরকার-মনোনীত ব্যক্তির বিরোধীতা আদৌ সুস্থ জীবন যাপনের অনুকূল নয়।

সুস্থ সমাজের একটি প্রধান লক্ষণ হোল, ব্যক্তি স্বাধীনতা যে মানুষের জন্মগত অধিকার এ-বিষয়ে সকল মানুষই সেখানে একমত। আর এও তারা স্বীকার করে যে, পরস্পর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও প্রীতির বন্ধন না থাকলে এ-অধিকারের সামাজিক কোন মূল্য থাকে না। এর নৈতিক মূল্যও কিছু থাকে না। বিশ্বাসই এর ভিত্তি। কিন্তু কমিউনিস্ট সমাজে বোধহয় এই ধারণাগুলি যুক্তিযুক্ত নয়। বরং সন্দেহ, অশ্রদ্ধা আর অবিশ্বাসই অধিক যুক্তিসিদ্ধ অবলম্বন। অনাবশ্যক প্রভাব স্তব্ধ রেখে সামাজিক মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্কোচন অবশ্যম্ভাবী এই ধারণার প্রকাশ এর প্রতিটি ক্ষেত্রে। এঁদের হয়ত বিশ্বাস, এই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে জনমনে অবিশ্বাস ও ঘৃণার বীজ যেমন অঙ্কুরিত রাখতে হবে প্রতি-পক্ষকে দলনের জন্য; তেমনিই এ-মনের স্বাধীনতা হরণ করতে হবে এই মতবাদ ও কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য। কাজেই এতে কেউ প্রতিবন্ধক না হতে পারে তারই জন্য চাই অন্য দলের অবলুপ্তি। সত্য প্রকাশের অধিকারই যে প্রকৃত স্বাধীনতা, এই বোধ জাগিয়ে রাখার কোন সুযোগই হয়ত এঁরা রাখতে চান না।

বলা হয়ে থাকে 'কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে আজ যে-সমাজ গড়ে উঠেছে সেটা হোল সমাজতন্ত্রের প্রথম স্তর, এর পর আরও কয়েকটি স্তর অতিক্রমণের পর তবেই সমাজতন্ত্রে পৌছান সম্ভব হবে। তবে মার্কস্-লেনিনের যে-পথ ধরে সমাজ চলেছে সেই পথ ভিন্ন চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব নয়।' এই বক্তব্যের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ হবার মত কোন তথ্য অবশ্য আজও কেউ পায়নি। কমিউনিস্ট শাসনের সুদীর্ঘ প্রায় ছয় দশক অতিক্রান্ত হলেও আজও তাঁদের ওই প্রথম স্তরই শেষ

হয়নি। এর ঠিক পরের স্তরের জন্যই আরও কতকাল অপেক্ষা করতে হবে সে-তত্ত্বই কেউ প্রকাশ করতে পারেননি। হয়ত অনন্ত কালই মানুষকে আজকের এই স্তরে আবদ্ধ থাকতে হবে, শ্রেণীহীন সমাজ বা সমাজতন্ত্র কল্পনার খাঁচা ছেড়ে নাগালের ভিতর কোন কালেই আসবে না। যদিও তাতে বর্তমান সমাজকর্তাদের কিছুমাত্র দুঃশ্চিন্তা থাকার কথা নয়। কারণ ততকাল অন্তত ওই অনাগত সমাজের স্বপ্নে বিভোর মানুষগুলো তাদের নিংড়ে রস বের করার মৌরসী স্বত্বটা এঁদের হাতেই রাখবে।

গণরস নিংড়ানো যন্ত্র অবশ্য সব সমাজেই আছে। এর তাত্ত্বিক সমর্থন কোথাও থাকে না, কিন্তু 'তথ্যও নেই' এটা প্রমাণ হয়নি। সকলের কাছে এও গোপন রাখা যায়নি যে, কেবল এরই ফলে সমাজের বৃহত্তর সংখ্যক মানুষের আত্মীক উৎকর্ষতা ও নৈতিক মূল্য-বোধ স্তব্ধ রয়েছে। অথচ সমগ্র দেশবাসীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যে-উন্নততর সমাজপ্রবাহের প্রয়োজন, সকল অধিবাসীর আত্মীক উৎকর্ষতা আর নৈতিক মূল্যবোধই তার প্রধানতম অবলম্বন। স্বাধীন চিন্তা ও স্বনির্ভর কাজের পরিবেশ ভিন্ন এর উৎপত্তি, বিকাশ ও স্থিতি আদৌ সম্ভব নয়। তবে অকমিউনিস্ট সমাজে প্রতিবাদের পথ একেবার রুদ্ধ নয়, তাই বিরূপ পরিবেশেও মানুষ একেবারে থেত্‌লে যায় না। কিন্তু কমিউনিস্ট সমাজে এই বোধটাই রাখা হয় স্তব্ধ করে, এর সঙ্গে মূল বিষয়ের সম্বন্ধ খুব বেশী নয়, কারণ প্রতিবাদের শক্তি কেবল ব্যক্তি-চেতনার গতিই কিছুটা সক্রিয় রাখতে পারে, সঠিক প্রাপ্য আদায় তাতে হয় না। অথচ কমিউনিস্ট সমাজে এটুকুও অসহ্য। সেখানে গোড়াতেই জানিয়ে দেওয়া হয়—'ব্যক্তির স্বতন্ত্র কোন মূল্য নেই, গুরুত্ব নেই তার জন্মদাত্রীর, রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই তার জন্ম, বিকাশ ও স্থিতি।' কার্ল মার্কস্‌ এমন কথা বলেছেন বলে জানা নেই, এটা ওদের নিজস্ব উদ্ভাবন। অনুন্নত ও অন্য শোষণশীল সমাজে মানুষের আত্মীক সত্তা শিথিল হয়ে যায় অর্থনৈতিক চাপে পড়ে। আর কমিউনিস্ট শাসনের শুরু থেকেই এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয় যেন কারো আত্মসত্তার অবাধ বিকাশই সম্ভব না হয়।

কমিউনিস্ট প্রচারে আছে, 'জনগণই দেশের সব কিছুর মালিক, অন্য কোন মালিক নেই, কাজেই কোন শোষকও নেই।' অথচ এর সঙ্গে বাস্তব অবস্থা মিলালে স্পষ্টই দেখা যাবে, সমগ্র সম্পদ রাষ্ট্রাধীন হয়েছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শোষণ ও বঞ্চনার পথও রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু সরকারী আমলাকুলের আধিপত্যে ও দলীয় প্রতাপে রাষ্ট্রের শোষণ এবং জনগণের পরনির্ভরতা যতটা বিস্তৃত হতে পেরেছে পৃথিবীর সর্বাধিক শোষণশীল কোন সমাজেও তা হয়ত পারেনি। চমক লাগানো যেসব উন্নতি ওখানে হয়েছে স্পষ্ট প্রমাণ আছে, তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্বন্ধ খুব সামান্যই। এখানে অফিসার শ্রেণী, দলীয় কর্তা ব্যক্তি, কলকারখানার ম্যানেজার এবং সৈন্য ও পুলিশবাহিনী ভিন্ন আর প্রায় সকলেই তাত্ত্বিক অর্থে শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রমিকদের একটা বিরাট অংশ আবার কোন মজুরীই পায় না। পরিমিত আহার ও বাসস্থানের বিনিময়ে এরা কঠোর পরিশ্রমে বাধ্য হয়। এরা জেলখানার কয়েদী বা শ্রম-শিবিরের অধিবাসী। এদের প্রতি করুণার অবকাশ থাকে খুব সামান্যই। এমন কি এরা যে পরিপূর্ণ মানুষ তাও এক সময় ভাবা হয়নি। এর কারণ এরা সকলেই দেশের তথা পার্টির শত্রু, বিরুদ্ধ মতের ব্যক্তিরা ত বটেই, একদা আত্মসচেতন ও বিবেকবান মানুষও এই সমাজে 'দেশের শত্রু' রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। এঁদের কেউবা 'বুর্জোয়া', কেউ ধনতন্ত্রী বা সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল। কিন্তু ব্যক্তিত্ব, প্রতিপত্তি বা সামাজিক অবস্থিতিতে যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার যোগ্য তাঁদের বাঁচার পথ মুক্ত রয়েছে খুবই সীমিত ক্ষেত্রে। আর এই সকল 'শ্রেণী শত্রু'দের ভিতর শারীরিক অযোগ্য ব্যক্তিরা বেঁচে থেকে রাষ্ট্রের অন্ন ধ্বংসের সুযোগ প্রায় কোন ক্ষেত্রেই পায়নি। এই শত্রু ধরার ফাঁদ এমনই ছিল যে, মৃত্যুকে পূর্বাহ্ণে বরণ করতে না পারলে এ-ফাঁদ এড়াবার দ্বিতীয় রাস্তা ছিল না। আজ এর পরিবর্তন কিছু হয়ে থাকলে কী ভাবে ও কতটুকু হয়েছে সে-তথ্য এখনও স্পষ্ট হয়নি।

অত্যাবশ্যক পণ্য নিয়ন্ত্রণের যুক্তি, মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর এর প্রতিক্রিয়া এবং জাতির শ্রমশক্তির অপচয়

কোন স্থিতিশীল ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হলে প্রথমে সেই পরিবর্তনীয় বিষয়টিকেই সব দিক থেকে জানা চাই। এই জানাটা সঠিক না হলে পরিবর্তনের যৌক্তিকতা যুক্তিগ্রাহ্য স্তরে পৌঁছে না। কেন পরিবর্তন, কীভাবে পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য পরিণতির একটা যুক্তিসিদ্ধ চরিত্র সৃষ্টি না হলে এর আকাঙ্ক্ষিত কোন শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়। পণ্য উৎপাদন ও বন্টনেও একথা প্রযোজ্য। কারণ সমাজের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে অবাধে চলাই যার স্বাভাবিক গতি সে-গতি নিয়ন্ত্রিত হলে যে-ফল দর্শে তার কিছু বিরূপ তথ্য ইতিহাসে আছে।

পণ্যমূল্য ও তার পরিমাণকে সরকারী প্রশাসন কর্তৃত্বে আবদ্ধ করার তাত্ত্বিক যুক্তি, সার্বিক সমাজের স্বার্থ রক্ষা করা। অকারণ মূল্য বৃদ্ধি অথবা যোগান স্বল্পতা থেকে এ-প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যোগান থেকেও এটা দেখা দিতে পারে, তবে তার গণ্ডী থাকে শুধু উৎপাদনে, ব্যবহারকারীর সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু যুক্তি যাই হোক, ঘটনার স্বাভাবিক গতি প্রতিরোধে এক বা একাধিক শক্তির একাধিপত্যের অর্থই হোল নিয়ন্ত্রণ। অথবা বলা চলে, নিয়ন্ত্রণ হোল শ্রেণী বিশেষ কর্তৃক সার্বিক মানুষের ভাগ্য নির্ণয়ের অধিকার গ্রহণ। যদিও এটা এর অব্যক্ত অংশ। ব্যক্ত অংশে থাকে, কোন ব্যবস্থা যখন তার আরব্ধ চরিত্র হারিয়ে ফেলে সার্বিক স্বার্থের পরীপন্থী হয়ে ওঠে তখন রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হয় তাকে স্বাভাবিক গতিসীমায় ফিরিয়ে আনা। রাষ্ট্রের এই কর্তব্যেরই ব্যবহারিক অর্থ নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং সরল বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ কোথাও এর বাহ্যিক ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করলেও উদ্দেশ্যের ন্যায্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে না। ফলে এটাও হয়ত মদত

যোগায় সরকারী আমলা কর্তৃত্বের যুক্তিকে। এ-কর্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত কিনা সেটা নির্ভর করে সমাজ-ব্যবস্থার চরিত্রের উপর। আর যে হেতু পরিচিত সকল সমাজই কম-বেশী সরকারী আমলা নিয়ন্ত্রিত, কাজেই এক্ষেত্রে কেবল এটুকুই বিবেচ্য হতে পারে—অন্য কোন সমাজ-বিরোধীতার মোকাবিলায় এই আমলারা যা করতে পারেন, কোন পণ্য-উৎপাদন ও বণ্টনে তা পারেন কিনা? আর সব শেষের বিবেচ্য বিষয় হোল, 'উৎপাদন ও বণ্টনে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের বিকল্প সরকারী আমলা' এ-সিদ্ধান্ত এর ভবিষ্যতের পক্ষে যুক্তিসম্মত কিনা?

এ-সম্বন্ধে আজ সকলের ধারণাই স্পষ্ট হয়েছে যে, পণ্য-নিয়ন্ত্রণ কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষকে নয়, সমাজের সকল মানুষকেই অপরের কর্তৃত্বাধীন ও কিছুটা করুণাধীন করে ফেলে। যার ফলে অধিক সংখ্যক মানুষের স্বাধীন সত্তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। একে প্রতিরোধ করা শক্ত। শুধু ভারতে নয়, যেখানে সমগ্র বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির গতিও নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ সমাজটাই এক কঠোর নিয়মে আবদ্ধ এবং ভারপ্রাপ্ত-তদারককারীদের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতির পরিণতি ধার্য রয়েছে সমাজচ্যুতি, শ্রমশিবির অথবা মৃত্যুদণ্ড সেখানেও এর বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়নি। মানুষের বাঁচার অবলম্বনগুলি যে ভাবেই হোক, অপরের কর্তৃত্বাধীন থাকলে এই ফল লাভ অসম্ভব। আর সরকারী আমলাকর্তৃত্বে এ-সম্ভাবনা আরও দূরাগত হয়। কিন্তু কেন?

এর উত্তরে একদল যুক্তিবাদী মানুষ 'শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের বিকল্প সরকারী আমলা' এই তত্ত্বের সঙ্গে সমগ্র তথ্য উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন, এর সঙ্গে যে-ব্যবসায়িক চেতনা ও লাভ-লোকসানের সম্বন্ধ জড়িত থাকে পণ্যের উৎকর্ষতা এবং ক্রেতার রুচি আর স্বার্থ ই সেখানে প্রধান। কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে পণ্যের উৎকর্ষতা বা ক্রেতার সম্পূর্ণ স্বার্থ নাই হোক, বাজারের চাহিদার সঙ্গে এর যতটা সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক অন্তত সেটুকু বিস্মরণ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ব্যবসার স্থায়িত্ব ও অগ্রগতি এর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সরকারী আমলার কাছে এর মূল্য কী? লাভ, লোকসান, পণ্যের উৎকর্ষতা বা ক্রেতার মানসিকতা এর একটির সঙ্গেও সরকারী আমলাদের প্রাপ্য ও ভবিষ্যতের সম্বন্ধ নেই, অন্তত

আজকের শ্রেণী শাসিত সমাজে শ্রেণী স্বার্থের অবলম্বন বলে এই সম্বন্ধের বিষয় স্মরণে থাকা সম্ভব নয়। এঁদের সম্বন্ধ কেবল রাজকোষের সঙ্গে। এর সঙ্গে ব্যক্তিগত সততা-অসততা বা যোগ্যতা-অযোগ্যতার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই, সম্বন্ধ কেবল নীতির সঙ্গে। কিন্তু অপরের কাছে করুণা চাওয়ার প্রয়োজন এবং অপরের তা দেবার অধিকার যদি সামাজিক নিয়মে আইনসিদ্ধ হয় তবে সে-ক্ষেত্রে পরস্পর সংঘাত যেমন কিছু থাকেই, তেমনি সে-সংঘাতে দুর্বল জনগণই পরাজিত হয় এবং শ্রেণীস্বার্থ স্থিতিলাভ করে। সার্বিক স্বার্থের প্রশ্ন থাকলে সেখানে সার্বিক কর্তৃত্বের বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু আপাতত এ-প্রসঙ্গ থাক।

দ্রব্যমূল্য এবং তার পরিমাণের উপর প্রশাসন কর্তৃত্বের পত্তন হয় এদেশে গত বিশ্বযুদ্ধের মধ্যভাগে। যদিও তার ব্যাপকতা এতটা ছিল না। সরকারী কর্তৃত্বে এসেছিল প্রধান কয়েকটি খাদ্য শস্য, বস্ত্র ও কিছু অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। অথচ এরই ধাক্কায় একমাত্র বাংলামুলুকে প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় ৫০ লক্ষ তাজা মানুষ এবং শুধু এই প্রাণ রক্ষার তাগিদে সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হয়েছিল আরও প্রায় ৫০ লক্ষ পরিবার। অন্য দিকে এই নিয়ন্ত্রণের মওকা থেকেই কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটেছিল এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এবং ফুলে ফেঁপে ভারি হয়েছিলেন একদল সরকারী কর্মচারী। এটা শুধুই অতীতের ইতিহাস বলে যাঁরা স্বীকার করেন না তাঁরা অবশ্য স্পষ্টই বলেন, সমষ্টি মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার উপকরণগুলি সরকারী আমলা কিংবা শ্রেণী বিশেষের এক্তিয়ারে থাকলে সেখানে অন্য কোন পরিণতিই প্রায় অসম্ভব। এঁরা আরও বলেন, বস্তুত এ হোল নির্বিরোধী এক ধূর্ত জমিদারী প্রথা। এই জমিদারী থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কার কতটা রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে তার সঠিক পরিমাপ করতে পারে হয়ত দেশের উৎসাহী যুব সমাজের সক্রিয় সহযোগীতায় ঝানু আয়কর কর্মীরা। যদিও সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ভিন্ন সেটাও খুব সহজ নয়।

পণ্য নিয়ন্ত্রণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে ন্যায়ের প্রভাব আদৌ নেই একথা কেউ বলে না। কিন্তু ধূর্ত-ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার ভিতর

থেকে যত সহজে ও যত দ্রুত সমাজের দুর্বল অংশকে নিংড়ে নিঃস্ব করতে পারে অন্য আর কোন ব্যবস্থায় তা কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রবক্তাদের প্রত্যক্ষ কোন স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত কিনা সে-তত্ত্ব কেউ জানে না। কিন্তু এর নিষ্পেষণে জর্জরিত উপায়হীন মানুষ তাদের ব্যর্থ বিরক্তির দাহ থেকে যখন বলেন 'আদতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হোল গল্পে বর্ণিত জীব বিশেষের সেই পিঠে ভাগের ব্যাপার' তখন তারই কী জোরালো প্রতিবাদের যুক্তি মেলে কিংবা পণ্য নিয়ন্ত্রণের প্রায় ৩০ বছরের ইতিহাসের অধিকাংশই যেখানে দুষ্ট কালিতে লিপ্ত এবং যে দেশের ২৫ বছরের সংবিধান প্রায় ৩০ বার সংশোধন হলেও কেবল ওই দুষ্ট-কালি লেপনকারীদেরই কোন সংশোধনের পথ মেলেনি সেখানে সর্ববিদ্যাবিশারদ ও সর্ব শক্তিমান কর্তাব্যক্তিদের মনোগত বাসনার উপর কারো সন্দেহ জাগলে তার প্রতিবাদেরই বা যুক্তি কোথায় ? আর যুক্তিসিদ্ধ কোন বিকল্প না পাওয়ার যুক্তিকেই কী কেউ নির্বিচারে মেনে নিতে পারে ?

অত্যাবশ্যক পণ্যের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হতে এখনও বাকী আছে, কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার উপরও কিছুটা সরকারী দৃষ্টি পড়েছে। খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা অধিগ্রহণ হয়ত এর প্রথম ধাপ। অথচ এর ঐতিহাসিক নজির কী ?

স্ট্যালিন কৃষকদের জোর করে যৌথ খামারের অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে সরকারী আমলা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একে তিনি দ্রুত কৃষি উৎপাদনের অপরিহার্য পদক্ষেপ বলেছিলেন। কিন্তু সংবাদে প্রকাশ, এর প্রতিক্রিয়ায় ১৯৩২ সালে রাশিয়ায় যে-সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ হয় তাতে প্রায় ১ কোটি লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটে। রাশিয়ার ভৌগলিক সীমার পরিধি ভারতের প্রায় ৬ গুণ। পাহাড়, মরুভূমি আর প্রাকৃতিক অনুর্বরতা সেদিন অবশ্যই কিছু প্রতিবন্ধক ছিল। কিন্তু লোক সংখ্যা ছিল বর্তমান ভারতের ১/৩ অংশেরও অনেক কম। সর্বোপরি স্ট্যালিনের মত জবরদস্ত একনায়ক ছিলেন সকল ব্যবস্থার নিয়ামক। কমিউনিস্ট শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রয়োজন ও প্রেরণা ছিল তাঁর অতি উচ্চ মার্গে। কিন্তু তবুও তিনি এই বিপর্যয় প্রতিরোধ

করতে পারেন নি। আর শুধু সেদিন কেন, এর পরেও যে রাশিয়া খাদ্যে সুনিশ্চিত স্বয়ম্ভর হতে পারেনি তার জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে গত ১৯৬৩-৬৪ সালে টন টন সোনার বিনিময়ে তথাকথিত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহে আর গত ১৯৭২-৭৩ সালে প্রায় ওই একই দেশের সঙ্গে গম, বার্লি প্রভৃতি খাদ্য আমদানির এক দীর্ঘমেয়াদী বিরাট আকারের চুক্তিতে। তবে এবার শুধু রাশিয়া একা নয়, সরকারী আমলা-নির্ভর সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম অনুসারী চীনও আমেরিকার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ গম আমদানির এক দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করেছে। কাজেই এ-বিষয়ে সরকারী আমলা প্রভুত্বের ইতিহাসে কোথায় কি তথ্য আছে জানতে হলে এই দু'টি অধ্যায় পাঠই বোধহয় যথেষ্ট হবে।

অবশ্য রাশিয়ার শিল্পোন্নতির মূলে ছিল এই স্ট্যালিনেরই তিনটি মোক্ষম অবদান। যথা :—

(১) কৃষিক্ষেত্রে জবরদস্তি যৌথ প্রথা প্রবর্তন করে ও সমগ্র কৃষি-ভূমিকে আমলা কর্তৃত্বে এনে কৃষকদের রস নিংড়ে বের করা।

(২) সম্পদশালীদের সমগ্র সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাদের নিঃশেষে মুছে ফেলা বা শ্রমদাসে পরিণত করা এবং—

(৩) বিরোধী মতের সকল সক্ষম মানুষকে বন্দী শিবিরে পুরে তাদের সবটুকু শ্রমশক্তি নিংড়ে বের করে মূলধনে পরিণত করা।

মূলধন সংগ্রহের এই স্ট্যালিনী কৌশল যদিও প্রায় সকল কমিউনিস্ট শাসকদেরই প্রধান অবলম্বন, তবে স্ট্যালিন হয়ত কিছুটা দ্রুত তালে এর প্রয়োগ করেছিলেন। অর্থাৎ 'শ্রমই যে প্রকৃত মূলধন' কার্ল মার্ক্সের এই বাণীকে তিনি কমিউনিস্ট ব্যাখ্যায় শোধন করে অতি দক্ষতায় কাজে লাগিয়েছিলেন। এই মূলধনের চাহিদা যত বেড়েছে, 'জনগণের শত্রু' ধরার ফাঁদও তাঁর তত বিস্তৃত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে খুব কম পরিবারই সেদিন ছিলেন যাঁর অন্তত একজনও এই স্ট্যালিন মার্কা অপরাধের বলি হয়নি। এর সঙ্গে ভারতের আলোচ্য ব্যবস্থাপনার হয়ত সম্বন্ধ নেই, কিন্তু প্রশাসন-নির্ভরতায় মিল কোথাও নেই একথাই কী জোর করে বলা চলে?

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও কয়েকটি রাজ্য সরকারের প্রতিবেদনে যে তথ্য ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে দেখা যায়, ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার গুদাম থেকে কয়েক কোটি টাকার খাদ্য শস্য খোয়া গেছে (চুরি বলা আইন বিরুদ্ধ), বহু লক্ষ টাকার চাল-গম মনুষ্য খাদ্যের অযোগ্য হয়েছে, প্রচুর ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য ওখানে পাওয়া গেছে, হিসেবের কারচুপি প্রকাশের মুখে একটি গুদামের পাঁচ লক্ষ টাকার খাদ্য পুড়ে ছাই হয়েছে এবং রেশনে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রেশনে যে চাল বন্টিত হয় তাকে এদেশে উৎপন্ন চাল বললে দেশের প্রতিটি কৃষককেই অপমান করা হবে। এ ছাড়া আছে এর সংশ্লিষ্ট কর্মীদের অন্যান্য কৃতিত্ব ও দাবীর ইতিহাস, সে নাকি এক মহাভারত এবং যার একটি অধ্যায়ে আছে এঁদের চিকিৎসা সংক্রান্ত অর্থ আদায়ের অতি কৌশলী সব তথ্য।

অনেকে বলে থাকেন, 'আইন কঠোর হলে এমনটি হোত না।' আইন 'কঠোর' আর 'নরম' অর্থে এঁরা কী বলতে চান তা বুঝা হয়ত কষ্ট নয়, যদিও আইন কঠোর-নরম যাই হোক, অর্থ একই। অন্তত সভ্যতার মাপকাঠিতে। কিন্তু এদেশে কঠোরতার ইতিহাসও তো নেহাত ছোট নয়। এ সম্বন্ধে সদ্যশ্রুত এক চাল ব্যবসায়ীর বক্তব্যটা তুলে ধরা বোধহয় দোষের হবে না। ওই ব্যবসায়ী তার এক ক্রেতার প্রশ্নে বলেছিল, 'বাবু! মাত্র দু'দিনেই যে কেজি প্রতি এক টাকা দাম বাড়লো তার কারণ কিন্তু চালেরই কেবল দাম বেড়েছে তা নয়— লুকিয়ে চাল আনার খরচই আমাদের প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে। জানেন তো, এবার সরকার খুব কড়া হয়েছেন। চেক্ পোস্টে বড় বড় অফিসাররা এসেছেন। কাজেই পূর্বে যেখানে আমাদের ব্যাগ প্রতি খরচ হোত ১০ টাকা, এখন হচ্ছে সেখানে ৫০ টাকা।' এ-ধরনের কৈফিয়ত হয়ত আরো অনেকেই শুনে থাকবেন। আর তাইবা কেন? এইত সেদিনের কথা, কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীত্যাগরাজনের নেতৃত্বে তিন জনের এক সমীক্ষক দল পশ্চিমবঙ্গের মজুত উদ্ধার ব্যবস্থাকেই একটি 'প্রহসন' বলে অভিহিত করলেন, এই উদ্ধার কার্যও ছিল কঠোর ব্যবস্থার আওতায়। কিন্তু

এঁদের মতে 'পুলিশ, চোরা কারবারী এবং সরকার সমর্থক একদল নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকের চক্রান্তে এখানে ত্র্যহস্পর্শের সৃষ্টি হয়েছে। এই দুষ্ট চক্রের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন নি।' এঁরা আরও বললেন, 'করডনিং ব্যবস্থায় বহু পুলিশের সোনায় সোহাগা হচ্ছে।' (সংবাদ আনন্দ বাজার ৭।২।৭৪)। অবশ্য ১৫-৪-৭৫ সংখ্যায় এর চেয়েও বড় সংবাদ আছে। 'কালোবাজার' এই মূল্য-সংজ্ঞা এসেছে মূল্য নিয়ন্ত্রণেরই অনিবার্যতা থেকে। নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এ শব্দ হোত অর্থহীন। নিয়ন্ত্রণ শুধু পরিমাণের উপর নয়, মূল্যের উপরও—তাই নিয়ন্ত্রিত মূল্যের অতিরিক্তটাই হোল ওই 'কালো'। শ্রেণীকর্তৃত্বে একে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অন্তত আজও তা যায়নি। এর একটি কারণ সরবরাহের সঙ্গে চাহিদার অসঙ্গতি। মূলতঃ এই অসঙ্গতি থেকেই নিয়ন্ত্রণ। আবার এই অসঙ্গতিই কালোবাজারের পৃষ্ঠপোষক। অথচ মূল্য নিয়ন্ত্রণের তাত্ত্বিক যুক্তির প্রধান অংশেই থাকে এই কালো বা অতিরিক্ত মূল্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখার অভিপ্রায়। চাহিদাকে নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ রাখা এ-তত্ত্বের দ্বিতীয় অধ্যায়।

কিন্তু চাহিদার সঙ্গে অসংগতিই কী কালোবাজারের মুখ্য কারণ? এর সরল উত্তর একটু শক্ত। তবে সাধারণ মানুষ এর যে ব্যাখ্যা জানে তার একটি অংশে আছে, রাষ্ট্রকর্তারা শুধু আইন করে বা নির্দেশ দিয়েই কর্তব্য শেষ করেন তাই উৎপাদন, সংগ্রহ ও বন্টনের কোথায় এবং কী ভাবে কালোবাজার সক্রিয় হয়ে ওঠে সে-তথ্য তাঁরা জানেন না বা জানতে চান না। হয়ত ততটা সময়ও তাঁদের থাকে না। অথচ পণ্য নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী প্রায় সমগ্র দায়িত্বই বর্তে বে-সরকারী কর্তৃত্বে এবং যা লাইসেন্স, পারমিট প্রভৃতির মাধ্যমে হস্তান্তর হয়, এটা আইন ঘটিত ব্যবস্থা এবং নির্বাচিত নির্ভরশীল ব্যক্তিরাই কেবল এই লাইসেন্স বা পারমিট দেওয়া ও পাওয়ার অধিকারী। অর্থাৎ সৎ ও গণ-স্বার্থ রক্ষায় সক্ষম ব্যক্তিরাই কেবল এক্ষেত্রে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা? শুনা যায় এখানেই এমন সব রহস্য রয়েছে, যা সমগ্র তাত্ত্বিক ব্যবস্থাকেই ওলট-পালট করে দেয়। এই হস্তান্তর বা

দায়িত্ব বণ্টনের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছিবার নাকি এমন একটি গলি পথ আছে মোটা দক্ষিণা না দিলে যার হদিস মেলে না। ভুসিই হোক, বা চাল, চিনি, আটা, কেরসিন-কয়লাই হোক, সবের কাছে পৌঁছিবারই সহজ পথ ওই গলি। নিয়ন্ত্রণের মধ্যস্বত্ব বিলির ব্যবস্থায় এই পথ প্রায় অপরিহার্য। আর এর যে অংশ সরকারী আমলাদের খাস দখলে থাকে সেখানেও তদারকির দায়িত্ব বহনকারীরা এতই দক্ষ যে তাঁরা প্রায়শঃ সামনের দরজা না খুলে কেবল পিছনের দরজা দিয়েই সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম। এঁদের এই দক্ষতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছেন আজ গাঁয়ের কৃষকরা। যে-ধান বা যে-পাট তাঁরা নির্দিষ্ট মূল্যে এঁদের হাতে গছাতে অক্ষম হয়ে অনেক কম মূল্যে ফড়ের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন 'নিম্নমানের' এই কর্তব্যনিষ্ঠায়, ঠিক সেই ধান সেই পাটই মুহূর্তে সরকারী গুদামে স্বমহিমায় স্থান পাচ্ছে ফড়ের খাতায় ওই নিয়ন্ত্রিত নির্দিষ্ট মূল্য জমা পড়লে।

অপ্রকাশ্য দক্ষিণার সরল অর্থ নাকি ঘুষ। চালাক ব্যক্তিরা এর অন্য অর্থ জানলেও সাধারণ মানুষের তা জানা নেই, আর লাইসেন্স বা পারমিটের জন্য এটা যাঁরা দেন তাঁদের নীতিবোধ নিয়ন্ত্রণের তাত্ত্বিক গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকবে এও সাধারণ ব্যক্তিদের কাছে অবাস্তব। কাজেই এদের ধারণায় প্রথমত কালোবাজার থেকেই ওই দেয় দক্ষিণা সুদসহ আদায় হয়ে থাকে এবং যেহেতু এই দান কার্যের ভিতর দিয়ে দাতা তার গ্রহীতার কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন পায় তাই তার নিজের চাহিদা বাড়াতেও আর দ্বিধা থাকে না। এই চাহিদা মেটে ভেজাল থেকে। অর্থের প্রতি আকর্ষণ এমনিই এক মানসিক চেতনা যা অবাধ বিকাশের পথ পেলে ন্যায়বোধ আর সেখানে ঘেঁষতেই ভরসা পায় না। এ ভিন্ন নিয়ন্ত্রিত কোন বস্তুই যেখানে ন্যূনতম চাহিদা মত মেলে না, যেমন চাল, চিনি গম, সিমেণ্ট ইত্যাদি এবং যে প্রায় ৮০ ভাগ মানুষের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের সংগতি নেই বা সে-পথ জানা নেই, তাঁরা যতই উন্নত চরিত্রের ও আইনমান্যকারী হোন, উদরের অথবা অন্য প্রয়োজনের তাগিদে পূর্বোক্ত ব্যক্তিদেরই দ্বারস্থ হতে বাধ্য হন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, পণ্য নিয়ন্ত্রণের আদিতে প্রতিষ্ঠা

পাচ্ছে ঘুষ, পরে কালোবাজার ও ভেজাল এবং সর্বশেষ প্রায় সমগ্র সামাজিক মানুষের চরিত্রে এক অবাধ্য ন্যায়হীন প্রবৃত্তি। সহজ কথায় পণ্যনিয়ন্ত্রণ, বিশেষ করে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ গোটা সমাজকেই নৈতিক অধঃপতনের গহ্বরে নিমজ্জিত করছে। এই অধঃপতনের গতি এদেশে আরও দ্রুত হচ্ছে এই কারণে যে, নিয়ন্ত্রিত মূল্যে যে-বস্তুর আদৌ সাক্ষাৎ মেলে না বা মিললেও চাহিদার ক্ষীণ একটি অংশ মাত্র ; সেই বস্তুই অধিক তথা কালো মূল্যে যত খুশী পাওয়া যায়। হয়ত এরই ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষের এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল হতে সাহায্য করছে যে পণ্যনিয়ন্ত্রণের আসল উদ্দেশ্যই হোল বিশেষ কয়েক শ্রেণী মানুষের জন্য একটি অবাধ লুণ্ঠনের পথ মুক্ত করা। যদিও এ সবই অক্ষম মানুষের আত্মবিলাপ, ক্ষমতাগর্বী কর্মকর্তাদের কিছুই এতে যায় আসে না।

পণ্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর কিছু হস্তক্ষেপ করেই। বেশীর ভাগ মানুষ একে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না, ভিতরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধতে থাকে এবং তার ফলও হয় সুদূরপ্রসারী। ভারতবাসীর ভিতর যেসব কারণে নৈতিক অধোগতি ও দুর্নীতির প্রসার ঘটছে তার ভিতর পণ্যনিয়ন্ত্রণই বোধহয় প্রধান। এটা দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত তাই সব শ্রেণী থেকেই বেশ কিছু মানুষকে জড়িয়ে নেবার শক্তি এর প্রশস্ত। তা ছাড়া 'সততায় দুঃখের ভার বাড়ে' অথবা 'ন্যায়ের পথে কাম্য সব কিছুই থাকে অদৃশ্য' এ-ধরনের অশুভ ধারণা জন্মাতে অধিক মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই নিয়ত সাহায্য করছে। অভিজ্ঞতা বাড়ছে, সততার পরিণতি আজ শুধুই আত্মগ্লানী ও পরাজয় আর অসত্য ও অসততার নিয়ত শ্রীবৃদ্ধি। এদেশে এটা আজ একেবারেই শঙ্কাহীন উন্মুক্ত, লুকোবার প্রয়োজনই আর নেই। আর এরই আশুফল হয়েছে, ন্যায়বোধ, সারল্য, ধর্মভীতি ধূর্ত ব্যক্তিদের মত সাধারণ মানুষের মন থেকেও দ্রুত মুছে যাচ্ছে। অত্যাবশ্যক পণ্যকে গোষ্ঠী কর্তৃত্বে আবদ্ধ রাখার এটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যে-সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সামাজিক মূল্য ধার্য হয় মূলতঃ অর্থ মূল্যে, সেখানে

ন্যায়ের রাস্তা কণ্টকিত হলে মানুষের কাছে ন্যায়নিষ্ঠা আশা করা শুধু বাতুলতা। এ গেল একদিকের চিত্র।

কিন্তু পণ্যনিয়ন্ত্রণ কী উৎপাদনের উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে? এর সঠিক ও যুক্তিনির্ভর উত্তর দিতে গেলে অবশ্যই বলতে হবে, হ্যাঁ, করে। অবশ্যই করে। কারণ নিয়ন্ত্রিত চেতনামাত্রই বিক্ষুব্ধ এবং কর্মবিমুখ। সরকারী খাস-তালুকের প্রজা হতে প্রায় কোন উৎপাদকই চান না। লাইসেন্স, পারমিট, প্রশাসন-খপরদারী এর প্রত্যেকটিই উৎপাদনের গতি স্তব্ধ না হোক মন্থর কিছুটা করেই। এদেশে প্রাদেশিক বিভেদ প্রশস্ত করতে এর অবদান কতখানি একটু সতর্ক দৃষ্টি থাকলে সহজেই তা ধরা পড়বে। যদিও প্রায় প্রত্যেকেই জানেন, অবাধ ও গতিশীল উৎপাদন ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে প্রতিটি জাতির অগ্রগতি। এশিয়ার দুটি দেশ ভারত ও জাপানের ভিতর উৎপাদন ক্ষমতার প্রভেদ বিরাট। এর অনেক হেতু হয়ত আছে, কিন্তু সেই সমগ্র হেতু থেকে কেবলমাত্র সরকারী আমলা কর্তৃত্ব বাদ দিলে আর সবই হবে অত্যন্ত গৌণ। ভারত নকল প্রগতির খেসারত দিচ্ছে সবচেয়ে বেশী তার উৎপাদন ও জাতির নৈতিক চরিত্রে; আর জাতির ৮০ ভাগ মানুষ দ্রুত নিঃস্ব হচ্ছে, বেকার দশা বাড়ছে এক দুষ্ট বামপন্থী ইমেজের মূল্য দিতে যেয়ে।

অবশ্য পণ্যনিয়ন্ত্রণ হয়ত ক্ষেত্র বিশেষে অপচয় প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ সংযত রাখতে পারে। অপ্রতুল সরবরাহে এ-সংযমের প্রয়োজনও আছে। কিন্তু সার্বিক বিচারে দেখা যাবে—এ ক্ষেত্রেও ঘাটতি পূরণে যেটুকু সাহায্য করেছে উৎপাদন ঘাটতি থেকে মোট ঘাটতি তার বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সবশেষে এবং এ-প্রসঙ্গের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে-বিষয় সে হোল এর সঙ্গে জাতির শ্রমশক্তির সম্বন্ধ। নিয়ন্ত্রণের চরিত্রই হচ্ছে স্বাভাবিক গতিকে গণ্ডীবদ্ধ করা। চিন্তার গতি, ন্যায়ের গতি, চলা বা কর্মের গতি, সব গতিকেই এ গণ্ডীবদ্ধ করে ছাড়ে। টাকার অঙ্কে এর পরিমাপ করা প্রায় অসাধ্য। কিন্তু সবটাই এর অপচয় এবং অনগ্রসর কোন জাতির পক্ষে এ-অপচয় অপূরণীয়। ক্ষমাহীন এক অপরাধও। দেশের প্রতি কিছুমাত্র

মমতা থাকলে এতে সায় দেওয়া চলে না। কি ভাবে এই অপচয় হয়, বিশেষ করে শ্রমশক্তির, একটু হিসেব নিলেই তা জানা যাবে।

যেমন ধরা যাক, ভারতে লোক সংখ্যা ৫৫ কোটি আর পরিবার সংখ্যা কম-বেশী ১১ কোটি। এই ১১ কোটি পরিবারের একজন করে প্রতি সপ্তাহে যদি দু'ঘণ্টাও তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য রেশন ও অন্যান্য বস্তু সংগ্রহে ব্যয় করেন (নিয়ন্ত্রণের গতি চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছিলে এর কয়েক গুণ বেশী সময় লাগবে) তবে বছরে তাঁর ব্যয় হবে ১০৪ শ্রমঘণ্টা আর ১১ কোটি পরিবারের মোট ব্যয় হবে ১১৪৪ কোটি শ্রমঘণ্টা। ৭ ঘণ্টায় একটি শ্রমদিন ধরলে মোট শ্রমদিন হবে ১৬৪ কোটি এবং এর গড় মজুরী বা উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ৮ টাকা হলেও টাকার অঙ্কে ব্যয় হবে ১৩১২ কোটি টাকা। সম্ভবত শ্রম ব্যয় ও টাকার অঙ্কে এ হিসেব হবে সর্বনিম্ন, কারণ চাল, চিনি, আটা, তেল, কেরসিন, কয়লা, দুধ থেকে আরম্ভ করে সিমেণ্ট, লোহা, সার, বীজ, লাইসেন্স, পারমিট প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত সমগ্র বাঞ্ছিত বা আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করতে মাত্র দু' ঘণ্টা নয়, এখনই অনেক বেশী সময় লাগছে। পরিণত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এই হিসেব করাই হয়ত অসম্ভব হবে। যদিও সেদিন সে-প্রয়োজনও থাকবে না। পরিণত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এ-প্রশ্ন করার কেউ থাকে না। কিন্তু আজ যেহেতু রাষ্ট্রকে 'গণতান্ত্রিক' বলা হচ্ছে এবং ব্যবস্থার তাত্ত্বিক যুক্তিও 'অন্যায়ের প্রতিষেধক' কাজেই এর জন্য যে-মূল্য জাতিকে দিতে হচ্ছে তার একটা হিসেব রাখার প্রয়োজন তাদের আছে বইকি ?

পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে, ভারতের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ তাদের শেষ কপর্দক অবধি নিঃশেষ করছে এক অদৃষ্টপূর্ব প্রগতির জন্য। আর এ-প্রগতির জন্মলগ্নেই চাই এমন এক বামপন্থী ইমেজ, যা শুধু এই গণদেবতাদের অর্থমূল্যেই গড়ে ওঠে না, দরকার তাদের নৈতিক চরিত্রও। এরা তা দিচ্ছেও। সকলেই যে স্বেচ্ছায় দিচ্ছে তা নয়, তবু দিচ্ছে প্রায় সকলেই। তা হোক, আশ্বাস আছে, 'সুদিন আসছে।' হয়ত শেষের সেই সুদিন অনেকেরই আগতপ্রায়। তবে নগদ প্রাপ্তিটাই কী কম ? এই তো জ্বালানী কয়লা নিয়ন্ত্রণাধীন

থেকেও বেসরকারী কর্তৃত্বে মূল্য ছিল মণ প্রতি ৪ টাকা এবং তা পেতে সময় লাগত পার্শ্ববর্তী কোন দোকানে একটি সংবাদ পৌঁছে দেওয়া অবধি। অথচ এর ঠিক পরেই সরকারী কর্তৃত্বে এসে এর মূল্য দাঁড়ালো ৮ থেকে ১০ টাকা এবং সংগ্রহ করতে বেরিয়ে এ-দোকান সে-দোকান, এ-পাড়া সে-পাড়া ঘুরে কৃতকার্য হতে সময় যেতে থাকলো ২-৫ ঘণ্টা। আর সব চেয়ে মজা, বস্তুটি 'রান্নার জ্বালানী' বলে পরিচিত হলেও বাড়ীতে এলে দেখা গেল, তার বেশীটাই পাথর এবং বাকীটা কাঁচা। যেমন রেশনের চাল। ৪-৬ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে নগদ কড়িতে যা পাওয়া গেল তার ভিতর আসল বস্তুই হয়ত খুদ, ধান ও পাথর কণা। এর মানসিক প্রতিক্রিয়া বামপন্থী ইমেজের ইন্ধন যদিওবা কিন্তু সুস্থ সবল প্রগতির গতি কতটা বাড়ায় সে-তত্ত্ব আজও যদি স্পষ্ট হয়ে না থাকে তবে তার মূল্যটা বোধহয় একটু কঠিনই এ-জাতিকে দিতে হবে।

অবশ্য 'অনাগত এক কাল্পনিক দুশ্চিন্তা' বলে এই সবকিছুই উড়িয়ে দেওয়া যায় এবং জনগণের অসহায় ধৈর্যশক্তির উপর বাজি রেখে ঘটনাকে অস্বীকার করার যুক্তিও জোটে, কিন্তু দেশের চির-দরিদ্রতার সঙ্গে পণ্য নিয়ন্ত্রণখাতের এই ১৩১২ কোটি টাকার শ্রম অপচয় যে প্রতি বছর যুক্ত হচ্ছেই তাকে কোন যুক্তি তর্কেই অস্বীকার করা যাবে না।

অনেকে বলবেন, নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও এইসব দ্রব্য সংগ্রহ করতে কিছু সময় অবশ্যই ব্যয় করতে হয়, কিছু সময় ব্যয় না করে এর কোন কিছুই সংগ্রহ করা চলে না। যদিও আদত ঘটনা ঠিক তা নয়, কারণ নিয়ন্ত্রণ না থাকলে যে-সময় ব্যয় হয় তার জন্য অবসর সময়ই যথেষ্ট। নির্দিষ্ট একটি বিশেষ সময়ের প্রয়োজন সেখানে থাকে না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে সময় ও শ্রম ব্যয় না করেও এগুলি সংগ্রহ করা চলে। যেমন মুদির দোকানে ফর্দ ও টাকা পাঠালে কিংবা টাকা পরিশোধের নিশ্চিত আশ্বাস থাকলে ঠিক সময়ে ঘরে বসেই বস্তুগুলি পাওয়া যায়। গোয়ালা বাড়ীতেই দুধ পৌঁছে দেয়। কিছুদিন পূর্বেও প্রতিটি পরিবার এ-ভাবেই তাঁদের অধিকাংশ দরকারী

বস্তু সংগ্রহ করেছেন। সেখানে ভেজাল, ওজন বা মূল্যের কারচুপি যদিওবা ছিল কিন্তু নিয়ন্ত্রণশেষে অবস্থাটা যে-পর্যায়ে পৌঁছেছে সেদিন তার সিকি ভাগ থাকলেও বহাল তবিয়তে সেই ব্যবসায়ী আর ব্যবসা করতে পারত না। অন্তত দুধের সঙ্গে কেঁচো বা ইঁদুর গছিয়ে আড় চোখে একটু মুচকি হেসে কেউ সরে যেতে পারত না।

তবে এ-সবই এ-প্রসঙ্গের বাহ্য বিষয়। সরকারী যন্ত্র কেবল গণতান্ত্রিক অধিকার ও বামপন্থী ইমেজের তেলে চালিত হলে সেখানে দুধের সঙ্গে সাপ, কেঁচো, ইঁদুর; চালের সঙ্গে খুদ, কুড়ো, পাথরকুচি আর কয়লার বদলে পাথর হবে দেশের অবশিষ্টগণদের ন্যায্য পাওনা। যেটা আজ আর যুক্তিগ্রাহ্যই নয়, অনেকটা হয়ত আইনগ্রাহ্যও। অন্তত আইন এর প্রতিবন্ধক হয়নি, কাজেই এখানে বাকী থাকে কেবল শ্রম। যে-শ্রম জাতির আদত মূলধন; নৈতিক চরিত্র যদিও আরও বড় মূলধন। তবে তা কাজে লাগে শ্রমমূল্যের কদর জানার পর। 'শ্রম অপচয় জাতীয় দুর্গতির প্রধান কারণ'—এই বোধ না জাগলে ও-বস্তু কোন কাজে আসে না। তবে বেকারত্বের জ্বালায় অতিষ্ঠ মানুষ প্রকৃত কোন কাজের বদলে অপ্রয়োজনীয় কাজে বাধ্য হলে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় প্রায় পাশবিক। মনের এই ক্ষমাহীন অবস্থা কিন্তু দেশের সংহতি, সুস্থতা, প্রগতি, সব কিছুরই অন্তরায়।

অসন্তোষ ও অশান্তির উৎস

অসন্তোষ ও অশান্তির মূল কারণ অতৃপ্ত কামনা। অতৃপ্তি মনকে চঞ্চল করে, বিক্ষিপ্ত করে ও পরিশেষে অসন্তোষের বীজ বপন করে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে থাকে। কামনা তৃপ্ত হলে মনের উপর এই প্রতিক্রিয়া ঘটে না। অশান্তিও দেখা দেয় না। শুধু নীতিকথা বা আশ্বাসে এর প্রতিকার অসম্ভব, কামনার তৃপ্তিই এর একমাত্র সমাধান। এটা ব্যক্তি ও সমষ্টি মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্য।

ব্যক্তিগত অসন্তোষ অবশ্য বহু কারণেই ঘটতে পারে, কিন্তু সার্বিক সমাজে অসন্তোষ আর অশান্তি দেখা দেয় মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণে।

আর এই অর্থনৈতিক অবস্থাটা আবার সমগ্র সমাজের উপর প্রতিফলিত হয় প্রধানত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। রাষ্ট্রের উপর শ্রেণীকর্তৃত্ব থেকে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপরও শ্রেণীকর্তৃত্ব বর্তে। এই শ্রেণী শিল্পপতি-ব্যবসায়ী অথবা সরকারী আমলা যেই হোন, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে যে একটি শোষণ শক্তি নিহিত থাকে তাকে এঁরা কেউই প্রতিরোধ করতে পারেন না। সততা, সদিচ্ছা বা উদারতা যদি কোথাও কিছু থাকেও তবু সামাজিক পরিবেশে সে সবই অচল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সার্বিক সমাজে যে অসন্তোষ অশান্তি দেখা যায় তার প্রধান হেতুই হচ্ছে শ্রেণীনির্ভর উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা। অন্য আরও বহু কারণে এটা দেখা দিলেও তা স্থায়ী হয় না, সময়ে মীমাংসা সূত্র বের হয় এবং কামনা তৃপ্ত না হোক, ক্ষোভ দূর হয়। কিন্তু উৎপাদন ও বণ্টন ঘটিত অবস্থাটা ব্যাপক এবং নিত্যকালের, তাই এর মীমাংসা কোনো বিশেষ শ্রেণীর মানুষ করতে পারে না। আর এ থেকেই সমাজে পরস্পর ব্যবধান ঘটে, সমাজকে সবল ও দুর্বল অংশে ভাগ করে, ব্যক্তিগত আর শ্রেণীগত ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়, আজ্ঞাকারী ও আজ্ঞাবহ শ্রেণীর বিকাশ ঘটে এবং প্রায় সমগ্র সামাজিক মানুষকেই ব্যক্তিস্বার্থসচেতন করে পরস্পর সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ মানুষের অস্তিত্ব সর্বদাই সামাজিক অবস্থিতিতে স্পষ্ট হতে চায় এবং আত্মবিকাশের পথ খোঁজে। কাজেই তার প্রধান এই দুটি অবলম্বনের উপর আত্ম অস্তিত্বহীন অপরের স্বার্থসচেতন একাধিপত্য থাকলে সেখানে যে-মানসিক শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা অন্য কিছু দিয়েই ভরাট করা যায় না।

সভ্যতার ক্রমঃবিকাশের সঙ্গে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন হয়েছে। এর সঙ্গে যে বৈষম্য ও অশান্তির সম্বন্ধ রয়েছে তাকে দূর করতেও বহু চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এটাই যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক অশান্তির প্রধান বিষয় এবং ব্যবস্থার অন্য সব পরিবর্তনের সঙ্গে এর যতটা সম্বন্ধ তার বহুগুণ বেশী সম্বন্ধ পরিবর্তনের কর্তৃত্ব পরিবর্তনের সঙ্গে সেই বিষয়টিই সকলে যেন এড়িয়ে যেতে

চেয়েছেন। চেয়েছেন কারণ এর সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ ত আছেই, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছুটা সন্দেহও হয়ত আছে। এ-সন্দেহ জনগণের যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিয়ে নাও যদি হয়, সন্দেহ এসেছে সমাজে এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে। যদিও এর মোট মূল্য একই। কারণ সমগ্র অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থায় উৎপাদন আর বণ্টনই হোল প্রধান অংশ। এর সঙ্গে সমাজের সকল মানুষ জড়িত। এর যাবতীয় কর্তৃত্ব কিংবা যে-কোন পরিবর্তনের কর্তৃত্ব কেবল একটি বিশেষ শ্রেণী অথবা রাষ্ট্রের আমলা কর্তৃত্বে ন্যস্ত থাকলে যে-চরিত্র সেখানে ফুটে ওঠে অন্য আর একটি বিশেষ শ্রেণী বা আর একদল আমলার কর্তৃত্বে গেলে তার মৌল কোন পরিবর্তন হবে একটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। দক্ষিণ, বাম, প্রগতি, বুর্জোয়া, কোন কিছুর প্রভাবেই এর গতি প্রতিহত করতে পারে না। পারে না যেহেতু সমগ্র সমাজই শ্রেণীস্বার্থে ও শ্রেণীকর্তৃত্বে গড়ে উঠেছে, কাজেই তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে এই কর্তৃত্ব ন্যস্ত হলেও তাঁদের কর্তব্য পালনের কর্তৃত্বে ওই শ্রেণীস্বার্থের প্রভাব থাকবেই। সহজ কথায়, সামাজিক পরিবেশ কোথাও শ্রেণী-স্বার্থ বা তার প্রয়োজন মুক্ত নয়, তাই অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থায় সমাজের বেশীর ভাগ মানুষ থাকে অপাঙতেয়, ফলে অসন্তোষ ও অশান্তি কিছুতেই এখানে বিস্তারবিমুখ হয় না। শ্রেণীকর্তৃত্বের এটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

কমিউনিস্ট সমাজে অর্থনৈতিক সব দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে সরকারী আমলাদের উপর। দলীয় কর্তারা তদবির-তদারক করেন। এর তাত্ত্বিক যুক্তি থাক। কিন্তু এটা অস্বীকার করার মত কোন তথ্য নেই যে, আর্থিক বিলিব্যবস্থায় অন্য কারো প্রভাব যেমন এঁরা স্বীকার করেন নি, তেমনি জনগণকেও কিছুমাত্র বিশ্বাস করতে পারেন নি। পারলে তাঁদের অবশ্যই সহযোগী করা হোত এবং শ্রেণী-কর্তৃত্বের যে-প্রভাব অন্যত্র থাকে ও যে-প্রভাবে সমাজে অসন্তোষ, অশান্তি আর অবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা পায় তার চিহ্নমাত্র থাকতো না। অন্য সমাজের মত এ সব ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে না ঠিক, কিন্তু সে-পথই কী এখানে মুক্ত?

এসব অবশ্য তত্ত্ববাগীশদের দরবারী বিষয়। সাধারণ মানুষের এতে লাভ নেই। তাদের অসন্তোষ আছে, অশান্তিও আছে। আর এর মূল কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য বা সামাজিক অন্যায্যতা। ,উৎপাদন ও বণ্টনই এখানে প্রধান এবং সমগ্র অন্যায্যতার মূলে রয়েছে এর উপর শ্রেণী বিশেষ বা প্রশাসন আমলাদের সর্বময় কর্তৃত্ব। কাজেই এর সঠিক ও স্থায়ী কোন পরিবর্তন করতে হলে অর্থাৎ, সমাজ থেকে সার্বিক অসন্তোষ ও অশান্তি বিদায় করতে চাইলে শ্রেণী বিশেষ অথবা আমলা কর্তৃত্বের স্থলে সার্বিক মানুষের কর্তৃত্ব অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ভিন্ন আর একটি বিকল্পকেও যুক্তিগ্রাহ্য করার মত কোন তথ্য কেউ উপস্থিত করতে পারেন নি।

গণস্বার্থে সমবায়ের ভূমিকা

সমবায়! শব্দটায় বেশ একটু মধুর ঝংকার আছে। কিছুটা মোহ ও আকর্ষণও আছে। আর এই মোহ এবং আকর্ষণ অনুন্নত ও বঞ্চিত সমাজে অবশ্যই কিছুটা বেশী। সেটাই স্বাভাবিক। আর সম্ভবত এই কারণেই ভারতবাসীর উপরও এর প্রভাব এতটা বাড়তে পেরেছে। যেন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে সবাই এমনই এক চাঞ্চল্যকর অবস্থা। পিছন ফিরে বা এদিক-ওদিক তাকাবার অবকাশ নেই, যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌছে কেউ হোঁচট খাচ্ছে। তবে সবাই যে হোঁচট খায় তা নয়, কেউ কেউ গুপ্তধন না হোক, অপরের গচ্ছিত ধনের সন্ধান অবশ্যই কিছু পাচ্ছে। এদের চেনা যাবে পরে। কিন্তু হোঁচট-খাওয়া কোন কোন ব্যক্তি বেশ একটু স্পষ্ট করেই বলে থাকেন, 'সরল বিশ্বাসী ও বঞ্চিত মানুষের উপরে শ্রেণী বিশেষের নিষ্পেষণ-রোলার চালাবার এ হোল একটি উচ্চমানের জ্বালানী—আর এ-সত্য যত তাড়াতাড়ি প্রকাশ পাবে ততই এদের পক্ষে মঙ্গল।'

আমি বেশ বুঝতে পারছি, এই বক্তব্য অনেকের কানেই বেসুরো বাজবে এবং তীব্র প্রতিবাদ করে তাঁরা বলবেন, 'বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।' কিন্তু আমি বলি কি মহাশয়গণ, একটু ধৈর্য ধরুন।

ব্যাপারটা একটু খোলসা হতে দিন। অবশ্য তাঁদের একথা বলছিনে, যাঁরা ওই জ্বালানীর কারবারে আছেন। আর বললে তাঁরা শুনবেনই বা কেন? পেশা কি সহজে ছাড়া যায়? না শুধু কথার মূল্যেই কেউ ত্যাগ করে? কিন্তু খটকা অন্য যাঁদের আছে তাঁরা একটু সতর্ক সন্ধান নিলেই জানতে পারবেন, এই সমবায় শব্দের রঙিন পর্দাটি বঞ্চিত মানুষের সামনে বঞ্চনার কুৎসিত নগ্নতা এবং এ থেকে মুক্তির সঠিক পথ আড়ালে রাখতে অনেকখানিই সাহায্য করেছে। পরাধীনতা শেষেও ভারতের শোষণ যন্ত্রগুলি যে-যথেষ্ট গতিবেগ পেয়েছে তার শক্তি যোগাতে এই সমবায়রূপ জ্বালানীর অবদান নেহাৎ কম নয়। শোষিত ও সরল দেশবাসীর চোখে এ-শব্দ বেশ কিছুটা ধুলো দিয়েছে। যুগের পরিবর্তন হয়েছে, মানুষের চেতনারও পরিবর্তন হয়েছে, আর এই চেতনায় সাধারণ মানুষ যতটা আত্মসচেতন হতে পেরেছে কায়েমী স্বার্থবাদী তথা ক্ষমতা সন্ধানী ও ধনীরা তার অনেক বেশী স্বার্থসচেতন হয়েছেন। যদিও রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিরা একে যথাসাধ্য সূক্ষ্মতায়ই ঢাকতে চান। কারণ গণরোষের তোয়াক্কা না করলেও 'ইমেজ' বলে যে একটি কথা আছে সমালোচনা থেকে তাকে অন্তত বাঁচাতে হয়। ফলে বাইরে থেকে ধনী ও শাসকদের ভিতর প্রভেদ কিছু দৃষ্ট হলেও অন্তরে এঁরা প্রায়ই পরস্পর সুহৃদ ও সাহায্যকারী। অন্যত্র এতে লজ্জার কিছু নেই, কিন্তু সমাজের গায়ে গণতন্ত্রের নামাবলি থাকলে সেখানে গণচেতনার উপর প্রলেপ লাগাবার প্রয়োজন ঘটেই। কায়েমী স্বার্থ পরিচিত আবরণে ঢাকা পড়ে না, নতুন কোন আবরণের সন্ধান করতে হয়। সম্ভবত এরই একটি এই সমবায়। শ্রেণীস্বার্থ নিরাপদ করতে এই মাকাল ফলটি এ-ক্ষেত্রে অনেক বেশী দড়। সরল মানুষ এ নিয়ে মাতামাতি করে আর সুযোগ সন্ধানী ওই কায়েমী স্বার্থ নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেয়। ভারতে সমবায়ের ইতিহাস লক্ষ্য করলে এবং বঞ্চিত মানুষের শ্রম ও অর্থক্ষতির সঠিক পরিমাপ হলে স্পষ্টই দেখা যাবে, বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন অনুপ্রেরণায় এই খাতে যত অর্থ ব্যয় হয়েছে, প্রকৃত কল্যাণ তার সিকি ভাগও হয়নি। জনগণ বিভ্রান্ত হয়েছে; কেবলই এ-গলি সে-গলি ঘুরেছে, কিন্তু সদর রাস্তার সন্ধান

পায় নি। এইত সেদিনের কথা; পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ব্যাঙ্কের হিসেব পরীক্ষায় প্রকাশ পেল সমবায় সমিতিগুলিকে দেয়া ঋণের তিন কোটি টাকা আর কোন কালেই আদায় হবে না। এর পরের খবরেই দেখা গেল, বিভিন্ন খাতে মকুব করা আরও কয়েক কোটি টাকার হিসেব। কিন্তু কোথায় গেল এ-টাকা?

এর সন্ধান পাওয়া হয়ত কঠিন ছিল না। সদিচ্ছা ও সততা থাকলে প্রতিবিধানও হয়ত কষ্টকর ছিল না। কিন্তু তা হয়নি। অথচ অনেকেই জানেন, এর বেশীটাই গেছে একদল ধড়িবাজ ব্যক্তির গহ্বরে। অর্থাৎ যারা বেশভূষা ও অবয়বে মরমী, কিন্তু সুযোগ পেলে অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করাই যাদের ধর্ম, তারাই এই সমবায়ের নিরাপদ ভাণ্ডার উজাড় করে ছেড়েছে। মকুব করা অর্থের খুব সামান্য অংশই হয়ত পেয়েছেন দুঃস্থ চাষীরা। কিন্তু ওই তিন কোটি টাকা? আর এ-হিসেবও দেশের একটি মাত্র প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের। সমগ্র ভারতের পূর্ণ হিসেব প্রকাশ পেলে দেখা যেত হয়ত এমন বহু তিন কোটি টাকার হেরফের হচ্ছে এই সমবায়ের গলিপথে। আর এও দেখা যেত যত সমবায় সমিতি এদেশে গঠিত হয় তার শতকরা ২০টির বেশী টিকে থাকে না এবং খুব বেশী হলেও ১০টির বেশী কোন লভ্যাংশ দেবার সঙ্গতি পায় না। অর্থাৎ প্রায় ৯০ শতাংশের সাধারণ সভ্যরা এই মোহে পড়ে হয় আর্থিক নয়ত শ্রম ক্ষতি স্বীকারে বাধ্য হন।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সুগার মিলের ইতিহাস সকলেই জানেন। আরও কয়েকটি বড় পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। কলকাতার ট্যাক্সি সমবায়ের তোড়জোড় আর পরিণতির পার্থক্যটা খুবই লজ্জাকর। বহু বিঘোষিত ক্রেতা সমবায়ের কী হাল ও কারা লাভবান হয়েছে দীর্ঘ দিন বিভিন্ন সংবাদপত্রেই তার ফিরিস্তি বেরিয়েছে। ভুক্তভোগী সদস্যদের কাছে এর অনেকটাই নাকি ঘৃণ্য অপরাধের সামিল। সুতরাং সমগ্র ব্যাপারটাই যে কিছুটা রহস্যে ঘেরা, হয়ত বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত কিংবা অবিবেচনা প্রসূত এ-তথ্য সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত থাকলেও হিসেবী দৃষ্টির অগোচর নেই।

অনেকেই বলে থাকেন, 'ভারতবাসীর মানসিক গঠন সমবায়

সচেতন নয় বলেই ব্যর্থতা আজও কিছুটা আছে, উপযুক্ত প্রচার ও শিক্ষার ব্যবস্থা হলে অবস্থার অবশ্যই অন্য চরিত্র হোত। কারণ সমবায়ের শিক্ষা যেখানে যুক্তিযুক্ত স্তরে পৌঁছেছে সেখানে বহু দিক থেকেই এটা কল্যাণকর হয়ে উঠেছে।'

কথাটা যে একেবারে মিথ্যা নয় সে-তথ্য প্রায় সকলেই জানে। কল্যাণ সেখানে অবশ্যই কিছুটা হয়েছে। কিন্তু সেই কিছুটা কতটুকু? একদল আর একদলকে শোষণ করা বা একের উপর অন্যের কর্তৃত্ব করার যে-শক্তি মানুষ ধনবণ্টন-বৈষম্য থেকে পায় সেই শক্তি ও বৈষম্য এ থেকে কতটা দমিত হতে পেরেছে? সমাজে যারা বঞ্চিত, অবহেলিত, তাদের আত্মপীড়ন বা আত্মগ্লানির স্থলে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ কতটা উন্মুক্ত হতে পেরেছে?

মনে করা যাক দেশের সকল মানুষই সমবায়ের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল এবং সকলেই সকল দুর্নীতি ও আত্মসর্বস্বতার ঊর্ধ্বে থেকে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রকেই নিয়ে এলেন সমবায়ের আওতায় অর্থাৎ সম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনের সকল ব্যবস্থাই হোল সমবায় ভিত্তিক, কিন্তু এতেও কী বর্তমান অবস্থার খুব বেশী ব্যতিক্রম ঘটবে? দেশের সমুদয় অধিবাসী একটিমাত্র সমবায় প্রতিষ্ঠানের আওতায় সমবেত হবেন এবং উৎপাদন, বণ্টন, নির্মাণ, পরিবহন প্রভৃতি গণস্বার্থযুক্ত অর্থনীতির সকল স্তরকেই এর উপর ন্যস্ত করবেন এটা অসম্ভব। এভাবে একে কল্পনা করার ইঙ্গিত আজও মেলেনি। সুতরাং এর প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধীন ভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর স্বার্থ তখনও ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বইতে থাকবে এবং একের সঙ্গে অন্যের স্বার্থ-সংঘাত সমভাবেই চলতে থাকবে। হয়ত কৃষক সমিতির সঙ্গে তন্তুবায় সমিতির সংঘাত থাকবে না, কিংবা একটি মৎস্য উৎপাদন সমিতির সহিত দুগ্ধ উৎপাদনকারী একটি সমিতির স্বার্থের বিবাদও ঘটবে না। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের উৎপন্ন পণ্য সংগ্রহ বা বণ্টনকারী সমিতির সঙ্গে ত এ-সংঘাত এড়ানো যাবে না! ঠিক এমনই এক প্রদেশের একটি সমিতি অন্য প্রদেশের আর একটি সমিতির সহিত সম স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ হবে এও বর্তমান সমাজে অসম্ভব। এই উভয়

সমিতি সমধর্মী হলেও প্রত্যেকের আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র অন্য কোন ব্যবস্থার প্রভাবে সমস্বার্থধর্মী না হওয়া অবধি এ-আশা নিষ্ফল। এ ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে ভারতবাসীর চরিত্রের উপর একটা 'দুর্নীতিগ্রস্ত' বা 'আত্মসর্বস্ব' বিশেষণ চাপিয়ে তাদের হেয় করার চেষ্টায় নিজের অজ্ঞতাই কেবল প্রকাশ পাবে—ব্যবস্থার দুর্বলতা বা ব্যক্ত উদ্দেশ্যের অবাস্তবতা ঢাকা পড়বে না।

আদত কথা হোল, কোথাও কিছুটা সফলতা এলেও একটি দেশের সমগ্র মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা কিংবা সেই অর্থনীতিকে যুক্তিগ্রাহ্য ন্যায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখার কোন শক্তিই এই সমবায় ব্যবস্থার ভিতর নেই। সার্বিক মানুষের ভিতর ন্যায়নিষ্ঠ একটি চেতনা জাগিয়ে তুলতেও এর কোন গুরুত্ব নেই। অবশ্য সমবায় পরিকল্পনার উদ্ভাবক যে প্রকৃতই একজন গণদরদী ও কল্যাণধর্মী সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। একে শোষণ-মুক্ত সমাজের হাতিয়ার হিসেবেই তিনি দেখেছিলেন। অর্থনৈতিক সমাজ-গঠনে সকলের সক্রিয়তা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের শক্তিও তিনি এর ভিতর দেখেছিলেন। এই মানবীয় চেতনার মহিমাকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। এ-শ্রদ্ধা এ পেয়েওছে। কিন্তু সার্বিক মানুষের কল্যাণ যাঁদের প্রভুত্ব বা আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তরায় তাঁরা এতে সায় দেবেন কেন? অথচ সায় এঁরাই বেশী দেন। উদ্যোগ আয়োজন এঁরাই করেন। করেন, যেহেতু এও একটি অস্ত্র। এঁরা চালাক এবং শক্তিধরও। সমবায় শব্দকে পুঁজি করে এবং এর ভাবমূর্তির আড়ালে খুব সহজেই আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ করে নেওয়া চলে।

কাজেই এর কল্পিত শক্তি যে অন্যায়ের প্রতিষেধক হতে পারেনি তার প্রধান কারণ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা। মতলববাজ ব্যক্তিরাই শুধু নিত্য নতুন ফন্দিতে এখানে সকল শক্তিকেই তাদের কাজে লাগাতে পারে।

পূর্বেই বলেছি, সমবায় শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থটা একটু বেশী আবেগমণ্ডিত ও হৃদয়গ্রাহী বলেই আর পাঁচটি শোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে এর চেহারাটা এক হয়ে ওঠে না। তবে হিসেবী চোখে সব কিছুই

সঠিক ভাবে ধরা পড়ে। তাই এর অধিকারীরা বলেন, 'শ্রেণীনির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় সমবায়ও একটি কাঠের ঘোড়া মাত্র। এ দিয়ে ছেলে ভুলোনা যায়, ঠেলা দিলে নড়েও একটু; কিন্তু পিঠে চেপে সঠিক লক্ষ্য পানে এক কদমও এগনো যায় না।'

সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা

শুধু পথ নিয়ে নয়, সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়েও বেশ কিছুটা সংশয় ও মতভেদ আছে। যদিও এ-সংশয় বা মতভেদ তাঁদের নয়, যাঁরা এই সমাজ গড়ার কর্তৃত্ব চান এবং এঁদের যাঁরা সমর্থক। সংশয় তাঁদেরও নেই যাঁদের চেতনা কেবল এর অন্তর্নিহিত আকর্ষণেই স্থিরতা পেয়েছে, বাস্তব তথ্যের সঙ্গে কিছু সংযোগও নেই কিংবা কয়েকখানা বিশেষ আদর্শের কেতাব পড়ে অথবা ওই আদর্শ প্রচারক নেতাদের কণ্ঠবাণী শুনেই এর সমগ্র চেহারাটা প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সংজ্ঞা নিয়ে এঁদের কোন সংশয় নেই, আছে কিছুটা মতভেদ এবং তাও শুধু কর্তৃত্ব দখলের পথ ও তা রক্ষার পদ্ধতি নিয়ে। কিন্তু সংশয় আছে তাদের যাদের বুদ্ধিটাই একটু স্থূল। কোন কেতাব নয়, কারো কণ্ঠবাণী নয়, এমন কি মগজ ধোলাইয়ে সক্ষম কোন নেতাও যাদের দিব্যজ্ঞান দিতে অক্ষম, তারা জানতে চায়, আসলে বস্তুটি কী? অথবা বলা চলে ইতিহাসের নিরিখে যারা সব কিছুই যাচাই করতে চায় এবং চায় প্রত্যক্ষ তথ্য ও তার ঔচিত্য থেকে সত্য নিরূপণ করতে। এদের 'অবুঝ' বলা চলে, 'মূর্খ' বললেও ক্ষতি নেই, আর 'বুর্জোয়া', 'দালাল' প্রভৃতি মধুর সম্বোধন করলেই বা আটকায় কে? তবে ঘটনা যদি এদের অনুসন্ধিৎসু মনকে নিবৃত্ত করতে নাই পারে সে-দোষ এদের নয়। ঐকান্তিক নিষ্ঠা শেষেও যে-সব তথ্য ব্যক্ত হয়েছে তার ব্যবহারিক মূল্যের সঙ্গে পরিচিত অন্য তন্ত্রগুলির প্রভেদ কোথায় এবং কতটুকু সেটাই বোধ হয় এদের মূল সন্ধানের বিষয়।

একথা ঠিক যে সারা পৃথিবীর রাজনীতির হাটে সমাজতন্ত্র আজ একটি উঁচু দরের পণ্য। আর অনগ্রসর বা অভাবগ্রস্ত বাজারে এর

কদর প্রায় আস্মানচুম্বী। অথচ এই পণ্য যাঁরা বাজারে এনেছেন ও আনছেন তাঁরা এর আকৃতি ও প্রকৃতিটা ঠিক একইভাবে যে উপস্থিত করতে পারেননি, কোন কোন ক্রেতার মনের সংশয় বোধহয় এখানেই। ট্রটস্কী, এম. এন. রায় এবং আরও অনেক জাঁদরেল সমাজতন্ত্রীর বক্তব্যে অমিল লক্ষিত হয়েছে তাই নয়, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি তথা-কথিত সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিতর মত ও পথের ব্যবধানও নেহাৎ কম নয়। বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রনায়করা সমাজতন্ত্রের যে-ব্যাখ্যা করছেন তার সঙ্গে পূর্বোক্ত সমাজের কোনটিরই কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। স্থানীয় বহু সমাজতন্ত্রীর কাছে এ নাকি এক 'প্রহেলিকা'। কাজেই ওই স্থূলবুদ্ধির ব্যক্তিদের দোষ দেওয়া বৃথা। সূক্ষ্ম বুদ্ধিধারীদের কাছে এরা আহাম্মক হতে পারে, কিন্তু এরা চায় যুক্তির স্থিরতা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা যা এর সঠিক আকৃতি ফুটিয়ে তুলে সকলকে সংশয়হীন করতে পারে।

অবশ্য রাষ্ট্রের তথা প্রশাসনের জিম্মায় জনগণের সব অধিকার ন্যস্ত করতে উদ্যোক্তাদের প্রায় সকলেই চেয়েছেন। এখানে দ্বিমত বিশেষ নেই। মতান্তর রয়েছে এবং তা নিয়ে সংঘাত ঘটছে শুধু এই জিম্মাদার থাকার পদ্ধতিটা নিয়েই। কারণ রাজনীতিতে তন্ত্র তো একটি শব্দ মাত্র আর সব তন্ত্রেরই মূল কথা হোল রাষ্ট্রক্ষমতা। কিন্তু 'সমাজতন্ত্রে সকলেই স্বপ্রতিষ্ঠিত অস্তিত্ব' এটা ব্যক্ত না করলে যেমন এর গুরুত্ব এবং অন্যের সঙ্গে স্বাতন্ত্র ব্যক্ত হয় না, তেমনি একে 'অনন্য উচ্চাদর্শ' বলে কোন যুক্তির আড়ালে সমগ্র ক্ষমতা করায়ত্ব করে সমাজের সকল মানুষের উপর প্রভুত্ব করা যায় সেটাই হয় প্রধান সমস্যা। কারণ ক্ষমতার কাড়াকাড়ি সব সমাজেই থাকে। একে দমন করা বা লুকিয়ে রাখাও শক্ত। সমাজের উপর এর প্রতিক্রিয়া আছে। আর বাস্তবে যদি সকলেই স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে তবে কর্তৃত্ব প্রয়োগের পথটাই তো রুদ্ধ হয়ে যায়। এখানে বিভ্রান্তি বা অসত্যের সাহায্য ভিন্ন পথ কী? সকলের স্বপ্রতিষ্ঠার সামিল হতে কোন রাজনীতিকই যে পারেন না এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। 'আদর্শ' অর্থেও খাঁটি রাজনীতিকের কাছে ক্ষমতা দখল বা রক্ষার একটি

কৌশলমাত্র। কাজেই এই কৌশল ব্যর্থ হবে এবং কর্তৃত্বের পথ রুদ্ধ না হোক সীমিত হবে সমাজতন্ত্রের এমন সংজ্ঞায় এঁরা বিশ্বাসী হবেন এর চেয়ে অবাস্তব কল্পনা আর হতেই পারে না। সমাজতন্ত্রের এত যে ব্যাখ্যা তার মূলেও আছে এই। এইসব ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন ঘটনা শেষে বরং এ-ধারণাই অধিক যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে যে, কর্তৃত্ব হারাবার সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে উঠলে রাজনীতিক সমাজতন্ত্রীরা সমাজতন্ত্র নামক এই আদর্শটিকেই একেবারে জাহান্নামে দিয়ে তৎস্থলে নতুন আর একটি তন্ত্র বা আদর্শ আমদানি করবেন।

কিন্তু 'সমাজতন্ত্রে সকল মানুষই স্বাধীন সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত' এই যদি উদ্দেশ্যের মর্ম কথা হয় তবে অত্যন্ত দৃঢ়তায় ও দ্বিধাহীন কণ্ঠেই বলা চলে, কোন ব্যক্তি গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বমুক্ত সমাজই হোল প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এখানে কোন কিন্তু বা জড়তার স্থান নেই। সমাজ বা রাষ্ট্র হচ্ছে সম অংশে সকলের, এটাই সমাজতন্ত্রের একমাত্র সংজ্ঞা। এখানে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব থাকবে, সেই কর্তব্য বা কর্মফল ভোগের সুযোগ আর অধিকারও থাকবে, কিন্তু থাকবে না একের উপর অন্যের হুকুমজারির অধিকার। শাসনযন্ত্র থাকবে কিন্তু তার গণ্ডী হবে সকল মানুষের অনুমতি-নির্ভর এবং সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক এক্তিয়ারমুক্ত। শাসন থাকবে, কিন্তু থাকবে না বিশেষ অর্থে বা মর্যাদায় ব্যক্ত কোন শাসক। শান্তিরক্ষক থাকবে, কিন্তু কারো ক্ষমতার বাহন না হয়ে হবে সকলের যুক্তিগ্রাহ্য ন্যায়রক্ষার হাতিয়ার। সৈন্যবাহিনীও থাকবে,—যত দিন না পৃথিবীর বুক থেকে এর প্রয়োজন একেবারে শেষ হচ্ছে—তবে দুর্বলকে দলন পদানত করার যন্ত্রস্বরূপ নয়। আর সব শেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি সম্পদ-কণিকার উপর থাকবে সমাজের সর্বশ্রেণীর সকল মানুষের সম অংশ ও কর্তৃত্ব। যে-যুক্তিতেই হোক, এর কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটলে সেটা সমাজতন্ত্র হয় না, হয় তার বিকৃতি। নির্যাতিত ও শোষিত মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাবার আরও একটু মজবুত হাতিয়ার।

রাজনীতির কষ্টিপাথরে সমাজতন্ত্র

রাজনীতির আভিধানিক অর্থ, রাজার নীতি বা রাষ্ট্রনীতি—যে-নীতিশাস্ত্রদ্বারা রাজকার্য তথা শাসনকার্য নির্বাহ হয়। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চতুর্বিধ কার্যক্রম রাজকার্য পরিচালনার মৌল বিধি। আর আজ অবধি মূলতঃ এই বিধি মেনেই সমগ্র রাজকার্য বা শাসন কার্য চলেছে। শুধু রাজার রাজকার্যেই এই বিধি সীমিত থেকেছে তা নয়, গণ-নির্বাচিত শাসনকার্যেও এই নীতিই কিঞ্চিৎ রকমফের চরিত্রে সর্বজনগ্রাহ্য নীতি হয়ে রয়েছে। কোথাও এর নতুন মূল্যায়ন হয়নি এবং কারো ভিতর সে-চেতনা জাগলেও সামাজিক চাপে তার প্রকাশ ঘটেনি। আর সব থেকে লক্ষ্য করার হোল, তথাকথিত সাম্যবাদীরাই এর নতুন কোন মূল্যমান স্থির করেন নি। অর্থাৎ রাজতন্ত্র 'বুর্জোয়া' হলেও রাজনীতিটা সেখানে অপরিবর্তনীয় এবং অপরিত্যাজ্য। রাজতন্ত্র ক্ষতিকর, তার সব নীতিই পরিত্যজ্য, কিন্তু রাজনীতি নয়। কেননা এ হোল 'গণমুক্তি ও গণপ্রগতির দিগ্‌দর্শক'। যদিও এর পরেও খট্‌কা কিছুটা থাকে। কারণ রাজনীতি শব্দে রাজা ও প্রজা, শাসক ও শাসিত এ-দুটি চরিত্র যেমন স্পষ্ট বিদ্যমান এবং দুটি ভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বই প্রকাশ করছে, তেমনি শ্রেণীবিন্যাস, শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীস্বার্থের এক শক্তিশালী প্রভাবও এ শব্দে জড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজের সংজ্ঞা কী?—সম্ভবত এর সঠিক সংজ্ঞা হওয়া উচিত, অন্যের কর্তৃত্বমুক্ত সমাজ। কিন্তু তাই যদি হয় তবে এ সমাজে কোন রাজা বা শাসকের উপস্থিতি যুক্তিগ্রাহ্য হয় কী? না তাও হয় না। হয় না তার হেতু কর্ম যেখানে নেই সেখানে কর্তা আসবে কোথা থেকে? এটা অবশ্য তর্কের মারপ্যাঁচ। কেননা রাষ্ট্র আছে, কর্ম আছে এবং তার কর্তাও আছে। তবে 'গণনির্বাচিত রাষ্ট্রকর্তারা শাসক নয়, কাজেই শ্রেণীভেদ বা শ্রেণীস্বার্থ কেন, কোন রকম শ্রেণীচরিত্রই এখানে স্বীকৃত নয়'—এই যুক্তি দ্বারা কর্তার

আলাদা চরিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। উত্তম কথা। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, তা হলে সেখানে রাজনীতির প্রয়োজন কী? আর প্রয়োজন হলে সে-রাজনীতির নিজস্ব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে শ্রেণী-চরিত্রহীন করা সম্ভব হবে কী করে? অত্যন্ত উদার ব্যক্তির কাছেও এর তথ্য-নির্ভর কোন উত্তর নেই। কারণ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, 'ভেদ' ও 'দণ্ড' রাজনীতির এই দুটি পরিপূরক ও পরিপোষক চরিত্র হোল শ্রেণীহীন সমাজের দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়। কে অথবা কারা শাসন করছেন এবং কী ভাবে তাঁরা এলেন সেটা বড় নয়, বড় হচ্ছে সেখানে রাজনীতি উপস্থিত কী না? রাজনীতি থাকলে সেখানে ওই 'ভেদ ও দণ্ড' থাকবেই। রাজনীতিকে স্বীকার করে ওই শব্দের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। আর এ-প্রভাব স্বীকৃতি পেলে শ্রেণীপ্রভাবও সেখানে থাকবে। রাজনীতির সঙ্গে এই উভয়ের সম্বন্ধই অচ্ছেদ্য। এই সম্বন্ধে কোথাও সামান্যতম বিচ্ছেদ ঘটেছে এর কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং যাঁরা শ্রেণীহীন বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাহায্য অপরিহার্য বলে ফতোয়া দেন তাঁরা ভুলে যান যে রাজনীতি শব্দের ভিতরই যে-সংঘাত ও বৈষম্যের বীজ নিহিত রয়েছে কোন শাসক বা দলের শক্তি নেই তাকে এড়িয়ে চলেন। শত সদিচ্ছা আর শক্তি থাকলেও এর প্রভাব এড়ানো যায় না। রাজনীতির শ্রেণী চরিত্র পাল্টাবার শক্তি রাজনীতিতে নেই। রাজনীতির বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষ্য হোল কোন না যুক্তির প্রভাবে অপরের উপর কর্তৃত্ব-ক্ষমতা অর্জন। 'শাসনকার্যের প্রয়োজনেই রাজনীতি' একথা ঠিক্, কিন্তু সমাজে এর অতিরিক্ত গুরুত্ব বেড়েছে সকলের ও সবকিছুর উপর আধিপত্য স্থাপনের এটাই সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার বলে। সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাবে কোন যুক্তিবাদী মানুষও এর আওতার বাইরে নয়। আমরা কূটতর্কে না যেয়ে শুধু পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব, রাজনীতির ব্যাপারীরা ব্যক্তি মানুষ বা সামাজিক মানুষের কাছে যা বলতে চান, তার অন্তর্নিহিত একমাত্র অর্থই হোল তাঁদের আদেশ মেনে চলার নির্দেশ। কারো বিরাগভজন না হতে চাইলে বড় জোর 'নির্দেশ' ও

'আদেশ' এর স্থলে আবেদন বলা চলে। কিন্তু তাতে এর চরিত্র পালটায় না।

কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে?—সমাজের সব দিকে তাকালে হয়ত সেটা জানাও খুব শক্ত নয়। দেখা যাবে, সমাজের সর্বস্তরে পরস্পর অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা রাজনীতির গতির সঙ্গেই এগিয়ে চলেছে। যা কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী মানুষের ভিতর বরাবরই ছিল তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এটা দলীয় রাজনীতির অবদান। যদিও সকলকে ভুলিয়ে রাখার যে-টেকনিক নেতারা রপ্ত করলেন সেই কৌশল সকলকে তাঁরা জানান নি। কাজেই যখন-তখন দেখা দিচ্ছে বিরোধ এবং স্থানে অস্থানে এ-বিরোধ পরিণতি নিচ্ছে খুন, জখম বা রক্তপাতে। এ শুধু ভারতের চিত্র নয়, সারা পৃথিবীব্যাপীই এই একই চিত্র। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে ছাত্র ছাত্রকে, শ্রমিক শ্রমিককে, কৃষক কৃষককে নির্বিচারে খতম করছে এবং করছে কোথাও 'প্রগতি'র নামে কোথাও 'শ্রেণীসংগ্রাম' বা 'বুর্জোয়াধ্বংস' এই অজুহাতে। আর এমনিই এ-চেতনা, যারা খতম করছেন বা খতম হচ্ছেন তাঁদের লাভ-ক্ষতির পরিধি ও পরিণতি যে ওখানেই শেষ এবং এটা রাজনীতির শ্রেণীচরিত্রেরই প্রকাশ মাত্র—যা নিয়ত একের রক্তে অপরকে বাঁচিয়ে রাখে এবং কেবল সবলদেরই সমাজে প্রতিষ্ঠা করে আর রাজনীতির পাণ্ডাদের সমগ্র রাষ্ট্র মানুষের উপর প্রভুত্ব করার পথ করে দেয় এই বোধটাই একেবারে নিঃশেষ করে ফেলে। রাজনীতির মূল তত্ত্ব না জেনে রাজনীতিতে বিজ্ঞ হতে চাওয়ার এটা নগদ ফল। এ-তত্ত্ব জানা থাকলে অন্তত এটুকু বুঝতে কষ্ট হোত না যে, নেতারা যাঁরা পিছনে থেকে কলকাঠি নাড়েন, তাঁরা সকলের ভিতর সঠিক চেতনা জাগাবেন প্রশ্নকারী বা প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করতে এতটা অবোধ তাঁরা নন। রাজনীতির ধর্মই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা অধিকার। কিন্তু সুস্থ ও চেতনালব্ধ সমাজ এর অন্তরায়, কাজেই এর লক্ষ্য থাকে অসুস্থ বা উদ্‌ভ্রান্ত সমাজের দিকে—যেখানে আঞ্চলিক স্বার্থ, সম্প্রদায় বা ধর্মীয় স্বার্থ কিংবা আর একটি শ্রেণীস্বার্থকে পুঁজি করে সহজেই কার্যোদ্ধার হতে পারে।

রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা সর্বকালের। সকল দেশেই এক

শ্রেণী মানুষ এই ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে লিপ্ত হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে এঁদের ভাইয়ে-ভাইয়ে, পিতা-পুত্রে এবং স্বামী-স্ত্রীতেও বিচ্ছেদ বা রক্তপাত ঘটেছে। কিন্তু আজকের মত সর্বস্তরের সকল মানুষকে রাজনীতির যুপকাষ্ঠে আত্মসমর্পণ করতে কেউ দেখেনি। 'রাজনীতিই আত্মপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পথ' এই নীতিপাঠ বা প্ররোচনাও কেউ দেয়নি। রাজতন্ত্র ছেড়ে অন্য তন্ত্রে এসেই রাজনীতি এই শক্তি পেয়েছে। এর আসল মহিমাও কিছুটা বোরখা আবৃত হতে পেরেছে। আর যাঁরা এখানে নেতা তাঁরা সব আয়োজনই করেন প্রায় অদৃশ্যে থেকে। বন্ধ ঘরে জানালার ফাঁকে দূরবীণ লাগিয়ে এঁদেরই কেউ বিপ্লবের অগ্রগতি দেখেন, কেউবা পরিজন সহ অন্যত্র লুকিয়ে থেকে শ্রেণী সংগ্রামের পরিণতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, ভারতের তামাম দল-নেতারা একই সুরে বলছেন, 'ছাত্রসমাজ, তোমরা রাজনীতি থেকে দূরে থাক।' ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতি এঁদের উপদেশ আর আবেদনের বিরাম নেই। শিক্ষার্থী ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে এঁরা যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এটাই এঁরা প্রমাণ করতে চান। অথচ এখানে প্রকৃতই কী ঘটছে? শুধু ছাত্র ও শিক্ষক নয়, সমগ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিই তো প্রায় দলীয় রাজনীতির ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। কেবল শহরেই নয়, এই রাজনীতি সুদূর পল্লীর বুকেও ছড়িয়ে পড়েছে। এবং প্রায় সবকিছু গ্রাস করে অবশেষে অন্দর মহলে ঢুকে পড়ে পল্লীজীবনের শান্তি ও মধুময় পরিবেশকে বিষাক্ত করে ছেড়েছে। শত অভাব, অব্যবস্থা ও বঞ্চনা সত্ত্বেও ভারতে পল্লীবাসীর ভিতর যে-সদ্ভাব, সমবেদনা ও মমত্ববোধটুকু টিকে ছিল, ক্ষমতা দখলের রাজনীতি ঢুকে তাকেও আজ সমাধি দিয়েছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে-পরিজন-সুলভ একাত্মতা ছিল, রাজনীতির যুপকাষ্ঠে তার আহুতি হয়েছে। আর এ-সবই হয়েছে তাঁদের আত্মচেতনার নামে। অথচ একটু সতর্ক থাকলেই এঁরা দেখতে পেতেন, এই চেতনা আত্মসমর্পণ বা আত্মাহুতির পথটাই কেবল প্রশস্ত করে, কোথাও আত্মনির্ভরতার কিছুমাত্র সন্ধান দিতে পারেন না। এঁদের বেলায়ও পারে নি। পারেনি, কারণ ওটা

খুব শক্ত কাজ। রাজনীতিটা দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধের গণ্ডীতে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকেনা বলেই ওদিক থেকে কেউ বেশী দূর এগোতে পারেন না। তবে ক্ষমতাবিলাসী ব্যক্তিদের কাছে এ-আবেদন অর্থহীন ঃ

'খাদ্য নিয়ে কেউ রাজনীতি করো না।' কেবল এদেশে নয়, সারা পৃথিবীর রাজনীতিকরাই এ-উপদেশ দিচ্ছেন। অথচ খাদ্য যে চিরকালই রাজনীতির একটি জুতসই অবলম্বন এবং সুযোগ মত একে কাজে লাগানোই এ-নীতির ধর্ম, সেই নিগূঢ় তথ্য রাজনীতিকরাই বারে বারে প্রকাশ্যে টেনে এনেছেন। আজকের বহু মানুষ জেনেছে, বুভুক্ষু গণদেবতাই হোল রাষ্ট্রক্ষমতার বড় যোগানদার। কমিউনিস্ট-শাসিত রাষ্ট্রে পণ্যনিয়ন্ত্রণ শক্তির একটি প্রধান উপাদানই হোল যাবতীয় খাদ্য-বস্তুর উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এ-পথে আজ ভারতও এগোচ্ছে এবং সম্ভবত এরই অনিবার্যতার দিকে তাকিয়ে অতি দ্রুত দেশবাসীর প্রশ্নাতীত আনুগত্যের সন্ধান করছে। একে ন্যায়হীন, যুক্তিহীন ও শ্রেণী-স্বার্থের পরিপোষক বলে অন্যে মনে করলেও রাজনীতির দরবারে আদৌ অনাদৃত নয়। রাজনীতিকদের পক্ষে বিকল্প অন্য সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়াও অসম্ভব। এ ভিন্ন খাদ্যাভাবগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলির উপর বেশীর ভাগ উন্নত দেশই তাদের প্রভাব বিস্তার করছে প্রধানত এই অভাবকে হাতিয়ার করে। সুতরাং খাদ্যকে রাজনীতির বাইরে রাখার আবেদনে কিঞ্চিৎ মোহ থাকা সম্ভব, কিন্তু সত্য বা সততা যে এতে খুব বেশী নেই এ-তথ্য ইতিহাস খুব ভাল করেই প্রমাণ করেছে। বস্তুত খাদ্য এবং ছাত্রসমাজ এ-দুটো বর্তমান যুগের রাজনীতিতে মোটেই ফেলনা নয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানই অধিকার করে থাকে। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রত্যাশীরা একে রাজনীতির বাইরে রাখতে বলেন প্রতিপক্ষ ও জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্য। আসলে এঁদের রাজনৈতিক চরিত্রের সঙ্গে এ-বক্তব্য একেবারেই সঙ্গতিহীন। যে-অসঙ্গতি দেখা যায় একজন খাঁটি রাজনীতিক ও একজন খাঁটি দেশ-প্রেমিকের ভিতর। স্বাধীনতার পূর্ব-পর একই ব্যক্তির দ্বিবিধ চরিত্র এ-দেশের অনভিজ্ঞ চোখে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে সেটা রাজনীতির সঠিক চরিত্র না জানার ফল। এ-চরিত্র জানা থাকলে দুইয়ের ব্যবধান

যেমন স্পষ্ট হোত তেমনি রাজনীতিতে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রভাব থাকলে দেশপ্রেম আর মানবপ্রেম কেন ও কিভাবে অদৃশ্য হতে থাকে সেটাও চোখে পড়তো।

রাজনীতিকে যাঁরা আরও প্রত্যক্ষভাবে চিনেছেন এবং এর সমগ্র ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাঁরা মানুষের আত্মসত্তার মূল্যায়ন করেছেন তাঁরা বলেন, 'মানুষের ন্যূনতম কল্যাণ করতে হলেও এমন সমাজ অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে যেখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থাকবে না, রাজা বা শাসক থাকবে না, রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বও থাকবে না এবং থাকবে না কোন বস্তু কিংবা ব্যক্তির উপর রাষ্ট্র অথবা শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া আধিপত্য। রাজনীতির সঙ্গে এই সবকিছু এবং এঁদের সকলের সম্বন্ধই অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আর রাজনীতি আবদ্ধ সমাজের প্রায় সমগ্র অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও দুর্নীতিতে। এর একটিকেও সম্পূর্ণ হঠাবার শক্তি রাজনীতিতে নেই। রাজনীতির আবির্ভাবে এর পতন হয়েছে আর দলতন্ত্রে এসে সর্বত্র ব্যাপ্তি ঘটেছে। অর্থাৎ রাজনীতি প্রথমে জাগিয়েছে শ্রেণীচেতনা। এ-চেতনা রাজা, রাজ-কর্মচারী ও সাধারণ প্রজা এই তিনটি সুস্পষ্ট শ্রেণী সৃষ্টি করে প্রত্যেকের আলাদা মূল্য ও মর্যাদা স্থির করেছে। এর পরের পর এসেছেন বণিক, বুদ্ধিজীবি ও শিল্পপতিরা এবং তাঁরাও আলাদা আলাদা মূল্য ও মর্যাদা আদায় করে নিয়েছেন। আর সব শেষে দলতন্ত্র আরম্ভ হলে রাজনীতি সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, আরও নতুন নতুন আলাদা স্বার্থ ও মর্যাদার দাবী উঠেছে এবং বিভিন্ন দলের প্রয়োজনে সে-দাবী প্রশ্রয় ও শেষে স্বীকৃতিও পেয়েছে। কাজেই তথ্যগত সত্য অস্বীকার না করলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, রাজনীতির জন্ম শ্রেণীস্বার্থ থেকে, এ বেঁচে আছে শ্রেণীস্বার্থ আশ্রয় করে এবং যতকাল বাঁচতে হবে ঠিক এই অবলম্বনই এর চাই। শ্রেণীস্বার্থ না বাঁচিয়ে রাজনীতির ক্ষণকালও বাঁচার শক্তি নেই।

সমাজতন্ত্র ও রাজনীতিমুক্ত সমাজ পরস্পর থেকে একটুও বিচ্ছিন্ন নয়। এরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। প্রথমটির কিছুমাত্র উপস্থিতিতে দ্বিতীয়টিকেও অনিবার্য হতে হবে। অথচ লক্ষ্য করার

বিষয়, প্রথমটির যাঁরা একনিষ্ঠ সমর্থক দ্বিতীয়টির সমর্থক তাঁরা আরও বেশী। এর কিছুমাত্র স্থানচ্যুতির আশংকায় এঁরা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। কেন? সম্ভবত এর উত্তর পূর্বেই পাওয়া গেছে। রাজনীতি স্থানচ্যুত হলে সমাজের উপর ব্যক্তি ও শ্রেণীবিশেষের কর্তৃত্বচ্যুতিও ঘটে। সমাজতন্ত্র হয় হোক, কিন্তু তাই বলে সবচেয়ে বুদ্ধিমান (?) ব্যক্তি অর্থাৎ, রাজনীতিকদের সেখানে একটি বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা থাকবে না এ কেমন কথা? একে তাঁরা মেনে নেবেনই বা কেন? আর রাজনীতি থাকবে না, দল থাকবে না কিন্তু এর দৌলতে সমাজের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষের রস যাঁরা প্রকাশ্যেই বের করতে পারছেন তাঁরাই বা এতে সায় দেবেন কেন? না, এঁরা কেউই তা পারেন না। আর তাইত চারিদিকে এত সোরগোল, বিরূপ মন্তব্যে অধৈর্যতা, শুধু 'গেল' 'গেল' রব। যুক্তিবাগীশ মহাশয়গণও কেবল এই বিষয়টিকেই পাশ কাটাতে চান যে, সমাজে ৮০ ও ২০ ভাগ মানুষের ভিতর পর্বতপ্রমাণ যে-ব্যবধান এবং নিয়তই যা থেকে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ঘটছে তার কারণ কিন্তু মাত্র একটিই—সমাজে শ্রেণী-কর্তৃত্ব। আর রাজনীতির অবসান ব্যতীত এ থেকে মুক্তির একটি পথও খোলা নেই।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের চেষ্টার ত্রুটি নেই এ যেমন সত্যি তেমনি 'এতকাল হয়নি বলেই আর কোন দিন হবে না' একেও যুক্তিগ্রাহ্য করা যায় না ঠিক। কিন্তু রাজনীতির পুঁজিতেই সমাজ থেকে শ্রেণীপ্রভাব বা শ্রেণীপ্রভুত্ব দূর করা যাবে সেটাই কী হবে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত? যুক্তি কিন্তু তা বলে না। যুক্তি বরং বলে, রাজনীতি হচ্ছে একদল ধূর্ত মানুষের স্বার্থ ঝাড়াইয়ের চালুনি। শ্রেণী-স্বার্থটাই এতে কেবল আটকে থাকে আর সবই এর ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে যায়। এ-ব্যাপারে রাজনীতি কোন তন্ত্রের ভেদও করে না।

রাজনীতি এবং সমাজতন্ত্র এই দুয়ের মৌলিক গঠন যে পরস্পর-বিরোধী এ-তত্ত্ব সাধারণের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও রাজনীতিকদের অগোচর নয়। সমাজতন্ত্রের প্রকৃত চেহারাও সাধারণের কাছে যা প্রকাশ হতে চেয়েছে রাজনীতিকদের কাছে অবশ্যই তা নয়। প্রকাশ্য

না করলেও তাঁরা জানেন, শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার নতুন এক তাত্ত্বিক চালাকীই আজ সমাজতন্ত্র নামে আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র। এর সঙ্গে অন্য আর সব শাসনতন্ত্রেরই কম-বেশী সাদৃশ্য আছে—কিন্তু নেই কেবল স্বমহিমায় সমাজতন্ত্রের সাদৃশ্য। সঠিক সমাজতন্ত্রে রাজা বা রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি রাজ-নীতির অবস্থিতিও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আসলে রাজনীতিনির্ভর সমাজে সমাজতন্ত্র কেন গণতন্ত্রও তার জনগণকল্পিত মহিমায় আবির্ভূত হতে পারে না। রাজনীতির মৌল মূলধনে রাজতন্ত্রের স্থলে বড়জোর একটি শ্রেণীতন্ত্র তথা দলতন্ত্র অবধি পত্তন হতে পারে এবং তার গতি বা শক্তির পরিধি একজন রাজার স্থলে কয়েকজন রাজা থাকলে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন পরিষদ ও আমলা সহ সর্বাধিক যত লোকের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব এই পরিবর্তিত তন্ত্রে ঠিক ততটাই হয়ে থাকে। উপরন্তু এর বাইরের যে প্রায় ৮০ ভাগ সাধারণ মানুষ থাকে তারা একজন রাজার ভোগবিলাসের দাবী মেটাতে যে-মূল্য দেয় এই সব তন্ত্রে সেই প্রায় একই কর্তৃত্বের অধিকারী একাধিক ব্যক্তির জন্য সমদায়িত্ব বহনে বাধ্য হয়। এর পরও থাকে দলীয় চাঁদা যার প্রায় সবটাই যায় এদেরই পকেট থেকে। ব্যবসায়ীদের দেয়া মোটা চাঁদাও মূল্যবৃদ্ধির ঘুর পথে এদের নিংড়েই আদায় হয়। আর ভারতের মত বহু দল থাকলে ত কথাই নেই, বারোয়ারী পূজার চাঁদা দিতেও রাজসিক আদেশ শুনতে হয়। কোথাও এর মৌল পরিবর্তন হলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অধিকারের দাবী দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রা অচল করতে আইনের সমর্থন পেত না।

জ্বলন্ত রোম-নগরীর প্রাসাদে সম্রাট নীরোর বাঁশির সুরের তন্ময়তাকে তাঁর হৃদয়হীনতার চরম নিদর্শন রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও তাঁর করার মত কিছুই হয়ত তখন ছিল না। এবং এটা জেনেই হয়ত তিনি ওই নিদারুণ দুর্ঘটনার বেদনা ভুলে থাকার জন্য বাঁশির তানে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। এ সবই অনুমান। কারণ সেই সময়কার সঠিক মানসিক প্রতিক্রিয়া তাঁর কাছে কেউ জানতে চেয়েছিলেন কিনা সে-তথ্য সংবাদে নেই। বরং এটা যে নিছক

রাজতন্ত্রেরই এক অনিবার্য নিষ্ঠুরতার নিদর্শন ব্যক্ত সমগ্র সংবাদের প্রধান সুর এটাই। রাজতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা প্রকাশে এমন বহু সংবাদই আমাদের নিয়ত সতর্ক করতে চেয়েছে। এ নিয়ে কোন তর্কও নেই। কিন্তু দলতন্ত্রে নির্বাচিত রাষ্ট্রকর্তাদের কেউ যদি কোটি কোটি অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের পাশে বসে তাদেরই নিংড়ানো রাজস্বে দৈনিক হাজার টাকা ব্যয় করেন তাঁর খানাপিনায় তবে সেই মানসিকতার সংজ্ঞা কী হবে? এবং ওই রাষ্ট্রতন্ত্রেরই বা সঠিক পরিচয় কী হবে?

এর উত্তর আজও কেউ দেননি। কিন্তু এটা অনেকেই জেনেছেন, দেশের অন্তত ৮০ ভাগ মানুষ চিরকালই রাষ্ট্রকর্তাদের খাসতালুকের প্রজা। কাজেই তন্ত্র যাই থাক, কথাটা তাদের স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন কোন কোন কর্তা ব্যক্তির থাকবে বইকি? তবে কিছুটা অবুঝ ব্যক্তিও আছে, যারা বলেই ফেলে, "রাজনীতি রাজতন্ত্রে ছিল গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের শত্রু, কিন্তু দলতন্ত্রে এসে এ শক্তি পেয়েছে যুক্তি, ন্যায়নিষ্ঠা এবং অধিকাংশ মানুষকেই শত্রু করার।" এর একটি কারণ বোধহয় দলতন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দলীয় স্বার্থে প্রশাসনের একটি অংশকে প্রলুব্ধ করা এবং অলস, অনড় ও অবিবেচক করে সমাজকেই সেই জালে আবদ্ধ করা অনেক বেশী সহজ হয়। অবশ্য এর পরেই প্রশ্ন হবে, "রাষ্ট্র থাকবে অথচ সেই রাষ্ট্র পরিচালনার কোন নীতি থাকবে না এ কী সম্ভব?"

এর সহজ উত্তর সম্ভব নয়। অবশ্যই নয়। "কিন্তু তাই যদি হয় এবং একটি নীতির অপরিহার্যতাই যদি স্বীকৃত হয়, তবে সে-নীতি 'রাজনীতি' শব্দে ব্যক্ত হলে আপত্তি হবে কেন? রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বলেই ত এ রাজনীতি।"

এটাই এ-প্রসংগের আদত বিষয়। আর এই মানসিকতাই রাজনীতির প্রধান অবলম্বন। 'রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি' কাজেই এতে জোর কিছুটা থাকবেই পরন্তু এর ভিতর যে-দুর্বলতা, যে-স্বার্থপরতা ও বিচ্ছেদের এক নিরলস সক্রিয় শক্তি থাকে তা কারো চোখেই সহজে ধরা দিতে পারেনা। রাষ্ট্রের প্রতি মমতা আছে তাই রাজনীতিও

তার অংশীদার হয়েছে। অথচ চেতনা আর একটু সজাগ হয়ে রাজনীতির মৌল উপাদানের সাক্ষাৎ পেলে এই মানসিকতারই আমূল পরিবর্তন ঘটে যায় এবং তখন তার বক্তব্য হয়, আপত্তি ত কেবল নীতিতে নয় কিংবা কোন একটি নীতির আবশ্যকতাও অস্বীকার করা হচ্ছে না, আপত্তির হেতু এর সঙ্গে 'রাজ' এই শব্দ যুক্ত হয়ে অন্য সমগ্র সামাজিক মানুষকে দূরে রেখে আলাদা একটি সংজ্ঞায় ও অস্তিত্বে প্রকাশ পাচ্ছে বলেই। এ-শব্দে বৈষম্যের বীজ আছে এবং সেটা নিয়ত তার স্বমহিমায় সক্রিয়। এ-নীতিতে সমদর্শীতা নেই। সমাজের সকল মানুষকে আপন করার শক্তিও এতে নেই। কিন্তু এই নীতিই যদি 'সমাজনীতি' এই শব্দে ব্যক্ত হয় এবং সমাজে সঠিক স্বীকৃতি পায় তবে এ সকলকেই সমমূল্যে ও মর্যাদায় গ্রহণ করতে পারে। এ-নীতিতে বৈষম্যের প্রভাব নেই, আছে বরং একতার ঐকান্তিক এক আবেগময় সুর। যে-সুর সমাজের সকল মানুষের অন্তরে ঝংকার তুলে নিয়ত একে অপরকে কাছে টানে। রাজনীতি রাজার নীতি, কিন্তু সমাজনীতি সমাজের সকলের নীতি। সমাজতন্ত্রে সমাজনীতিই তো হবে যোগ্য নীতি।

রাজনীতিতে বিভেদ আছে, বিচ্ছেদ আছে, কিন্তু সমাজনীতিতে তা নেই। আছে আপন করার মন্ত্র। কাজেই এ-নীতি একদিন সমগ্র বিশ্ব মানুষকেই কাছে টানবে। একত্রে চলার পথ দেখাবে। তখন রাষ্ট্রসমাজ থেকে বিশ্বসমাজ। সমাজতন্ত্রের শেষ লক্ষ্যও কিন্তু তাই।

সমাজতন্ত্রের প্রথম ধাপ

রাষ্ট্রীয় সম্পদে সকলের সম অংশ এবং সেই সম্পদ আহরণে অপরের কর্তৃত্বমুক্ত সম অধিকার হোল সমাজতান্ত্রিক সমাজের মৌল নীতি। আর সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় সমাজের সকল পরিবারের সম অংশ এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই হোল এ-সমাজের প্রথম ধাপ। কারণ পরিবারকে কেন্দ্র করে সমাজের সকল মানুষের উপর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব না বর্তালে সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে কেউ সঠিক

সচেতন হতে পারে না। অন্য দিকে বস্তু বণ্টনের অধিকারের সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যুক্ত না থাকলে উৎপাদনের গুরুত্ব বা অধিক উৎপাদনের প্রেরণাও জাগে না। সহজ কথায় রাষ্ট্রযন্ত্রে এবং অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থায় শ্রেণীকর্তৃত্ব থাকলে এর কোন কিছুই কার্যকর হওয়া সম্ভব নয়। শ্রেণীকর্তৃত্ব সর্বদাই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য সংগঠিত হয়ে থাকে এবং সেখানে সমাজের সকল মানুষের কখনই প্রবেশাধিকার থাকে না। কাজেই সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে চাইলে তার প্রথম কাজই হবে সামাজিক অর্থনীতির প্রধান যে-বিষয় দুটি—উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা—তার সঙ্গে দেশের সকল পরিবারকেই সম মর্যাদায় যুক্ত করে নেওয়া।

'রাষ্ট্র সকলের' এই উক্তি আজকের সমাজেও এক বিরাট ধাপ্পা। কোন কালেই রাষ্ট্র জনগণের ছিল না। জনগণ চিরকালই এখানে অপাঙ্‌ক্তেয়। এদের না থাকে প্রসাশনে কোন যোগ্য স্থান, না থাকে অর্থনৈতিক বিলি-ব্যবস্থার উপর যুক্তিগ্রাহ্য অধিকার। ন্যূনতম চাহিদা আদায়ের অধিকারও এদের নেই। এদের প্রায় সব প্রাপ্যই অপরের দয়ার দান। একদল চালাক বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ-সমাজে সর্বেসর্বা এবং তাঁরা সমাজের সব রস নিংড়ে নিয়েও রাষ্ট্রকে 'জনগণের রাষ্ট্র' করে রেখেছেন। অথচ অন্যায় প্রতিকারে প্রত্যক্ষ অধিকার থাকলে, অন্তত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সক্রিয় কর্তৃত্ব থাকলে তবেই রাষ্ট্র জনগণের রাষ্ট্র হতে পারে এবং কেবল সেখানেই মানুষের আত্মীক, নৈতিক এবং পরিপূর্ণ কর্মশক্তির বিকাশ ঘটতে পারে। হোক দেশের সম্পদ সীমিত বা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল, কিন্তু মানুষ যদি বুঝতে শেখে এবং পরিবর্তিত মানব চেতনায় যে বোধশক্তির বিকাশ অনিবার্য ধরে নেওয়াই সংগত—ওই অপ্রতুল সম্পদের প্রাপ্য অংশ থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তবে তার সমগ্র সৎপ্রবৃত্তি ও কর্মপ্রেরণা শিথিল হয়ে পড়বেই। ভিতরে অশান্তি দানা বাঁধবে এবং সুযোগ ঘটলেই সেই মনের সংঘাত সংঘর্ষের রূপ নেবে। বঞ্চিত মানুষের ঘুমন্ত ঈর্ষাকে জাগিয়ে তুলতে সর্বাধিক সাহায্য করে অসম বণ্টন ব্যবস্থা। কাজেই সুষ্ঠু ও ন্যায়নিষ্ঠ বণ্টন ব্যবস্থাই যে সমাজ-

তন্ত্রের প্রধান অবলম্বন এতে সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রের সংহতি, সমৃদ্ধি আর নিরাপত্তাও বহুলাংশে এর উপর নির্ভর করে।

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের আত্মীক সত্তার মর্যাদা স্বীকৃত। এ-সমাজ তাত্ত্বিক দিক থেকে সুষ্ঠু ও ন্যায্য বণ্টন ব্যবস্থারও সহায়ক। কিন্তু এর অস্তিত্ব কেবল শ্রেণীবিশেষ বা দলনির্ভর হলে সেখানে গণ-সহযোগিতার সুযোগ থাকে খুব সামান্যই, বিশেষ বিশেষ শ্রেণী অথবা সরকারী আমলাদের কর্তৃত্বই কায়েম হয়। অর্থাৎ হয় রাজকর্মচারী, নয়ত দলীয় ব্যক্তি এর বাইরের জনগণকে বিশ্বাস করার শক্তিই দলতন্ত্রে সীমিত হয়ে যায়। 'গণতন্ত্র' কেবল এই সংজ্ঞার প্রভাব থেকেই অবস্থার পরিবর্তন হলে বহু পূর্বে এ-পরিবর্তন ঘটে যেত। কিন্তু এটা আজও কোথাও হয়নি।

মানুষের ক্ষমতা ও ভোগস্পৃহা স্বভাবতই কিছুটা.অবাধ্য প্রবৃত্তি। আর এ-প্রবৃত্তির অবাধ বিকাশ ঘটতে পেলে তা শুধু নিজ গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে স্বস্তি পায়না অপরের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণে আকৃষ্ট হয়। অধিকাংশ দমন, পীড়ন, হানাহানি, যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যের মূলে রয়েছে এই প্রবৃত্তিরই রকমফের তাড়না। একে দমন করা সহজ নয়, যদিনা সে উপলব্ধি করতে পারে যে, সার্বিক মানুষের প্রতিরোধ শক্তি তার ওই প্রবৃত্তিকে দমন করার শক্তি পেয়ে সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু কোন রাজনীতিক বা এরূপ কোন দলের সামর্থ্য নেই সার্বিক মানুষের ভিতর স্থায়ীভাবে এ-শক্তির উন্মেষ ঘটায়।

অবশ্য ধর্ম বণ্টনেই হোক, বা পণ্য বণ্টনেই হোক, কমিউনিস্টরা কিন্তু পূর্বোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন এবং তাঁদের যা অভিমত তাতে বাইরের কিছু মানুষের এমন একটি ধারণা জন্মেছে যে, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে কোনরূপ বণ্টন বৈষম্য নেই বলেই সেখানে ওই প্রবৃত্তিটা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এ-ধারণা স্বাভাবিক। কারণ একটির স্বরূপ দৃষ্ট হচ্ছে আর অন্যটি রয়েছে দৃষ্টির বাইরে। অথবা দৃষ্ট ঘটনাগুলি এঁদের মনোমত নয়, অথচ প্রচার গুণে অদৃষ্ট ঘটনায় দেখতে পান আরব্ধ মূর্তিটি। স্বভাবতই এর আকর্ষণ বেশী। তবে এ মনে যুক্তির প্রভাব নেই। কোন যুক্তিমূল্যও এতে নেই। আর সব

শোষে, যেখানে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে 'অনাবশ্যক' ও 'ঘৃণ্য' ভাবতে পরামর্শ দেওয়া হয় সেখানে সম্পদ বা পণ্য বন্টনে বৈষম্য স্বভাবতই গুরুত্বহীন হতে বাধ্য। পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি স্নেহজনিত দায়িত্ব বা কর্তব্যের আকর্ষণ থেকেই মানুষের সর্বাধিক সঞ্চয় প্রবৃত্তি, কর্মপ্রেরণা ও সামাজিক অনুসন্ধিৎসা জেগে থাকে। এর ব্যত্যয় ঘটলে শুধু এই প্রবৃত্তি দমিত হয় তাই নয়, জীবনের মূল্যবোধই কমে যায়।

কিন্তু এটাই এর একমাত্র বিষয় নয়। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মনস্তাত্বিক দিক হোল, পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধ ও পরিবারের প্রতি দায়িত্বের আকর্ষণ সীমিত হলে মানুষ কিছুটা অসৌষ্ঠব, অবিবেচক, এমন কী অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর হতেও প্রেরণা পায়। এ-অবস্থায় মানুষকে যে কোন ভাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ে। হয়ত কমিউনিস্ট শাসনে এর প্রয়োজন আছে। আর তারই জন্য হয়ত তাঁরা ব্যক্তির আজকের দায়িত্বই নয়, ভবিষ্যৎ দায়িত্বটাও রাষ্ট্রের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে বলেন। অর্থাৎ নিজের ও বংশধরদের ভবিষ্যৎ চিন্তার যখন হেতু নেই (?) তখন রাষ্ট্রের সম্পদ কোথায় কী ভাবে ব্যবহৃত হোল অথবা কে কতটা ভোগ করলো তা নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তোলারই প্রয়োজন বোধ না করে। প্রতিবাদহীন বঞ্চনার এই আবিষ্কারটা কমিউনিস্ট শাসকদের সত্যই এক বিস্ময়কর অবদান!

একদিকে মানুষ সভ্য হচ্ছে, মননশীলতা ও কর্মদক্ষতায় দক্ষ হয়ে আত্মনির্ভর হতে চাইছে, আর একদিকে একদল লোক তাদের বঞ্চনার ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত ও পোক্ত করতে সক্রিয় হচ্ছে। মানুষের প্রতিবাদ শক্তি ও প্রবৃত্তির যত বিকাশ ঘটছে, শ্রেণীস্বার্থ ততই নতুন হাতিয়ারের সন্ধানে তৎপর হচ্ছে, নতুন কৌশলে আত্মরক্ষা করছে। এটা নিয়ম। কিন্তু সর্বপ্রকার বঞ্চনাকে সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ ও নির্বিরোধী করার কৌশল পেয়েছেন কমিউনিস্ট শাসকরা। এঁরাই একে একটি মাত্র ধোঁকার সাহায্যে বর্ণহীন ও সহনশীল করতে পেরেছেন। শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থের বিকৃতিটা কমিউনিস্ট স্পর্শ পেয়ে এমনই

হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে যে, স্পর্শকাতর ও ভাবালু মনই নয়, অনেক হিসেবী মনকেও বিভ্রান্ত করে তুলেছে। নতুনের প্রলোভনে এইসব মন স্থিতিশীল আবর্জনার সঙ্গে অনেক অনাবশ্যক আবর্জনাও আঁকড়ে ধরছে।

অবিচারের বৈশিষ্ট্যই হোল, এখানে যুক্তির জোর যত কমে আসে গলার জোর ততই বাড়তে থাকে। যেমন শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের মতই বেশীর ভাগ ধনী ব্যক্তিরা বলতে চান, 'ধন-সম্পদ শুধু তাঁদের কাছেই সার্থক প্রয়োগের সুযোগ পায় এবং তাঁরাই একে যথাযোগ্য ক্ষেত্রে নিয়োগ করে জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে পারেন', —এর সমর্থনে এঁদের নির্মিত শিল্প-ব্যবসায় যে-কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এবং দান-খয়রাতে যে-সব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেগুলিই তুলে ধরেন। এঁদের গর্বিত হৃদয়বৃত্তি চেতনাকে কেবল এদিকেই নিবদ্ধ রাখে তাই একবারও মনে জাগে না, যে-কর্মক্ষেত্র তাঁরা সৃষ্টি করেছেন তা বহুকে নিংড়ানো সম্পদে সৃষ্টি হয়েছে তাই নয়, তাদের আরো নিংড়ে রস বের করার মৌল উদ্দেশ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। মনে হয় না, যে-দান খয়রাত তাঁরা দিয়েছেন তার প্রতিটি কণাই এসেছে অপরের বহু শ্রমে অর্জিত রক্ত কণিকা থেকে। এঁদের এই শক্তি ও প্রবৃত্তি রাষ্ট্রশক্তির মদত না পেলে হয়ত এতটা প্রখর হতে পারত না। কিন্তু এর সঠিক মূল্যায়ন শেষে একথা অবশ্যই বলা চলে,—যা এঁরা দিয়েছেন এবং যা নিয়েছেন তার ভিতর কিছুটাও যদি ন্যায্যতা থাকত তবে জনগণ আরও বৃহৎ, আরও বেশী সম্পদসৃষ্টিকারী ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারত। সহজ কথায় জনগণ তাদের প্রাপ্য ন্যায্য অংশ পেলে জীবিকার সন্ধানে কারো মুখাপেক্ষী হতে হোত না এবং অন্যের দান-খয়রাতের প্রয়োজনও সমাজে থাকত না।

অবশ্য সভ্যতার জন্মকাল থেকে পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের অনেকে কৃষি, শিল্প-বাণিজ্যে যে-গতিবেগের অবদান রেখেছেন তাকে ছোট করা অনুচিত। কিন্তু এর সঙ্গে মানবীক চেতনার সংগতি থাকলে এবং সে-চেতনায় সমাজের আর পাঁচজনের প্রয়োজন গুরুত্ব পেলে মানব

সমাজের চেহারাই আজ পালটে যেত আর এঁরাও পেতেন সে-সমাজে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন। তবে এটা যে হয়নি তার একটি প্রধান কারণ বোধ হয় রাষ্ট্রকর্তারাই এ-প্রয়োজন স্বীকার করতে পারেন নি। সম্পদ ও কর্তৃত্ব এ-দুয়ের আকর্ষণই সমধিক। আর এ দুটি যত কেন্দ্রীভূত থাকে, গণ্ডীবদ্ধ হয়, ততই যে ওই আকর্ষণের সফল পরিণতি ঘটে এ-তথ্য এঁদের অজানা নয়। কাজেই শুধু সম্পদ নয়, কিংবা শুধু উৎপাদন বা বণ্টনও নয়, রাষ্ট্রের উপর সার্বিক মানুষের যেকোন প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বই এঁদের কাছে হয় অসহনীয়। যদিও এই সার্বিক মানুষের কর্তৃত্ব ভিন্ন এর কোন প্রতিকারও নেই, 'আছে বা থাকতে পারে' অথবা সার্বিক মানুষেয় ন্যায়বোধ বা কর্মশক্তির উপর সন্দেহ বশে অন্য যে-বক্তব্যই থাক এটা অনেকেই জানেন, সেই বক্তব্যে সত্য নেই এবং সৎ উদ্দেশ্যে তা বলাও হয়নি।

তবে এটাও নতুন কথা নয়। অনেকেই এ-কথা বলেছেন। 'রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর সার্বিক মানুষের কর্তৃত্বই যে সুষ্ঠু ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের পথ' অনেকেই এ বলেছেন। কার্ল মার্ক্স আর গান্ধীজীও এঁদেরই অন্তর্গত। হয়ত এঁরা শীর্ষস্থানীয়, কিন্তু সার্বিক মানুষের এই কর্তৃত্ব অর্জনের সঠিক পথটি বেছে নেবার সহজ ও সুনির্দিষ্ট কোন নিশানা এঁরাও স্পষ্ট করেননি। কার্ল মার্ক্স যেটা দেখিয়েছেন তার পরিণতি হোল একটি শ্রেণীর স্থলে আর একটি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা। আর গান্ধীজী হয়ত তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত জানাবার অবকাশই পাননি। কিন্তু এঁরা শ্রেণীপ্রভাব ও শ্রেণীকর্তৃত্বের চরিত্র যে খুব স্পষ্ট করেই দেখতে পেয়েছিলেন এবং সমগ্র মানুষের মঙ্গলের জন্য এর পরিবর্তে সমাজে সার্বিক কর্তৃত্বের উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন এতে সন্দেহ নেই। সুতরাং রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর শ্রেণী কর্তৃত্ব থাকবে, না সার্বিক মানুষের কর্তৃত্ব বর্তাবে সেটা আজ প্রশ্নই নয়। প্রশ্ন হোল, সার্বিক মানুষের উপর এ-কর্তৃত্ব বর্তাবে, ও স্থায়ী হবে কীভাবে? আর আমার প্রধান আলোচ্য বিষয়ও ঠিক এইটিই।

নতুন সমাজের নকশা

অপরের সাহায্য অথবা সহযোগিতা ভিন্ন মানুষ বাঁচতে পারে না। আদিমকালে কিংবা জঙ্গলবাসী কারো কারো পক্ষে এ সম্ভব হলেও সমাজবদ্ধ সভ্য মানুষের কাছে এ-চিন্তা মূল্যহীন। কারণ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, প্রয়োজনের এই ন্যূনতম বস্তুর যেকোনটির জন্যই মানুষকে বহুর শক্তি ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে হয়। একক চেষ্টায় কেবলমাত্র লতাপাতার কুঁড়ে ঘর, গাছের বাকল আর বনের ফল মূল বা কাঁচা মাংস অবধিই সংগ্রহ করা চলে, তার বেশী কিছু নয়। আর এই অক্ষমতা বা বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হয়েই মানুষ হয়েছে একে অপরের সহযোগী ও সহযাত্রী। সুতরাং মানুষ যে নিজের প্রয়োজনেই একে অপরের সাহায্য চেয়েছে ও করেছে এটা জীবন্ত সত্য।

কিন্তু এও আর একটি সত্য যে, মানুষ কোন কালেই এই সত্যকে সঠিক মর্যাদা দিতে পারেনি। উপরন্তু আজকের বৃহৎ সংখ্যক মানুষ এই সব সহযোগী ও সাহায্যকারীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ সূত্রটাও হারিয়ে ফেলেছে। যান্ত্রিক সভ্যতা এর একটি হেতু সন্দেহ নেই— এবং বিনিময়ের মাধ্যম পণ্যের স্থলে মুদ্রা হয়ে এটা যে আরও বিস্তৃত হয়েছে এও ঠিক, কিন্তু অন্তরের ব্যবধান ঘটেছে ভিতরে আরও একাধিক শ্রেণীর সক্রিয় আবির্ভাবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরাই সর্বেসর্বা হয়েছে বলে। বস্তুত এরাই মানুষে মানুষে দূরত্ব ঘটিয়েছে, মানুষকেই মানুষের প্রধান শত্রু করেছে এবং বহু ক্ষেত্রে মানুষকে অমানুষ আর হিংস্র হতেও প্ররোচিত করেছে। এ সবই করেছে এরা ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থের প্রয়োজনে এবং কৃতকার্য হয়েছে মানুষকে বিভিন্ন সমস্যার জালে জড়িয়ে নিয়ে। এরা কারা এক কথায় সে-পরিচয় দেওয়া শক্ত। তবে প্রধান যে শাসকশ্রেণী তাতে বোধহয় সন্দেহ নেই। সহযোগী অনেকে থাকলেও মূলে আছেন এঁরাই। এঁদের ভিতর ভাল মন্দ অবশ্যই আছেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সেই ভালর প্রভাব মন্দকে পরাস্ত করতে পারেনি, চিরকাল পরাজিতই হয়েছে।

অনেকের ধারণা, বিশেষ করে রাষ্ট্রকর্তারা সেটাই প্রমাণ করতে চান যে, 'শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরাই পরস্পর সংযোগ স্থাপনের উপকরণ-গুলি হস্তগত করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছেন, তাঁরাই খাদ্য উৎপাদনকারী কৃষক থেকে বণ্টনকারী ফড়েকে নিকটে এনেছেন, তাঁতী থেকে বস্ত্র ব্যবসায়ীর গুরুত্ব বাড়িয়েছেন' ইত্যাদি।

এসব বক্তব্যে সত্য আজ অবশ্যই কিছু আছে। কিন্তু এও ঠিক, এটা সত্য হয়েছে অবস্থাটা ঘটে যাওয়ার পর এবং রাষ্ট্রকর্তাদের স্বার্থ বা সহযোগিতা না থাকলে এ-অবস্থার পত্তন হওয়াই সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের চরিত্র যেভাবেই চিত্রিত করা হোক সেটা সম্ভব হয়েছে রাষ্ট্রকর্তাদেরই সমর্থন বা সহযোগিতায়। কোথাও অক্ষমতা ধরে নিলেও এঁরা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কারণ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রমানুষকে সঠিক পথে নিয়ে যাবার দায়িত্ব এঁদেরই। এঁরা যদি সমাজকে এমন ভাবে গড়ে তুলতেন যে, সাহায্যটা সকলকে সাহায্যকারীর হাত থেকেই নিতে হবে, কোন তৃতীয় পক্ষের স্থান সেখানে হবে না, তবে প্রয়োজনেই মানুষ পরস্পর ঘনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ ও যুক্তিবাদী হয়ে উঠত। একে অপরের প্রয়োজনটাও সহজে অনুভব করতে পারত। আর এ-ব্যাপারের আদত রহস্যও হয়ত এখানেই। কারণ 'শাসক' এই শব্দের সংজ্ঞা ও তার অন্তর্নিহিত চরিত্রের সঙ্গে এ-মনোভাব আদপেই সংগতিহীন এবং অনিবার্য কারণেই কোন শাসকের কাছে এ-ব্যবস্থা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কেন যুক্তিগ্রাহ্য হয় না তার বহু ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু কারো সতর্ক দৃষ্টি থাকলে এবং চেতনা অপরের প্রভাবমুক্ত হলে অবশ্যই ধরা পড়বে যে, মানুষে মানুষে ব্যবধান ও বিবাদ সৃষ্টির যত সুযোগ আছে তার একটিও এঁদের কাছে ফেলনা নয়, বরং এর প্রতিটিকেই এঁরা অপরের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে যথাসাধ্য মূলধনে পরিণত করে থাকেন। ঠিক এইখানে এঁরা প্রায় সকলেই এক। আর যেহেতু উৎপাদন, বণ্টন, পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিই হোল জনগণের প্রত্যক্ষ স্বার্থজড়িত ও পরস্পর অর্থনৈতিক মিলনকেন্দ্র, কাজেই সেখানে হয়ত সরকারী আমলা, না হয় এক দল বিশেষ মানুষের সাহায্যে একটা বাধা বা বিভেদের

প্রাচীর গড়ে তোলাও প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। সমাজের সকল মানুষের পরিপূর্ণ সমর্থন আর সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন সমাজ যে সম্পূর্ণ হতে পারে না এবং প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ স্বার্থ ন্যায্য স্তরে না গেলে সেখানে কিছুমাত্র ন্যায়নিষ্ঠা ও পরস্পর একাত্মতাও থাকে না, এ-বোধ অন্যের তুলনায় শাসকদেরই বেশী থাকে বলে বিভেদের কৌশলও তাঁরা সহজেই রপ্ত করতে পারেন।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ পথ, কিন্তু সমগ্র একটি জাতিকে সমৃদ্ধ হতে হলে সেই পরিকল্পনায় অবশ্যই সে-জাতির সকলের যুক্তিগ্রাহ্য অংশ ও সক্রিয় কর্তৃত্ব থাকা চাই। কারণ ব্যক্তি, গোষ্ঠি, শ্রেণী অথবা সরকারী আমলা কর্তৃত্বের ভিতর পার্থক্য খুব সামান্যই। তথাকথিত রাষ্ট্রীয়করণ-এর সঙ্গেও দেশের অবশিষ্ট মানুষের অন্তত লাভের সম্বন্ধ বিশেষ নেই। 'রাষ্ট্রিক' এই সংজ্ঞায় সমগ্র দেশবাসী অন্তর্ভুক্ত হলেও এক্ষেত্রে আসল কর্তৃত্ব বর্তে সরকারী আমলাদের উপর এবং যাঁরা দায়ী থাকেন কেবলমাত্র রাষ্ট্রকর্তাদের কাছেই। জনগণের তোয়াক্কা এঁদের করতে হয় না এবং তাদের সহযোগিতারও প্রয়োজন পড়ে না। ফলে জনগণ ক্রমেই দূরে সরতে থাকে এবং তাদের অসহায়তাও বেড়ে চলে। এটা নতুন কিছু নয় এবং এই অনিবার্য পরিণতি শেষে যদিও প্রশ্ন জাগে, গণসমর্থন আদৌ গণ-সহযোগিতা ব্যতীত সার্থক হতে পারে কিনা এবং এই সমর্থন ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ থাকলে অপর পক্ষের সততায় জনগণ আস্থা রাখতে পারে কিনা? কিন্তু এর উত্তর ওই অপর পক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্রকর্তারা কোন কালেই দেন না। সুতরাং এর পর থাকে জনগণের নিজস্ব বক্তব্য। কিন্তু তাও খুব স্পষ্ট নয়। কেবল মাত্র এটুকুই স্পষ্ট যে, তারা এই সমাজ এবং এর পরিকল্পিত ব্যবস্থার পরিবর্তন চায এবং হয়ত এমনই একটি সমাজ চায় যেখানে কোন অন্যায় ও অসত্য নেই, এই প্রবৃত্তি জাগার পরিবেশ নেই, সমাজের প্রকৃত চিত্র ব্যক্ত হতে বাধা নেই, কোন অপরাধী বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তির ক্ষণকাল আত্মগোপনের সুযোগ নেই, সম্পদ অর্জন ও বণ্টনে কোন বৈষম্য বা কারো অসহযোগিতা নেই, ধর্মঘট, কর্মমন্থর বা কর্মপণ্ডের কিছুমাত্র সুযোগ ও প্রয়োজন নেই, দেশের প্রতিটি

কর্মক্ষম মানুষ ঠিক সময়ে যোগ্যতানুযায়ীই কাজ আর তার ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে এবং সর্বোপরি দেশের সকল মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই দেশ ও দেশবাসীকে চরম সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে দিতে সতত তৎপর রয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এটা একান্তই দুরাশা এবং এর জন্য অন্য কোন পথও মুক্ত নয়। এখানে একটিই মাত্র পথ আছে, যে-পথ হোল রাষ্ট্রের যাবতীয় বিষয়বস্তুর উপর সকল মানুষের সম অধিকার স্বীকার করা এবং এর সমগ্র দায়দায়িত্ব সম অংশে সকলের উপর অর্পণ করা। এরই নাম সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা। অন্তত সমাজকে 'সমাজতন্ত্র' সংজ্ঞায় ব্যক্ত হতে হলে সেখানে আর যেকোন পরিকল্পনাই হবে একটি তামাসা। যে-তামাসা চলছে আজ ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রতিটি দেশে, এমন কি তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও। সকল মানুষকে সম সুযোগ ও মর্যাদায় আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ করে দিতে কোন পরিকল্পনাই সক্ষম হয়নি। বরং একদল মানুষের প্রভুত্বটাই কেবল সর্বত্র সার্থক করে তুলেছে।

ভারত আজ সমাজতন্ত্রের উপাসক। তার উপাসনা চলেছে ভিন্ন চরিত্রের একটি পরিকল্পনার সাহায্যে। এটাই নাকি সঠিক পথ। কিন্তু এও ত কিছু লোক বলছেন, আজ বেসরকারী শিল্প-ব্যবসা আছে, কয়েকটি পরিবার বা কিছু মানুষ সেখানে অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের সুযোগ পাচ্ছে, কাজেই জনগণের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ করে ওই সঠিক পথের ন্যায্যতা জাহির করা যাচ্ছে। প্রয়োজনে ওই সব শিল্প-ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ব করার আশ্বাসে গণচেতনাকে আশ্বস্ত রাখা যাচ্ছে। কিন্তু এর ত একটা শেষ আছে এবং একদিন তা হবেও, কিন্তু তখনও দেখা যাবে আজকের মতই কিছু লোক প্রাচুর্যের শিখরে এগোচ্ছে এবং বাকী সকলে আর্থিক ও মানসিক নিঃস্বতায় ধুঁকছে। তখন ধোঁকা দেবার এই সুযোগ থাকবে না, নতুন যুক্তি খাড়া করতে হবে এবং তাতেও যখন কুলাবে না তখন রাষ্ট্রের দমনযন্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ ওই ব্যবধানটা মেনে নিতে বাধ্য করা হবে। এটাই'ত ইতিহাস। কেবল ভারতের বুকেই অন্য কিছু নেমে আসবে কি আসমান ফুঁড়ে? আসলে শ্যামরাজত্ব, ভজহরিরাজত্ব, রামরাজত্ব বা বিভিন্ন তন্ত্রজাত

রাজত্বে শ্রেণীস্বার্থ ও দুর্নীতি নেই বা ছিল না এবং বহুর রক্তে সেখানে মুষ্টিমেয় মানুষের স্ফীত হওয়ার পথ রুদ্ধ করা গেছে এর প্রামাণ্য কোন তথ্য নেই। কল্পনায় বা গালভরা গল্পে যা সত্য হতে চেয়েছে তথ্যে তার কিছুমাত্র সমর্থন মেলেনি। তবে অন্যত্র এসব সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। আংশিক সরকারী কর্তৃত্বেও ওটা চলতে পারে। যেমন ভারতে এখনও কিছুটা চলেছে। লাভের কয়লা-শিল্প সরকারী আমলা কর্তৃত্বে যেয়ে এক বছরেই লোকসান হোল ১৭ কোটি টাকা (সংবাদ আনন্দ বাজার ২৯।৬।৭৪) এবং মূল্য বাড়লো প্রায় দ্বিগুণ। এটাই স্বাভাবিক এবং এখন অবধি সংবাদ প্রকাশের সুযোগটাও। কিন্তু সমাজের সর্বক্ষেত্রে এই আমলা কর্তৃত্ব বর্তালে এই সংবাদই আরোহণ করবে প্রগতির স্বর্গে যা আজকের অর্থে প্রকাশ পেলে হবে ওই প্রগতিরই বিরোধিতা।

ভারত আমার লক্ষ্যস্থল। এর শান্তি, সমৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার স্বপ্ন। আর অধিকাংশ ভারতবাসীই এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থার সন্ধান পেতে উদগ্রীব যা কারো প্রদর্শিত পথে চলবে না, অপরকেই পথ দেখাবে। আত্মমর্যাদায় এবং সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে সিক্ত যেকোন জাতির কামনাই হয়ত তাই। অন্তত তাই হওয়া সংগত। অতএব এই বিরাট জনবহুল ও সমস্যাসঙ্কুল দেশটির জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করে তাকে সব দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার, যার সন্ধানে আমরা হাতড়ে বেড়াচ্ছি তার হদিস সেখানে মেলে কি না?

ধরা যাক, ভারতের লোক সংখ্যা ৫৫ কোটি। এর ভিতর কমবেশি ৫ কোটি মানুষকে কোন অবস্থাতেই উদ্বোধন কাজের সামিল করা যাবে না। এর জন্য ১।২ বছর সময় লাগবে। কাজেই বাকী ৫০ কোটি মানুষের সকলকেই প্রথমতঃ একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের আওতায় এনে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন, নির্মাণ ও সর্ব-প্রকার বণ্টনব্যবস্থার পরিপূর্ণ দায়িত্ব এর উপর ন্যস্ত করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠান হবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বয়ংশাসিত সংস্থা। এটি একটি করপোরেশন বা অন্য নামেও পরিচিত হতে পারে। তবে

'করপোরেশন' এই নামই হয়ত যুক্তিযুক্ত। এই করপোরেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকবে রাজধানী দিল্লীতে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসহ প্রতিটি রাজ্যে থাকবে একটি করে শাখা কার্যালয়। এই শাখার অধীন প্রতি একহাজার পরিবার নিয়ে গঠিত হবে একটি বণ্টন ও সাধারণ উৎপাদন কেন্দ্র এবং প্রতি ২০টি বণ্টন ও উৎপাদন কেন্দ্র নিয়ে গঠিত হবে একটি সরবরাহ, সঞ্চয়, সংরক্ষণ ও সার্বিক উৎপাদন কেন্দ্র। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মূল করপোরেশনের শেয়ার মূলধন থাকবে ৫০ শতাংশ এবং স্থানীয় জনগণের ৫০ শতাংশ।

বণ্টন কেন্দ্রগুলি গঠিত হবে অপর কোন বণ্টন কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ লাভ-ক্ষতির দায়মুক্ত হয়ে, কিন্তু সরবরাহ কেন্দ্র গঠিত হবে তার অধীন মোট ২০টি বণ্টন কেন্দ্রের সমমূলধন ও তত্ত্বাবধানে এবং এরা প্রত্যেকেই হবে এর লাভ-ক্ষতির সম অংশীদার। মূল করপোরেশনের রাজ্য শাখার সঙ্গে সকল সংস্থারই সংযোগ থাকবে, কিন্তু যোগাযোগের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব বহন করবে সরবরাহ কেন্দ্রগুলি।

প্রতিটি বণ্টন ও সরবরাহ কেন্দ্রই গঠিত হবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর মর্যাদা নিয়ে। পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থায় কোম্পানী আইনের রূপ কী হবে এবং এই সকল সংস্থার সংজ্ঞা কী হবে সে-চিন্তা তখনকার। কিন্তু এখন এর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই রেজিষ্ট্রী হবে এবং কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, পরিবহন, নির্মাণ প্রভৃতি দেশের সকল মানুষের লাভ-ক্ষতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবাধ গতির স্বীকৃতি থাকবে।

করপোরেশনের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শাখায় বিভাগ থাকবে প্রধানতঃ ১৫টি। এই বিভাগগুলি রাজ্যের বণ্টন ও সরবরাহ-কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং ক্ষেত্রবিশেষে করপোরেশনের নিজ দায়িত্বে সমগ্র পরিকল্পনার আকাঙ্ক্ষিত বাস্তব রূপটি ফুটিয়ে তুলে অতি দ্রুত তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবে। প্রয়োজনে পরিবর্তন অবশ্যই হবে, তবে আপাতত এর পরিচয় হবে নিম্নরূপ। যথা :—

১) কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য চাষ।

২) শিল্প (কুটির, মাঝারি, বৃহৎ বা মূল শিল্প)।

৩) আমদানি।

৪) রপ্তানি।

৫) পরিবহন।

৬) নির্মাণ।

৭) সরবরাহ।

৮) শেয়ার, ঋণদান ও ঋণগ্রহণ।

৯) পরিসংখ্যান।

১০) পরিকল্পনা ও কর্মপ্রদান।

১১) প্রচার।

১২) জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা।

১৩) শিক্ষা।

১৪) সংস্কৃতি ও খেলাধূলা।

১৫) সামাজিক ন্যায়নীতি ও সংহতি।

এই বিভাগগুলির উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহ পালিত হবে নিম্নলিখিত উপায়ে। যথা :—

কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য চাষ

বিভাগটি সর্বপ্রথম প্রতিটি বণ্টনকেন্দ্রের সাহায্যে রাজ্যের সমগ্র কৃষি, মৎস্য চাষ ও পশুপালন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিটি বণ্টন কেন্দ্রের অভিমত ও সক্রিয় শক্তির বিচারে সম্ভাব্য কেন্দ্র-ভিত্তিক সমগ্র রাজ্যের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করে এর উৎপাদন ও বণ্টন স্তরকে এই সকল কেন্দ্রের দায়িত্বে ন্যস্ত করে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য যথা, প্রয়োজনীয় সেচ, বিদ্যুৎ, সার, বীজ, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদির যোগান দেবে। এখানে কোন সুযোগই নষ্ট না হয় এবং কোন অভিযোগ না দেখা দেয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

শিল্প

প্রতিটি বণ্টন ও সরবরাহ কেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের পর স্থানীয় প্রয়োজন ও সুযোগের ভিত্তিতে রাজ্যব্যাপী ব্যাপক একটি পরিকল্পনা রচনা করে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা ও তার পরিচালনা ভার দেবে বণ্টন কেন্দ্রের উপর, মাঝারি শিল্পের ভার

সরবরাহ কেন্দ্রের উপর এবং মূল বা বৃহৎ শিল্পের দায়িত্ব করপোরেশনের রাজ্য শাখার উপর ন্যস্ত করে এর প্রতিটি ক্ষেত্রে মূলধন ও সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে থাকবে। বৃহৎ এবং বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদনের শিল্প সংক্রান্ত মূল পরিকল্পনা রচিত হবে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে প্রতি বছর কেন্দ্রীয় বাজেট অধিবেশনের সময় এবং সেখানেই স্থির হবে, দেশের কোন অংশে কোন কোন শিল্প কতটা উপযোগী হবে ও কীভাবে গড়ে উঠবে। রাজ্যশাখা এক্ষেত্রে কেবল এই সিদ্ধান্তই কার্যকর করবে। কিন্তু কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠবে রাজ্যের প্রয়োজন এবং স্থানীয় সুযোগ ও ক্ষমতা অনুযায়ী এবং এর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে রাজ্য শাখার এই দপ্তরটির উপর।

আমদানি

স্থানীয়ভাবে এর সবটুকু দায়িত্বই থাকবে করপোরেশনের রাজ্য শাখার উপর। রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী এবং সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে যে-বস্তু যতটা আমদানি করার প্রয়োজন স্থির হবে ও আন্তঃরাজ্য সহ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে তার সবটাই করবে একমাত্র রাজ্য শাখা। এই আমদানিকৃত সামগ্রী প্রত্যেকের চাহিদা ও সংগতি অনুযায়ী সরবরাহ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিটি শিল্প ও বণ্টন কেন্দ্রে যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়া এবং তার সদ্ব্যবহারের প্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখার দায়িত্বও থাকবে এই দপ্তরের উপর।

রপ্তানি

সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে স্থিরীকৃত এবং রাজ্যের রপ্তানিযোগ্য বস্তু সামগ্রী সরবরাহ কেন্দ্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করে আন্তঃরাজ্য সহ বিদেশের বাজারে যথাযথ রপ্তানি করার দায়িত্ব থাকবে করপোরেশনের রাজ্য শাখার উপর। এই দপ্তর এককভাবে ওই দায়িত্ব পালন করবে।

পরিবহন

বাস, ট্রাম, স্টীমার, লরি, ট্যাক্সি প্রভৃতি রাজ্যের সর্বপ্রকার রাজ্য-ভিত্তিক পরিবহনের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে প্রধানতঃ রাজ্যশাখার এই

দপ্তরই এর পরিচালনা-দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে এর অংশবিশেষ সরবরাহ কেন্দ্রের সাহায্যে পরিচালনা করবে। এর শেষ লক্ষ্য থাকবে জল, স্থল ও আকাশ পরিবহনের সর্বস্তরের সবটুকু কর্তৃত্ব করপোরেশনের অধিকারে আনা এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যশাখার দায়িত্বে পরিচালনা করা।

সরবরাহ

রাজ্যের সমুদয় শিল্প ও সরবরাহ কেন্দ্রের চাহিদা মত যাবতীয় সামগ্রীসহ রাজ্যের সরকারী, আধা-সরকারী এবং প্রত্যক্ষভাবে জনগণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের যেকোন প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহের মূল দায়িত্ব থাকবে রাজ্যশাখার এই দপ্তরের উপর। কেবলমাত্র দূরবর্তী স্থানগুলিতেই এ-দায়িত্ব ন্যস্ত হবে সরবরাহ কেন্দ্রের উপর। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান ভারতে এই সরবরাহ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে—বিশেষ করে পূর্বোক্ত স্থানগুলির ক্ষেত্রে প্রায়শঃই যেসব ক্রিয়াকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া যায় একটু বন্ধু-বেশে তার সন্ধান নিলে স্পষ্টই দেখা যাবে 'পুকুর চুরি' গল্পটা নিছক গল্পই নয়, অনুরূপ ঘটনার সত্যতা থেকেই এ-গল্পের উৎপত্তি এবং এ-ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে। কাজেই এখানে জাতীয় সম্পদের যে-বিরাট অপচয় হয় এবং দেশবাসীর হয়রানির সংবাদও তাতে থাকে তাকে প্রতিরোধ করতেও এই দপ্তর দ্রুত সক্রিয় হবে।

নির্মাণ

স্থানীয় সরকারী, আধা-সরকারী এবং জনগণের স্বার্থজড়িত প্রতিটি নির্মাণ কার্যের দায়িত্ব থাকবে করপোরেশনের রাজ্যশাখার এই দপ্তরের উপর। এই দপ্তর তার নিজ দায়িত্বে এবং প্রয়োজনে সরবরাহ কেন্দ্রের সাহায্যে একাজ সম্পন্ন করবে। স্মরণ করা চলে, দুর্নীতি, জাতীয় সম্পদের অপচয় এবং আরও বহু রকম পাপের ইতিহাস আছে এই ক্ষেত্রটিতেও।

শেয়ার, ঋণদান ও ঋণগ্রহণ

মূল করপোরেশনের প্রয়োজন সহ বণ্টন ও সরবরাহ কেন্দ্র এবং

এদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সমুদয় প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার খরিদ এবং চাহিদা মত অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্যদানের দায়িত্ব বর্তাবে এই দপ্তরের উপর। সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানই করপোরেশনের রাজ্যশাখা ব্যতীত অন্যত্র ঋণ কিংবা অন্যভাবে আর্থিক সাহায্য নিতে পারবে না। অন্যত্র ঋণগ্রহণের অধিকার থাকবে একমাত্র করপোরেশনের। বিভাগটি এসবেরই যথাযথ ব্যবস্থা করবে।

পরিসংখ্যান

১। (ক) সমগ্র বণ্টন কেন্দ্র মারফত রাজ্যের সর্বপ্রকার কৃষিজ, বনজ ও শিল্পজাত উৎপাদনের নির্ভুল পরিমাণ এবং এর সর্বাধিক সম্ভাবতার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা।

(খ) প্রতিটি বণ্টন কেন্দ্র মারফত উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীর বর্তমান ও ভবিষ্যতের নির্ভুল ও প্রকৃত প্রয়োজন এবং উদ্বৃত্ত বা ঘাটতির সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা।

(গ) ক ও খ এর যাবতীয় তথ্য পরিকল্পনা দপ্তরে পাঠিয়ে তাদের সহযোগিতায় একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করে দ্রুত এর সার্থক মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়ে যতক্ষণ না যুক্তিযুক্ত সমাপ্তি হচ্ছে ততক্ষণ দায়িত্ব পালন করা।

২। (ক) প্রতিটি বণ্টন কেন্দ্র মারফত রাজ্যের সমগ্র কর্মক্ষম ও কর্মপ্রার্থীর শিক্ষাগত এবং অন্যান্য যোগ্যতা অনুযায়ী নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করে তাকে যোগ্যতা ক্রমিক সংখ্যা বিভক্ত করা। এ-কাজ অত্যন্ত সহজ হবে, কারণ প্রতিটি বণ্টন কেন্দ্রেই তার এক হাজার পরিবারের সমগ্র জ্ঞাতব্য বিষয়ের একটি করে পরিবার পঞ্জী লিপিবদ্ধ করা আবশ্যিক থাকবে এবং এই পরিবার পঞ্জী থেকেই সমগ্র রাজ্যের জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যাবে।

(খ) কর্মক্ষম ও কর্মপ্রার্থীর যোগ্যতা অনুযায়ী সংখ্যা নির্ণয়ের পর প্রতিটি পরিবারের প্রয়োজননির্ভর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রচিত সমগ্র পরিসংখ্যান তথ্যটি পরিকল্পনা ও কর্মপ্রদান দপ্তরে পাঠিয়ে এর সার্থক পরিণতি অবধি মূল দায়িত্ব পালন করা।

এ-ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা অসংগত নয় যে দেশের নিরপেক্ষ এবং চেতনাশীল ব্যক্তি মাত্রই জানেন, বর্তমানে এই পরিসংখ্যান ব্যবস্থা প্রায় কোন ক্ষেত্রেই আদৌ তথ্যনির্ভর নয়। বরং এর প্রায় সবটাই হয় অসম্পূর্ণ বা কাল্পনিক, নয়ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এটাই স্বাভাবিক। ব্যক্তি বা দলীয়তন্ত্রে অবশ্যম্ভাবীও বটে। ক্ষেত্রান্তরে এটা স্থূল বা সূক্ষ্ম যেভাবেই প্রকাশ পাক, আদতে এক্ষেত্রে সত্য গোপন আর দায়িত্ব এড়ানোই থাকে প্রধান লক্ষ্য।

পরিকল্পনা

পরিকল্পনা মূলতঃ দ্বিবিধ। সর্বভারতীয় লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং রাজ্যভিত্তিক রাজ্য পরিকল্পনা। তবে এ দু'য়েরই মৌল উপাদান হবে দেশের সমগ্র বণ্টন ও সরবরাহ কেন্দ্রের প্রয়োজন, সংগতি ও অভিজ্ঞতা। রাষ্ট্রের সংগতি যোগ হবে পরে। মূল পরিকল্পনা হবে কেন্দ্রীয় স্তরে, আর সেই পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে রাজ্যস্তরে যে পরিকল্পনা হবে রাজ্যের প্রয়োজন, সুযোগ ও শক্তিই হবে তার উপাদান। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সহ এই পরিকল্পনার দায়িত্ব যথাযথ বণ্টন, সরবরাহ ও করপোরেশনের উপর ন্যস্ত করে এই দপ্তর তাকে সঠিক রূপদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

প্রচার

(ক) এই দপ্তর করপোরেশনের রাজ্যশাখার নিজ দায়িত্বে রাজ্যের সর্বস্তরের প্রয়োজনীয় সমগ্র পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করে প্রতিটি বণ্টন কেন্দ্রের মাধ্যমে ঠিক ঠিক সময়ে রাজ্যের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছে পৌঁছে দেবে।

(খ) দেশের সর্বপ্রান্তের সকল মানুষের সঙ্গে অন্তরের সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকের প্রতিটি উদ্ভাবন ও চেতনার সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করে করপোরেশনের নিজস্ব সংবাদপত্র কিংবা বুলেটিন মারফত বণ্টন কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে প্রতিটি দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেবে। এবং পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল উদ্ভাবন, অনুভূতির নতুন প্রকাশ

ও গঠনমূলক কাজের জ্ঞাতব্য সংবাদ একই ভাবে দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করবে।

জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা

প্রতিটি বণ্টনকেন্দ্র অঞ্চলে অন্ততঃ একজন যোগ্য ডাক্তারের নেতৃত্বে একটি বহির্বিভাগীয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের দায়িত্ব হবে এই দপ্তরের প্রথম কাজ। আর এরই সঙ্গে পল্লী অঞ্চলে যথা সম্ভব অন্যূন দশটি শয্যাবিশিষ্ট একটি অন্তর্বিভাগীয় কেন্দ্রও গড়ে তুলতে সক্রিয় হবে। বণ্টন কেন্দ্রের কার্যারম্ভের অনধিক দু'বছরের ভিতরই এ-কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। এর জন্য প্রতিটি পরিবার তাঁদের লভ্যাংশ থেকে বছরে ১২ টাকা করে চাঁদা দেবেন এবং অবশিষ্ট ব্যয় বহন করবেন অর্ধাংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। এই কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণ হলে শ্রমিক কর্মচারী বা অন্য কারো নামেই আলাদা কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রয়োজন হবে না। এর জন্য সরকার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অর্থব্যয়েরও কিছুমাত্র আবশ্যক থাকবে না। এ-প্রসঙ্গে অনেকেরই দৃঢ় অভিমত শুনা যায়, 'সরকার এবং সাহায্য প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থা এই বাবদ যে-অর্থ ব্যয় করে থাকেন তার প্রতিটি পয়সাই আসে জনগণের পকেট থেকে। অথচ সন্ধান নিলে দেখা যাবে, এর বেশীর ভাগই প্রকৃত উদ্দেশ্যে ব্যয় না হয়ে অপচয় হয়ে থাকে। এ-ব্যবস্থা অবশিষ্ট দেশবাসীর স্বার্থের পরিপন্থী তো বটেই, পরস্পর বিভেদ সৃষ্টিরও সহায়ক।' সুতরাং সমগ্র দেশবাসীর চিকিৎসা এবং পরিবার পরিকল্পনার সব দায়িত্বই থাকবে করপোরেশনের উপর এবং এ-দায়িত্ব পালিত হবে প্রধানতঃ বণ্টন কেন্দ্র মারফত। বৃহৎ চিকিৎসার ক্ষেত্র হবে হাসপাতাল। শহরের নার্সিং হোমগুলি অনাবশ্যক ঘোষিত না হওয়া অবধি যুক্ত থাকবে এই হাসপাতালের সঙ্গে। কিন্তু এরও পরিচালন দায়িত্ব থাকবে করপোরেশনের হেফাজতে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, স্বাচ্ছন্দ্য, এর সর্বত্রই আজ পল্লী ও শহর আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হচ্ছে

থাকে। এর যুক্তি,—'শহরবাসীর প্রয়োজন স্বতন্ত্র। জল, আলো, বাতাস, পয়ঃপ্রণালী, আবর্জনা এর একটির উপরও শহরবাসীর ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব নেই, কাজেই এ-ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়েছে। এর সঙ্গে পল্লীবাসীর কিছুমাত্র মিল নেই কারণ তারা এসব ক্ষেত্রে স্বকর্তৃত্ব নির্ভর।' কথাগুলো মিথ্যা নয়। কাজেই সংগত কারণেই এর জন্য পৌরসভাগুলি গড়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য এর সঙ্গে যুক্ত আর চিকিৎসার স্বাতন্ত্র এসেছে অন্য কারণে। সে কথা যাক। এবং এই সব পৌরসভা কীভাবে চলে, নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য কতটা রক্ষিত হয় কিংবা সরকারী অনুদান খাতে এর জন্য ওই পল্লীবাসীর কত টাকা অতিরিক্ত কর দিতে হয় সে-প্রশ্নও থাক। কিন্তু এই ব্যবস্থার সঙ্গে যে-নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্ন আছে সেটা কী বাদ দেওয়া সংগত? শহর ও পল্লীবাসীর ভিতর বিভেদের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া এ-ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। একটু সতর্ক হলে এই বিষের ক্রিয়া দেখা যাবে সর্বত্র। যদিও প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজে কোন ব্যবস্থাই এমন হওয়া সংগত নয়, যা থেকে একজন দেশবাসীও এরূপ ধারণার অবকাশ পান যে, তাঁর প্রয়োজনটা অন্যের তুলনায় গুরুত্বহীন করা বা আলাদা ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। শহরই হোক বা পল্লীই হোক, একে সহজভাবে মেনে নেবার শক্তি কারোই প্রায় থাকে না। সুতরাং এমন একটি ব্যবস্থা থাকাই সংগত যেখানে সকল দেশবাসীর স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও স্বাচ্ছন্দ্যের গুরুত্ব যে এক এবং তার জন্য একই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এই ধারণা সকলের ভিতর বদ্ধমূল হতে পারে। এর জন্য পূর্বোক্ত করপোরেশনই হবে একমাত্র যোগ্য সংস্থা যার পক্ষে এ-দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব। এর জনস্বাস্থ্য বিভাগ এই দায়িত্ব গ্রহণ করে তার অধিকাংশ পালন করবে প্রতিটি বণ্টন কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং বৃহৎ কাজগুলি যথা, জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব থাকবে রাজ্যশাখার নিজের উপর। এর আশু একটি ফল হবে শুধু বেতনভুক কর্মী নির্ভরতায় কর প্রদানটাই যেমন মুখ্য হয়ে উঠেছে, কোন নাগরিকের প্রয়োজন আদায়ের প্রক্রিয়ার নেই, বণ্টন কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে নাগরিকরাই প্রত্যেকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেলে

প্রয়োজনটাই তখন মুখ্য হয়ে পড়বে। বাড়ীর ভিতরের জঞ্জাল আর রাস্তার সদর দরজার জঞ্জালে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকবে না এবং সম্ভবত সিকিভাগ কর দিয়েই আজকের বাঞ্ছিত কাজগুলি সকলে পাবেন।

শিক্ষা

এই দপ্তরের প্রথম কাজই হবে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বব্যাপী করে অনধিক দু'বছরের ভিতর এর প্রারম্ভিক পর্ব শেষ করা এবং সর্বাধিক তিন বছরের ভিতর বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করা। পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিটি বণ্টন কেন্দ্রের শিক্ষিত যুবক ও ছাত্রছাত্রীরা এ-বিষয়ে যে যথেষ্ট সজাগ হবেন এবং স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নিরক্ষর বয়স্ক প্রতিবেশীকে অক্ষরজ্ঞানে সাহায্য করবেন এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

এ-দপ্তরের দ্বিতীয় কর্তব্য হবে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষাকে ত্রুটি-মুক্ত করা। সরকারী অর্থ অর্থাৎ, জনগনের ঘাম-ঝরানো করের টাকার একটি আধলাও না অপচয় হয়, প্রতিটি পয়সা সঠিক কাজে ব্যয় হয়ে প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় তারই পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা। এটাও প্রারম্ভিক। এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকবে দেশের সঠিক প্রয়োজনের পরিমাপ করে সেই তথ্য দেশের সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে সরবরাহ করা এবং তদনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সুপারিশ করে এ-কাজে সর্বপ্রকার সাহায্য করা। অর্থাৎ বর্তমান ও নিকট ভবিষ্যতে দেশে মোট কতজন বৈজ্ঞানিক, কতজন সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, কোন শ্রেণীর কতজন শিক্ষক, কোন কোন বিষয়ে কতজন ইঞ্জিনীয়ার, কতজন কৃষি, পশুপালন ও মৎস্যচাষ বিশেষজ্ঞ এবং কোন বিষয়ে কতজন কারিগর আর সাধারণ কেরানী প্রয়োজন তার নির্ভুল হিসেব কষে ভারপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাহায্যে তাদের শিক্ষিত করতে তৎপর হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যোগ্যতার সঠিক পরিমাপ করে শিক্ষার্থী নির্বাচনে সক্রিয় সাহায্য-দানও এ-দপ্তরের অবশ্য কর্তব্য হবে। এই সব ব্যবস্থাই এমন নিখুঁত হওয়া চাই, যেন অনাবশ্যক বা যোগ্যতাহীন শিক্ষায় শক্তির কিছুমাত্র অপচয় না ঘটে।

সংস্কৃতি ও খেলাধুলা

প্রতিটি বণ্টনকেন্দ্র-অধিবাসী বা সমগ্র দেশবাসীকেই সর্বপ্রকার খেলাধূলা ও দেশবিদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন ও আয়ত্ত-আগ্রহী করে তুলতে হবে। পল্লী অঞ্চলে এ-কাজ কিছুটা কঠিন বলেই সেখানে আরও বেশী যত্নের প্রয়োজন। প্রতিটি বণ্টন কেন্দ্রকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে এবং অনধিক তু-বছরের ভিতর এর ব্যাপক পত্তন করে দ্রুত-গতিমুখী করতে হবে। খেলাধূলার গুরুত্বই এক্ষেত্রে সমধিক। আর দেশের সর্বগ্র এই মানসিক প্রস্তুতির পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রথমেই চাই প্রতিটি বণ্টন অঞ্চলে বিশেষ করে পল্লীতে সর্ব প্রকার খেলার উপযোগী মাঠ, প্রতিটি সরবরাহ অঞ্চলে একটি করে মাঝারি আকারের স্টেডিয়াম, প্রত্যেক শহর ও জেলার মধ্যবর্তী কোন উপযুক্ত স্থানে একটি বড় স্টেডিয়াম নির্মাণ এবং সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষা ও বৃত্তির ব্যবস্থা। বণ্টন কেন্দ্রগুলি এ-ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেবে এবং করপোরেশনের এই দপ্তর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় একে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে।

সামাজিক ন্যায়নীতি ও সংহতি

সমগ্র দেশবাসীর ন্যায়নিষ্ঠা, সততা ও সংহতি হোল জাতির একটি মৌল সম্পদ। দেশের সুনাম, সমৃদ্ধি, শান্তি সব বিষয়েই এ-সম্পদ মূলধন। সুতরাং বিভাগটির সদাজাগ্রত দৃষ্টি থাকবে দেশবাসীর ভিতর এই ন্যায়নিষ্ঠা, সততা ও সংহতির পরিবেশ ক্ষুন্ন হওয়ার কিছু মাত্রও সুযোগ না ঘটে। রাজ্যের কোন অংশে এর ব্যত্যয় ঘটলে এবং কোথাও পরস্পর অসদ্ভাব উপস্থিত হলে বণ্টন কিংবা সরবরাহ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভাগটি তার মীমাংসা করবে। এর জন্য সকল বণ্টন ও সরবরাহ কেন্দ্রেই সর্বাধিক উপযুক্ত ও সকলের আস্থাভাজন কয়েক ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি থাকবে। আর এর শেষ লক্ষ্য থাকবে দেশ থেকে সর্বপ্রকার মামলা, মকদ্দমা ও সংঘাতের স্থায়ী অবসান ঘটাতে সকল বিবাদ-মীমাংসা ভার নিজেদেরই গ্রহণ করা। তবে এর সুযোগ বা প্রয়োজন শেষ হবে অন্যভাবে। সে কথা পরে।

এ-প্রসঙ্গে গান্ধীজীর 'পঞ্চায়েত রাজ' পরিকল্পনাকে মনে পড়তে পারে। কিন্তু 'সমগ্র দেশবাসী দেশের সব কিছুর সম অংশীদার' এর বাস্তব কোন মূল্য না থাকায় আজকের অঞ্চল পঞ্চায়েত এদিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, বহু নতুন সমস্যাও সৃষ্টি করেছে। এ ভিন্ন অভিজ্ঞ কারো কারো অভিমত, 'বর্তমান সমাজের বিচার-ব্যবস্থাগুলি হোল শ্রেণী স্বার্থরক্ষাকারী অর্থনীতির দান। কাজেই এতে মানুষের অন্যায় প্রবৃত্তি যত না প্রতিরোধ হয়েছে, এক শ্রেণীর মানুষের ভিতর এই প্রবৃত্তি জাগিয়ে দিতে তার অনেক বেশী সাহায্য করেছে! অর্থ সামর্থে একদল অন্যায় ও বঞ্চনাকারী একেও তাদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার করতে পেরেছে। অধিকন্তু দেশের কোটি কোটি টাকা ব্যয়-অপব্যয় তো আছেই, যার ফলে দুর্গত মানুষের দুঃখের মাত্রা আরও কিছুটা বেড়েছে।' সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যায়, এ-অবস্থার অবসান হলে এই অতিরিক্ত দায়মুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষ কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যের নাগাল পাবে তাই নয়, সমাজদেহ থেকে অবিশ্বাস ও অশান্তিও বহুলাংশে দূর হবে।

পরিকল্পিত করপোরেশনের রূপ ও মূলধন

রূপ ঃ

এই করপোরেশন সৃষ্টি হবে দেশের সর্বপ্রান্তের সর্বশ্রেণীর সমগ্র মানুষের সুনিশ্চিত সক্রিয় সহযোগিতায় এবং সর্বস্তরের সকল দেশবাসীর নিশ্চিত শান্তি, সমৃদ্ধি ও চূড়ান্ত আত্মবিকাশের সুদৃঢ় আর চির-গতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির দ্বিধাহীন আশ্বাস সহ সকল পরিবারের সম-মূলধন ও কর্তৃত্বে।

এই করপোরেশন দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টনের পূর্ণ দায়িত্ব এবং অপরের প্রভাবমুক্ত কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এর প্রতিটি ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ ন্যায়সিদ্ধ পন্থায় চূড়ান্ত উৎকর্ষতায় পরিণত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে।

দেশের সমগ্র আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যকে অপরের প্রভাব

ও কর্তৃত্বমুক্ত করে পৃথিবীর সর্বত্র সমদৃষ্টি ও সমমর্যাদায় চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে।

জল, স্থল ও আকাশ এই তিন স্তরের সর্বপ্রকার পরিবহণ ব্যবস্থার সবটুকু অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে ত্রুটিমুক্ত চূড়ান্ত কল্যাণকর উৎকর্ষতায় ও লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে বাধ্য থাকবে।

ব্যাঙ্ক, বীমা, তেল, গ্যাস, খনি, কৃষি, শিল্প—এক কথায় দেশ ও দেশবাসীর অর্থনৈতিক স্বার্থজড়িত প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি ব্যবস্থাকেই সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃত্বচ্যুত করে এই করপোরেশন তার কর্তৃত্বভুক্ত করবে এবং সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত করে এর প্রতিটি ক্ষেত্রকে সর্বাধিক সাবিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বাহন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হবে।

এই প্রতিষ্ঠান হবে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বয়ংশাসিত। রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দপ্তরের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব এর উপর বর্তাবে না। একমাত্র লোকসভা আর রাজ্যসভাতেই এর কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা হতে পারবে এবং সেখানে সংখ্যাধিক্যের ভোটে ও রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হতে পারবে

এর চেয়ারম্যানের মর্যাদা থাকবে প্রধান মন্ত্রীর ঠিক পরেই। এ হচ্ছে সাময়িক ব্যবস্থা। কারণ পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক সংবিধানের রূপ কী হবে এবং কোন প্রতিষ্ঠান কী সংজ্ঞায় ব্যক্ত হবে ও কার স্থান কোথায় নির্দিষ্ট হবে সেদিনের মানুষই তা স্থির করবেন।

দেশের স্থায়ী বাসিন্দার যেকোন ব্যক্তি (পরিবারের কর্তা) যে-কোন সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার কিনে ও আনুগত্যপত্রে স্বাক্ষর করে এর সদস্য হওয়ার অধিকারী হবেন।

এই প্রতিষ্ঠান পূর্ববর্ণিত বন্টন, সরবরাহ এবং এদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত যেকোন সংস্থার অংশ গ্রহণে বাধ্য থাকবে। তবে এই অংশ কোথাও ৫০ শতাংশের বেশী হবে না। এদের অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন করপোরেশন ঋণ-প্রদানে পূর্ণ করতে বাধ্য থাকবে।

এই সকল প্রতিষ্ঠানে দেয় ঋণ ও শেয়ার মূল্যের যথাযথ ব্যবহার ও নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মী-নিয়োগ অধিকার করপোরেশনের থাকবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ বা উপদেশ দেবার অধিকারও এর থাকবে। কিন্তু এর কোনটিই প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীন সত্তায় হস্তক্ষেপের রূপ নিতে পারবে না। অবশ্য করপোরেশনের গঠনতান্ত্রিক নিয়ম-শৃঙ্খলা সকলকেই মেনে চলতে হবে।

মূলধন

পরিবর্তনযোগ্য অনুমোদিত মূলধন হবে ২০ হাজার কোটি টাকা এবং এই মূলধন বিভক্ত হবে ১০ টাকা মূল্যের দু'হাজার কোটি শেয়ারে। তবে সূচনায় মাত্র দু'হাজার কোটি টাকা বা দুশ' কোটি শেয়ার মূল্য সংগ্রহ করেই কার্যারম্ভ হতে পারবে।

এই দু'হাজার কোটি টাকা মূলধন যোগাবে দেশের ৫০ কোটি অধিবাসী এবং কেন্দ্রীয় ও সম্মিলিত রাজ্য সরকার। এই তিন তরফের অংশ হবে নিম্নরূপ :—

(ক)	দেশের সমগ্র জনগণের	৫০ শতাংশে	১০০০	কোটি	টাকা
(খ)	কেন্দ্রীয় সরকারের	২৫ „	৫০০	„	„
(গ)	জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে সমগ্র রাজ্য সরকারের	২৫ „	৫০০	„	„

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মোট মূলধন ১০০০ কোটি টাকা। এর ভিতর কেন্দ্রের ৫০০ কোটি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসহ রাজ্যগুলির গড়ে ২৫ কোটি হিসেবে মোট ৫০০ কোটি। খুব সহজ যুক্তিতেই ধরা পড়বে এঁদের কারো পক্ষেই এটা অতিরিক্ত দায় হবে না। বরং দায়মুক্ত ও প্রচুর ভার লাঘবই করবে। কারণ বর্তমানে খাদ্যশস্যসহ এ-জাতীয় অন্যান্য দায়-দায়িত্বে এ থেকে অনেক বেশী অর্থ কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারগুলিকে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। এ-দায়িত্ব করপোরেশন গ্রহণ করলে—যেটা হবে এর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য—মূলধনের বিরাট চাপের সঙ্গেই যে-দুঃশ্চিন্তা, সমালোচনা ও লোকসানের বোঝা

চেপেছে তা থেকে কেন্দ্র, রাজ্য উভয়েই মুক্ত হবে। কিন্তু এটা বড় বিষয় নয়। বড় হোল, সমগ্র দেশবাসীর সম অংশ ও স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় দায়িত্বনির্ভর কোন সুগঠিত সংস্থার সঙ্গে কেন্দ্র এবং সকল রাজ্য সরকার সম অংশে যুক্ত হয়ে সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন কাজের দায়িত্ব নিলে অনিবার্য কারণেই সেখানে অপচয়, দুর্নীতি ও হয়রানি বন্ধ হবে, উৎপাদনের গতি দুর্বার হবে, দ্রব্যমূল্য দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতা ও মতামত-নির্ভর স্তরে স্থির থাকবে এবং সমগ্র সরকারী আমলাদের এই দায় থেকে অব্যাহতি দিলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বছরে অন্তত একহাজার কোটি টাকা খরচ কমবে। অবশ্য সরকারী খরচ কমাবার এবং মূলধনের যোগান পাবার আরও রাস্তা আছে। কিন্তু সে-আলোচনা পরে।

পরিকল্পনার অন্তর্গত দেশের প্রাথমিক জনসংখ্যা ধরা হয়েছে ৫০ কোটি। এই ৫০ কোটি অধিবাসীকে যদি কম-বেশী পাঁচজনের একটি পরিবারে ভাগ করা হয় তবে মোট পরিবার হবে ১০ কোটি। এই মোট সংখ্যার প্রতি এক হাজার পরিবার নিয়ে একটি সাধারণ উৎপাদন ও বণ্টন কেন্দ্র গঠিত হলে সারা ভারতে এর সংখ্যা হবে এক লক্ষ। আর প্রতি ২০টি বণ্টন কেন্দ্র নিয়ে একটি সরবরাহ কেন্দ্র হলে এর সংখ্যা হবে ৫ হাজার। এই সমগ্র বণ্টন, সরবরাহ এবং মূল করপোরেশনের প্রথম পর্যায়ের যাবতীয় কাজই ওই দু'হাজার কোটি টাকায় সম্পন্ন হতে পারবে।

যদিও চিরাচরিত ব্যবসাগত হিসেব থেকে এ-ক্ষেত্রে মূলধন অবশ্যই অনেক কম ধরা হয়েছে এবং এর ফলে অনেকের কাছেই এটা এক ধাঁধাঁ মনে হবে। এটা স্বাভাবিক। প্রচলিত অর্থনীতির সঙ্গে এর সঙ্গতি নেই। কিন্তু পূর্বেই বলেছি বর্তমান অর্থনীতিটা মোট জন-সংখ্যার বড়জোর ২০ অংশের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজন থেকে রচিত বলে সন্দেহ, সংশয়, ভীতি নিয়ত একে ঘিরে রাখে। কাজেই পরিকল্পিত ব্যবস্থার সঙ্গে এর সংগতি খোঁজা অর্থহীন। দৃষ্টি স্বচ্ছ ও উদার না হলে এবং পরিবর্তিত সমাজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলতে না পারলে এ-ক্ষেত্রে মূলধনের জোয়ার বইলেও অবস্থার বেশী পরিবর্তন

হবে না। যেমন হচ্ছে না সরকারী প্রকল্পগুলিতে। আসল কথা, উদ্দেশ্যের সার্থক পরিণতি ঘটে তখনই যখন তার সঙ্গে নিষ্ঠা, সততা ও গতির দৃঢ়তা যুক্ত হয়। প্রত্যক্ষ স্বার্থ ও কর্তৃত্ব ভিন্ন এই মানসিক পরিবর্তন আদৌ সম্ভব নয়। শুধু মাইনে করা লোকের পক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখা কঠিন। এসব ক্ষেত্রে সততা, নিষ্ঠা ও গতির চেতনা থেকে পড়ে পাওয়ার চেতনাই প্রায়, বেশী ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আবার কোন উদ্দেশ্যে দেশের সমগ্র মানুষ যুক্ত থেকেও যদি তাদের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব না থাকে তবে মুষ্টিমেয় কর্তৃত্বভোগী ব্যক্তির অলস প্রবৃত্তিটাও নীতিহীন হতে প্রেরণা পায় যেটা আমরা প্রায় নিয়তই দেখছি। সুতরাং যেখানে প্রত্যক্ষ স্বার্থ, দায়িত্ব এবং কর্তৃত্বই মূল ভিত্তি এবং দেশের সকলেই একে-অপরের সহযাত্রী ও সব কিছুর সম অংশীদার, সেখানে মূলধনের প্রয়োজন অবশ্যই হবে যথেষ্ট স্বেচ্ছানির্ভর। বিশেষ করে এ-প্রয়োজন দেশজ পণ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে একেবারেই হবে নগণ্য। সব শেষে মূলধনের অপচয় ও অপব্যয় খাতের অংশটা এখানে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। কাজেই আজকের অর্থনীতির সঙ্গে এর হিসেব মিলিয়ে লাভ নেই।

মূলধনের উৎস

পূর্বেই বলেছি, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির অংশে যে-মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে তা সংগ্রহ হবে প্রধানতঃ খাদ্যশস্যের সংগ্রহ ও বণ্টন দায়িত্ব প্রস্তাবিত এই করপোরেশনের উপর ন্যস্ত করার ফলে। সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে শুধু চাল ও গমের পাইকারী ব্যবসা হাতে নিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল ২২শ' কোটি টাকা। আর আংশিক রেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার মূলধন ধরেছিলেন একশ' কোটি টাকা। এই দুটি তথ্যই প্রমাণ করে ৫৫ কোটি মানুষের খাদ্য এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহে পাঁচ হাজার কোটি টাকা মূলধনও যথেষ্ট নয়।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি এর একটা মোটা অংশ ইতিমধ্যে বিনিয়োগ করেছেনও। অথচ প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় শুধু খাদ্য বা বিশেষ

কয়েকটি বস্তু নয়, সমগ্র দেশবাসীর প্রয়োজনের সব কিছু সরবরাহের জন্যই মূলধন ধরা হয়েছে মাত্র দু'হাজার কোটি টাকা এবং যার অর্ধাংশের দায়িত্ব বর্তাবে ৫৫ কোটি দেশবাসীর উপর। তাছাড়া এই মূলধনে কৃষি, শিল্প, মৎস্যচাষ, পশুপালন প্রভৃতি উৎপাদন-সহ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও স্থিতির অন্যান্য দিকেরও ভিত্তি স্থাপন হবে বলা হয়েছে।

এই বিরাট পার্থক্যের হেতু পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে। এ-পার্থক্যের আরও একটা হেতু হোল সরকারী ব্যবস্থার মত এ-ক্ষেত্রে কোন বস্তুই দীর্ঘদিন গুদামজাত রাখার প্রয়োজন হবে না, উৎপাদকের ঘর থেকে ধীরে ধীরে প্রয়োজন মত সংগ্রহ করে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। উৎপাদকের গুদামও হবে জনগণের গুদাম। মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটার সম্ভাবনাও এ-ক্ষেত্রে থাকবে না। যে-বস্তুর যে-মূল্যই ধার্য হোক, দেশের সকল মানুষের সংগতি ও সম্মতিক্রমে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে একবারই মাত্র সে-মূল্য স্থির হবে এবং সারা বছর সেই নির্দিষ্ট মূল্যেই সে-বস্তু বিক্রি হবে। কারো পক্ষেই এর কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধির এক্তিয়ার থাকবে না। কাজেই কোন সময়ে কোন বস্তু সংগ্রহ এবং কোন সময়ে কি বিক্রি করলে অধিক মুনাফা হবে এই চিন্তাই অনাবশ্যক হয়ে পড়ছে। এ ভিন্ন আর্থিক অনটন না থাকলে (অনটন না থাকার ব্যবস্থা করবে করপোরেশন) উৎপাদক ও ক্রেতা যদি একই প্রতিষ্ঠানের সম অংশীদার হন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার কেন্দ্রীয় ও সমগ্র রাজ্য সরকারও হন তবে সে-ক্ষেত্রে নগদ মূল্যের প্রয়োজনই প্রায় থাকে না। ধারে বিক্রির মানসিক প্রতিক্রিয়া এখানে যুক্তি হারায় না। এ-প্রসঙ্গে অপচয়ের প্রশ্নও আছে। অনা[illegible]শ্যক সঞ্চয়ে ত বটেই, জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত যে-কোন দীর্ঘ সঞ্চয়ে অপচয় [illegible] না কিছু হবেই। আর মাইনে করা কর্মচারীনির্ভর সঞ্চয়ে বা সং[illegible] অপচয়ের হার বৃদ্ধি যে অবশ্যম্ভাবী, ভারতে খাদ্যশস্যের অপচয়ের [illegible]সবই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সত্ত্বেও যে-হারে এ[illegible]য় বাড়ছে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ওই সুযোগ পেলে তা যে কিছুতেই [illegible]

এর বহু প্রমাণ এখানে আছে। এটাই স্বাভাবিক। ক্ষতির ফল নিজস্ব না হলে কোন ক্ষতিই বন্ধ হয় না। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই বন্ধের সুযোগ আরও হ্রাস পায়। অন্তত এ-দেশে মাইনেভুক্ত কর্মচারী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতি কোথাও যুক্তিযুক্ত সীমা অবধিই বন্ধ হয়েছে, এ কারো চোখে পড়েছে বলেন নি।

মূলধন সংগ্রহে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে খাদ্য সংগ্রহ ও তার বণ্টন-দায়িত্ব হস্তান্তরের কথাই শুধু বলা হয়েছে। কিন্তু একটু চেতনাশীল ব্যক্তিমাত্রই বলবেন, 'এই সঙ্গে খাদ্য, কৃষি, পশুপালন, মৎস্য-চাষ এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তরগুলি তুলে দিয়ে এর প্রয়োজনীয় অংশটুকু ওই করপোরেশনের উপর ন্যস্ত হলে সারা দেশে আরও অন্তত এক থেকে দেড় হাজার কোটি টাকা বছরে মূলধন খাতে জমা পড়বে। এ ভিন্ন বি. ডি. ও, অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রভৃতি অফিস ও তার কর্মী এবং খাদ্য পরিদর্শক ও দুর্নীতি দমন বিভাগের পুলিশ বাহিনীর করণীয় কাজগুলিও যেহেতু করপোরেশনের সক্রিয়তার ফলে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে কাজেই এ সব তুলে দিলে এখানেও কয়েক শ' কোটি টাকা সংগ্রহ হবে। যদিও এ প্রসঙ্গে মূলধন বা জাতীয় সম্পদ সঞ্চয়টাই বড় কথা নয়, অনেকে আজ এমন অভিমতও ব্যক্ত করছেন, 'এই সকল দপ্তর ও তার কর্মীবাহিনী অপসারিত হলে দেশে কর্মোদ্দীপনার একটি সুস্থ ও সাবলীল পরিবেশ অতি সহজে এবং অনিবার্য কারণেই গড়ে উঠবে।' ভারতে এমন একটি পরিবেশের প্রয়োজনই আজ সর্বাধিক।

আজ এমন কথাও অনেকে বলছেন, 'স্বাধীনতার পর ভারতের আমলাতান্ত্রিক একাধিপত্য এর অগ্রগতির অন্তরায় হয়েই থেমে থাকেনি, সেই সম্ভাবনাকেই একেবারে ধ্বংসের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। ঘুষ, কাজে ফাঁকি, অপচয়, অবহেলা, চোরা [illegible]বার, ভেজাল, মূল্য-বৃদ্ধি, পরস্পর অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, হিং[illegible] [illegible]হংস্রতা এ সবই এর আংশীক প্রকাশ মাত্র, কিন্তু মূল শি[illegible] প্রসারিত হয়েছে দেশের অখণ্ডতা, এমন কী স্বাধীনতার [illegible]পত্তা অবধি। আর বর্তমান নীতির আমূল পরিবর্তন ব[illegible] [illegible]সমাজ ব্যবস্থার মৌল কোন পরিবর্তন ঘটতে পারে এ-[illegible] আদৌ কোন উদার বিজ্ঞতার স্পর্শ নেই।'

দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কঠোর অনুশাসনের পরিণতি শেষে অনেক কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকর্তা অনুভব করেছেন, 'বুরোক্রেসী শুধু কৃষি, শিল্প বা জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের অন্তরায় হয়েই ক্ষান্ত হয় না, বেশীর ভাগ মানুষের চিন্তা ও চলার গতিকেই শ্লথ করে দেয়।' যদিও এই অতিরূঢ় সত্যকে মেনে নেবার মত মানসিকতা আজও সকলের জাগেনি। কিন্তু ভারতের তথাকথিত 'সঠিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা'র ভিতর থেকেও বুরোক্রেসীর ওই নগ্ন অবশ্যম্ভাবীতাকেই যাঁরা সযত্নে লালন করতে চান তাঁদের সঠিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেশবাসীর সতর্কতার প্রয়োজন আছে। কারণ স্বাধীন ভারতের সাধারণ মানুষ আজও যে তাদের পরাধীন কালের দুর্বিষহ অবস্থা থেকে অব্যাহতি পায়নি, যে-উদ্যম নিয়ে তারা এগোতে চেয়েছিল তার কোন সুযোগই ঘটেনি এবং আজও যে তাদের ধন, প্রাণ, মান সবই প্রায় নিরাপত্তাহীন তার অন্য যত কারণই থাক, বেশীরভাগ মানুষের ধারণা, আমলানির্ভর সমাজ ব্যবস্থাই প্রধান কারণ।' আর একেই পুঁজি করে কোন কোন রাজনৈতিক দল দুঃস্থ জনগণকে প্রায় শেয়াল কুকুরের মত না হোক, অসহায় জীবের মতই তাড়না করে চলেছেন। রাষ্ট্রকে জনগণের সক্রিয় দায়িত্ব বহির্ভূত রেখে কেবল সরকারী আমলা কর্তৃত্বে আবদ্ধ রাখলে এ-অবস্থাই হয় তার অপরিহার্য একমাত্র পরিণতি।

অনেকে বলবেন, 'দেশের অগ্রগতি থেমে ত থাকেনি, এগিয়েই চলেছে এবং তার গতিও বাড়ছে।' তা ঠিক। এগিয়েও চলেছে এবং গতিও বাড়ছে। পৃথিবীর কোন দেশই থেমে থাকেনি আর থাকেও না। কারো গতি দ্রুত, কারো মন্থর। আবার কারো বা সামনের দিকে, কারো পিছনের দিকে। তবে ভারতের স্থান কোথায়? প্রশ্ন এখানেই। কিংবা স্বাধীনতার ২৮ বছর পরেও অন্যের সঙ্গে এর সংগতি কতটুকু? আর [illegible] শেষে, যে-অগ্রগতির কথা ওই 'অনেকে', বিশেষ করে সরকারী কর্তাব্যাক্তি [illegible] বলছেন তার সঙ্গে দেশের কতভাগ মানুষ জড়িত?

সরকারী হিসেবেই ত দেখা যাচ্ছে, [illegible] দেশে আজও ৪০ শতাংশ মানুষ দুর্ভিক্ষের স্তরেই আবদ্ধ রয়েছে। [illegible] প্রায় ৬০ শতাংশ

মানুষ স্বাধীনতাপূর্ব অবস্থার বাইরে যেতে পারেনি।' অর্থাৎ এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, অগ্রগতির ফসলটা কেবল ৪০ ভাগ মানুষের ভিতরই কম-বেশী হারে ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে এবং অবশিষ্ট মানুষকে কিছুই দেওয়া যায়নি। তবে কিছুই যে দেওয়া যায়নি তা বোধহয় ঠিক নয়, দেশের অগ্রগতির জন্য আরও বেশী নিংড়ে রস বের করতে দেওয়া যে পবিত্র কর্তব্য, এই বোধশক্তি তাদের উদার হাতেই দেওয়া হয়েছে।

আদত কথা, কেন এমনটি হোল? দেশের অন্তত ৬০ শতাংশ মানুষ যে বঞ্চিত হয়েছে এটা সরকারী তথ্যের সারাংশ। আর একে সত্য করতে যে অনেক অসত্য বা অপকর্মের প্রশ্রয় ঘটেছে এও নির্ভেজাল সত্য। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতা শেষেও কেন এমন একটি পরিকল্পনা রচনা করে এগনো গেল না, যেখানে সকল দেশবাসী যুক্ত হতে ও শুভফলের অংশীদার হতে পারে? দেশবাসী কিন্তু এমন একটি পরিকল্পনাই চেয়েছিল। চেয়েছিল, সকল মানুষ দ্রুত এগিয়ে যাক, সকলে আধুনিক যুগের উপযুক্ত হয়ে উঠুক এবং সকল শক্তি গর্বিত রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু স্তব্ধ করে দিক। কিন্তু তা হয়নি। হয়নি তার গভীরে হয়ত অন্য কিছু আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখে পড়েছে, পরাধীনতায় তারা যতটা প্রশাসন অচ্ছুৎ ছিল স্বাধীনতায় তা আরও বেড়েছে। পূর্বের তুলনায় আরও বেশী বিশ্বাসবিমুখ, অপাঙক্তেয় ও প্রশাসননির্ভর হয়েছে। সুতরাং এর পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশের সকল মানুষের অগ্রগতির পরিকল্পনা করতে হলে প্রথমেই চাই ওই পূর্বোক্ত দপ্তরগুলির অবলুপ্তি। এখানে যে-অর্থব্যয় রোধ হবে সেটা হবে দেশের অক্ষম পরিবারের অংশের মূলধন। এদের এটা ঋণ দিতে হবে। ঋণ নেবে করপোরেশন এবং করপোরেশনের প্রতিটি বন্টনকেন্দ্র মারফত এই অর্থের সমপরিমাণ মূল্যের শেয়ার অক্ষম পরিবারের নামে বিলি করে জামীন হিসেবে উহা নিজ হেফাজতে রাখ[illegible]।

জনগণের অংশে মোট মূলধন এক হাজা[illegible] [illegible]কাটি টাকা। কিন্তু দেশের সকল পরিবারই অক্ষম নয়, ক[illegible] [illegible] ৪০০ টাকা মাসিক আয় বিশিষ্ট পরিবারকে সক্ষম ধরে, [illegible] পরিবারকে পূর্ব পন্থায় ঋণ দিলে [illegible]শী প্রয়োজন হবে না।
৬ থেকে ৭ শ' কোটি টা[illegible]

ভারতের লক্ষ্য নাকি সমাজতন্ত্র! গত প্রায় দুই দশক এদেশে কংগ্রেস সহ প্রায় সব কটি রাজনৈতিক দল তাঁদের প্রয়োজন মত টীকা টিপ্পনী সহ নিয়ত এ-কথা গণদেবতাদের কর্ণগোচর করাচ্ছেন। যদিও সমাজতন্ত্র অর্থে এঁরা আদতে কী বলতে চান এবং তার সঠিক পথ কী সেটা এঁরাই জানেন। কাজেই সে-আলোচনা থাক। কিন্তু এই ছোট একটি কথা এখানে খুব স্পষ্ট করেই বলার প্রয়োজন আছে যে, দেশবাসীকে যদি সত্যই এ-বস্তু দিতে হয়, অন্তত তাঁদের বেঁচে থাকার মত ন্যূনতম সুযোগটুকু দেওয়া কর্তব্য বলে বিবেচিত হয় তবে দেশের সকল উৎপাদন ও বণ্টন কাজে তাদের সক্রিয় অংশীদার করে নিতেই হবে। আর এর জন্য অক্ষম পরিবারগুলিকে কোন না কোন ভাবে আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাঁদের সহযাত্রী ও সমভাগীদারও করতে হবে। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সমুদয় সম্পদ যে সকলের এবং একে রক্ষা করা ও সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব আর অধিকারও সমভাবে সকলের, এটা তারই প্রথম স্বীকৃতি। যদিও বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এ-ধরনের প্রস্তাব মেনে নেওয়া শক্ত। বিশেষ করে দলতন্ত্রী রাজনীতিকদের কাছে এমন যে কোন সম্ভাবনাই হয়ত আখেরের চেতনাকে পীড়ন করবে যে-চেতনা সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রের সঙ্গে দলতন্ত্রের কোন প্রভেদ করতেই সম্মত নয়। কারণ সম্ভবতঃ এই অস্বীকারের অপরিহার্যতায় যে-প্রশাসন নির্ভরতা অনিবার্য হয়ে পড়ে, সমাজে পরস্পর বিভেদ, ব্যবধান আর অপ্রতিরোধ্য সংঘাতের সৃষ্টি করে, সেটাই এ-তন্ত্রের মৌল সম্পদ। সুতরাং রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য কী এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার ফরমূলা কী সে-তত্ত্ব সন্ধানে সময় অপচয় না করে জনগণকেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে এই প্রতিষ্ঠান গঠনে বাধ্য করতে হবে। এর ফলে চেনাও যাবে সত্যকার গণদরদী কে এবং কারা? এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানে দেশের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পরিবার অবশ্যই তাঁদের শেয়ার নগদ মূল্যে কিনবেন। এ ভিন্ন যাঁরা কর্মী হবেন তাঁদের পরিবারের শেয়ারও নগদ মূল্যেই কিনতে হবে। উপরন্তু এই প্রতিষ্ঠানে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বক্ষেত্রের সকল কর্মী ও অংশীদার হিসাবে তাঁদের নিজস্ব পাঁচখানি শেয়ার নগদ মূল্যে কিনতে হবে। নিজস্ব

শেয়ার হবে সক্রিয় অংশ, অধিকার ও দায়িত্বের রক্ষাকবচ। কর্মীদের ভিতর কেউ একান্ত অক্ষম হলে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের মোট ১৫ খানি শেয়ার মূল্য তাঁর প্রথম তিন মাসের মাইনে থেকে সম কিস্তিতে কেটে নিতে হবে।

কর্মী হিসেবে এই করপোরেশনের শেয়ার এক সময় কর্মে নিযুক্ত দেশের সর্বক্ষেত্রেব সকল কর্মীকেই কিনতে হবে। সরকারী কাজে নিযুক্ত সকল কর্মী, বেসরকারী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের কর্মী, এমন কী প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মীরাও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ সময় মোট শেয়ার মূলধনের অংশ হবে,—দেশের সর্বস্তরের সকল কর্মীর ব্যক্তিগত ২৫ ভাগ, সমগ্র পরিবারের ২৫ ভাগ, কেন্দ্রীয় সরকারের ২৫ ভাগ এবং সকল রাজ্য সরকারের মোট ২৫ ভাগ। এই করপোরেশন গঠিত হওয়ার পর সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পুরোটাই আসবে করপোরেশনের অধীনে। বেসরকারী নতুন কোন প্রতিষ্ঠান আর পত্তন হতে পারবে না, কিন্তু যে-প্রতিষ্ঠানগুলি এঁদের আছে তা অধিগ্রহণের পর আপাতত এর মোট মূলধন কর্তৃত্বের ২৫ শতাংশ ন্যস্ত থাকবে বর্তমান মালিক বা মালিক গোষ্ঠীর উপর এবং ৭৫ অংশ থাকবে এর শ্রমিক-কর্মচারী ও করপোরেশনের অধীনে। করপোরেশন তার অন্যান্য সংস্থার কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট সমপরিমাণ শেয়ারই এই সব প্রতিষ্ঠান কর্মীদের ভিতর বিলি করবে। পরিবারের শেয়ারের অতিরিক্ত কর্মীদের এই শেয়ার হবে তাঁদের কর্মোত্তর কালের আমৃত্যু নিশ্চিত পাথেয়। প্রকৃত পক্ষে এটা হবে পেনসন তথা অবসরকালীন ভাতা, যা সর্বক্ষেত্রের সকল কর্মীরই অবশ্য প্রাপ্য এবং সরকারী-বেসরকারী সকলের জন্যই হবে একমাত্র ও একই সীমায় আবদ্ধ।

সঠিক সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় এবং যেটা ভারতের সংগতির বিচারে অবশ্যই প্রযোজ্য, মূলধনের প্রশ্নটা আদৌ কোন বড় সমস্যা নয়। সমস্যা কেবল উপযুক্ত পরিকল্পনা ও সদিচ্ছা নিয়ে। এই দুটি যুক্তিগ্রাহ্য স্তরে এলেই দেখা যাবে বর্তমান ভারতে মূলধনের এমন এক বৃহৎ ভাণ্ডার রয়েছে যা থেকে এই পরিকল্পনার সবটুকু প্রয়োজনই মিটতে পারে। এ হচ্ছে গোপন পথে অর্জিত সম্পদ। অথবা যার

সঠিক সংজ্ঞা হওয়া উচিত,—রাষ্ট্রশক্তির অক্ষমতার সুযোগে একদল চতুর লুটেরা সমগ্র দেশবাসীকে নিঃস্ব, রিক্ত করে যে-সম্পদ প্রায় প্রকাশ্যেই লুঠ করে নিয়েছে। তবে অতীতের মাশুল গুণতে একে আজ সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের বেড়াজাল মুক্ত করে বাইরে টেনে আনতে হবে। আর এটা সম্ভব হলে এই কলুষ অর্থ, যা সুস্থ সমাজ জীবনকে ব্যাধিগ্রস্ত করে আজ দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত করে ছেড়েছে, সেই অর্থই সুস্থ আর সমৃদ্ধ সমাজের বাহন হয়ে উঠবে। এ-অর্থ কোন বঞ্চিতের অর্জিত নয় বা তাদের নাগালের মধ্যেও নেই যে একটু আত্মত্যাগের সুড়সুড়ি দিলেই সুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসবে। একে বের করতে হলে বর্তমান পরিবেশে ত্যাগ স্বীকার ও দৃঢ়তা দুটোই চাই। পরিবর্তিত সমাজ অবশ্য অন্য হদিসও দিতে পারবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, দেশের প্রতিটি পরিবারই একটি বণ্টন কেন্দ্র, একটি সরবরাহ কেন্দ্র এবং মূল করপোরেশনের জন্য শেয়ার কিনে এর সঙ্গে যুক্ত হবেন। এঁদের এই শেয়ারের সংখ্যা হবে নিম্নরূপ—

(ক) বণ্টন কেন্দ্রের জন্য	১০	টাকার	৪ খানি	শেয়ার
(খ) সরবরাহ কেন্দ্রের জন্য	১০	”	৪ ”	”
(গ) করপোরেশনের জন্য	১০	”	২ ”	”

এই মোট ১০ খানি বা একশ’ টাকার শেয়ার সকল পরিবারকেই কিনতে হবে। মূলধন বাড়াবার সময় এলে তখনও প্রত্যেক পরিবারকে প্রয়োজন মত সম সংখ্যক শেয়ারই কিনতে হবে এবং সেই সঙ্গে কর্মী শেয়ারও আনুপাতিক হারে বাড়বে। কম-বেশী শেয়ার কারো থাকবে না। আর এ সময়ও অক্ষম পরিবার ও অক্ষম কর্মীর জন্য পূর্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিবার ও কর্মী কর্তৃক ক্রীত শেয়ারের সম পরিমাণ শেয়ার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি কিনবেন।

প্রাথমিক মূলধন ধরা হয়েছে দু’ হাজার কোটি টাকা। এটা কার্যারম্ভের মূলধন। অতিরিক্ত প্রয়োজন হলে ঋণ করতে হবে। সমগ্র রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রতিটি দেশবাসীও একত্রে যেখানে একই প্রয়োজনে ঋণপ্রার্থী সেখানে ঋণ পাওয়া কিছুমাত্র শক্ত নয়। আর ব্যাঙ্ক, ইন্‌সুরেন্স এ-ঋণ দিতেও বাধ্য। যদিও একথা

নিশ্চিত করেই বলা চলে যে, মাত্র দেড় থেকে দু'বছরের লভ্যাংশ থেকেই মূলধনের দু' হাজার কোটি টাকা উঠে আসবে এবং এ-টাকাই পরবর্ত্তী মূলধনে পরিণত হতে পারবে।

যেমন এক লক্ষ বণ্টন কেন্দ্রের প্রতিটি কেন্দ্র থেকে প্রতি মাসে পরিবার প্রতি যদি একশ' টাকার পণ্যও খরিদ করেন—(পাঁচ জনের একটি পরিবারে খাদ্য, বস্ত্র, জ্বালানি, ওষুধ প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিরই মোট মূল্য এর বেশী হবে আর নিজের সক্রিয় অংশ ও কর্তৃত্বের সঙ্গে নিশ্চিত ন্যায্য মূল্য থাকলে প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় বস্তু শুধু এখান থেকেই কিনবেন সন্দেহ নেই)—তবে প্রতিটি কেন্দ্রে মোট গড় বিক্রি হবে এক লক্ষ টাকা এবং এক লক্ষ কেন্দ্রে এক বছরে মোট বিক্রি হবে ১২ হাজার কোটি টাকা। এখানে শতকরা ৮ টাকা মুনাফা রাখলে—(বর্তমানে এ হার ১০ থেকে ৩০ কি আরও বেশী) —মোট মুনাফা হবে বছরে ৯৬০ কোটি টাকা। আর এর অর্ধাংশ পরিচালনা ব্যয়, যথা গড়ে ১০ জন হিসেবে এক লক্ষ কেন্দ্রে ১০ লক্ষ কর্মীর প্রাথমিক মাসিক মাইনে ২০০ টাকা হিসেবে বছরে ২৪০ কোটি টাকা এবং আয়কর, ঘর ভাড়া, মূলধনের সুদ আর ক্ষয়-ক্ষতিও ওই সম পরিমাণ, অর্থাৎ ২৪০ কোটি এই সর্ব মোট ৪৮০ কোটি টাকা বাদ দিলে প্রকৃত লাভ থাকবে ৪৮০ কোটি টাকা।

এর পর আসে সরবরাহ কেন্দ্রের কথা। বণ্টন কেন্দ্রের চাহিদা মত ৫ হাজার সরবরাহ কেন্দ্রের প্রতিটি মাসে ২০ লক্ষ টাকার পণ্য সরবরাহ করবে। এ ক্ষেত্রে মাত্র ৫ শতাংশ মুনাফা রাখলে প্রতিটি কেন্দ্রে মাসে মুনাফা হবে এক লক্ষ টাকা এবং ৫ হাজার কেন্দ্রে বছরে হবে ৬০০ কোটি টাকা। কিন্তু এখানে আনুপাতিক খরচ কম। কারণ সংগ্রহ, সঞ্চয়, সরবরাহ, পরিবহণ প্রভৃতি কাজে মোট কর্মী আপাতত ৫০ জন হলে এবং এঁদের মাইনেও ওই ২০০ টাকা ধরলে প্রতিটি কেন্দ্রে মাইনে বাবদ খরচ হবে বছরে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আর ৫ হাজার কেন্দ্রের ২ লক্ষ ৫০ হাজার কর্মীর জন্য ৬০ কোটি টাকা। এ ভিন্ন অফিস, গুদাম, পরিবহণ, মূলধনের সুদ, আয়কর, ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতি মোট খরচ কেন্দ্র প্রতি বছরে ৩ লক্ষ হিসাবে ৫ হাজার কেন্দ্রে

বছরে ১৫০ কোটি ধরে মোট খরচ হবে ২১০ কোটি টাকা এবং নিট লাভ থাকবে ৩৯০ কোটি টাকা। এ ভিন্ন আমদানি, রপ্তানি, পরিবহণ, নির্মাণ প্রভৃতি কাজগুলির প্রধান অংশ মূল করপোরেশনের উপর ন্যস্ত থাকলেও এর অংশ বিশেষ সরবরাহ কেন্দ্রের উপরও বর্তাবে। যেমন রপ্তানি ক্ষেত্রে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রধান অংশ করপোরেশনের রপ্তানি বিভাগ সংগ্রহ করলেও কৃষি পণ্যের বেশীটাই সংগ্রহ করতে হবে সরবরাহ কেন্দ্রের মাধ্যমে। আবার পরিবহণ, নির্মাণ প্রভৃতি কাজের কিছু অংশও পাবে সরবরাহ কেন্দ্র, কাজেই এইসব ক্ষেত্রের সর্বনিম্ন মুনাফা ধরলেও সরবরাহ কেন্দ্রগুলির মোট মুনাফা অন্ততঃ ৪০০ কোটি টাকা হবে এতে সন্দেহ নেই।

অবশ্য একটি প্রশ্ন এখানে দেখা দেবে,—বণ্টন ও সরবরাহ সম্বন্ধে যে-মূল্য সংখ্যা ও পরিমাণের কথা বলা হচ্ছে সেটা শহর অঞ্চলে সম্ভব হলেও পল্লীর ক্ষেত্রে সম্ভব কিনা? প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত এবং প্রথম দিকে ব্যক্ত এই সংখ্যা ও পরিমাণ কিছু বেশী মনে হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু হিসেবটা গড় হিসেব। পল্লীতে যেমন কম হবে, শহরে হবে অনেক বেশী। এ ভিন্ন পল্লী অঞ্চলে সরবরাহ ও বণ্টন কেন্দ্রের সঙ্গে যে-সব কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইউনিট যুক্ত থাকবে এবং তা থেকে যে-মুনাফা হবে তাও এর সঙ্গে ধরে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং হিসেবটা অযৌক্তিক নয়।

এর পর আসছে করপোরেশনের কথা। সম্ভবতঃ করপোরেশনের নিজ দায়িত্বন্যস্ত কাজগুলি থেকেই আসবে সর্বাধিক মুনাফা। যদিও মুনাফাটাই এক্ষেত্রে বড় নয়, এর বড়ত্বের বিচার হবে দেশের দুর্গতি ও দুর্নীতি অবসানে। হবে অপরের কাছে হাত পাতা থেকে মুক্তিদানে। শিল্পপতি-ব্যবসায়ী ও আমলাকুলের কিছু অংশ দেশব্যাপী যে-সূক্ষ্ম একটি আঁতাত গড়ে তুলেছেন এবং যে-আঁতাত কোন কোন পেশাদার রাজনীতিকের প্রতিদান প্রতিশ্রুত সমর্থনে পুষ্ট হয়ে দেশের ন্যায়নীতি আর অগ্রগতির টুঁটি চেপে ধরেই ক্ষান্ত হয় নি, জাতির কর্মশক্তি ও কর্মপ্রেরণাকেও প্রায় পঙ্গু করে এনেছে, এর আসল অবদান থাকবে তারই প্রতিবিধানে।

দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের সবটুকুই থাকবে করপোরেশনের দায়িত্বে। অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং ততোধিক সতর্ক সংগঠন ভিন্ন এ-কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। আর প্রতি স্তরে ন্যায়-নিষ্ঠা, সমদর্শীতা ও জাতীয়তাবোধ সক্রিয় না থাকলে দেশের স্বার্থও রক্ষা পায় না। এ-সত্য কারো অজানা নয়। প্রতিরক্ষার কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ এখনই প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা। আর এর প্রায় সবটাই হয় বে-সরকারী স্তরে। ইদানিং এর কিছু অংশ অবশ্য সরকারী কর্তৃত্বে এসেছে। তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত এবং সংবাদপত্রের সংবাদ থেকে জানা যায়, আমলাতন্ত্রের কৃপায় সেখানেও নাকি বে-সরকারী সব ক্রিয়াকাণ্ডই অব্যাহত রয়েছে। বৈদেশীক বাণিজ্যে ভারতের গতি যে মন্থর ছিল এবং সাধারণ সুযোগগুলিও গ্রহণ করতে পারেনি তার প্রধান একটি কারণ : এতকাল যারা এখানে প্রায় সর্বেসর্বার ভূমিকায় ছিলেন তাঁরা শুধু ধূর্ত ব্যবসায়ীই নয়, রাজনীতিতেও বেশ উঁচুদরের ওস্তাদ। কাজেই বিশেষ কয়েকটি দেশের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণে সীমিত ক্ষেত্রে সুযোগ আবদ্ধ রাখা এবং আত্মসর্বস্ব কোন কোন আমলার সঙ্গে একটি মধুব সম্পর্ক গড়ে তোলা যে অবশ্যম্ভাবী হবে এতে আশ্চর্যের কী? তবে ভারতবাসীকে এর জন্য অত্যন্ত মোটা অঙ্কের মূল্য দিতে হয়েছে এবং আজও তা হচ্ছে। বৈদেশীক বাণিজ্যে ভারত যে প্রতি বছর প্রায় ৩০০ কোটি টাকার মত দুর্লভ বিদেশী মুদ্রা হারাচ্ছে এ-তথ্য কেবল সন্ধানী ব্যক্তিদের নয়, এখন সরকারী সমর্থনও কিছু মিলছে। সম্প্রতি কয়েকটি সংবাদপত্রেই খবরটি বেরিয়েছে,—চালানে ওজন আর মূল্যের হেরফের ঘটিয়ে এঁরা এই কাজটি করে থাকেন। ঘটনাটি যে শুধু মাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের চেষ্টাতেই ঘটেনি—অন্তত স্বাধীনতার পরেও,—পিছনে শক্তিশালী কোন অদৃশ্য হস্তও আছে—অন্য কোন দেশ হলে এটা বোধগম্য হতে সরকার কেন সাধারণ মানুষেরই দেরী হোত না। আর, সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও অর্থাৎ, কেবল আমলানির্ভর লেনদেন হলেই যদি এ-ধরনের কারসাজি বন্ধ হোত এবং এদের সকলের নীতিজ্ঞান দেশবাসীর স্বার্থ ঘিরে

থাকতো তবে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে যে সব 'কারচুপির' খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে বেরিয়েছে তা আদৌ সম্ভব হোত না। এ দেশের সরকারী বহির্বাণিজ্য সংস্থা আর সরকারের জাহাজ পরিবহণের নামই কি এর সঙ্গে জড়াতো? আসলে শ্রেণী প্রভাবিত সমাজে—সেখানে তন্ত্র যাই থাক—অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ বের করতে পারলে তার সঙ্গে বেসরকারী ব্যবসায়ী, সরকারী কিছু আমলা এবং ভারপ্রাপ্ত কোন কোন কর্তা ব্যক্তির ভিতর এক হরিহরাত্মা সম্বন্ধ বোধহয় কিছুতেই রোধ করা যায় না। এক্ষেত্রে আকংশি দৃঢ়তা বা অসম্পূর্ণ পরিবর্তনে কিছু হয়না। দৃঢ়তা চাই সবটাই পরিবর্তনে। এটা সম্ভব হলে অর্থাৎ বিদেশী বাণিজ্যের সবটাই ওই সব বাস্তু ঘুঘু ব্যবসায়ীদের এবং আমলাতন্ত্রের কবলমুক্ত হলে শুধু যে ফাঁকি বন্ধের প্রায় ৩০০ কোটি টাকাই বছরে বাঁচবে তা নয়, এই বাণিজ্যের পরিমাণ ও পরিধিও বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়বে। স্বাধীনতার জন্মলগ্নেই এদিক থেকে সতর্ক হলে গত ২৮ বছরে কেবল এই ফাঁকি বন্ধের খাতেই বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ দাঁড়াতো প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। যে-সঞ্চয়ের ঘর আজ শূন্য না হলেও প্রায় ফাঁকা।

বৈদেশীক বাণিজ্য ছাড়াও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বছরে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার পণ্য রাজ্যান্তরে যায় বহু হাত ঘুরে। খাদ্যশস্যসহ প্রায় সব পণ্যই আদান-প্রদান হয় একাধিক ফড়ে বা ব্যবসায়ী মারফত। আর এঁরা যে কে কী ধরনের ব্যবসায়ী এবং কে কতটা ন্যায়পরায়ণ এ-দেশের অনেকেই তা জানেন। এঁরা আরও জানেন, একমাত্র ভগবানের করুণা ভিন্ন এঁদের প্রলোভনের হাত থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। সুতরাং আন্ত ও বহির্বাণিজ্যের সবটুকু অধিকার করপোরেশনের উপর বর্তালে—এ অধিকার অবশ্যই অর্জন করতে হবে —এবং এই বাণিজ্যের উপর গড়ে মাত্র ৬ শতাংশ মুনাফা রাখলে— বর্তমানে এ হার ১০ থেকে ২৫ শতাংশ, এমন কি ৫০-১০০ শতাংশও হয়ে থাকে—মোট মুনাফা হবে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। এর উপর পরিবহণ, নির্মাণ, প্রচার প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকেও প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আছে ব্যাঙ্ক, বীমা ও শিল্পের মুনাফা। কিন্তু প্রথম

দিকে ওই দু' হাজার কোটি মুনাফা এবং তার অর্ধাংশ পরিচালনা ব্যয় ধরলেও প্রকৃত ও বণ্টনযোগ্য মুনাফা থাকবে এক হাজার কোটি টাকা।

সূচনার এই সম্ভাব্য হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, খরচ খাতে বণ্টন কেন্দ্রের মুনাফা ৪৮০ কোটি, সরবরাহ কেন্দ্রের ৪০০ কোটি এবং মূল করপোরেশনের ১০০০ কোটি এই মোট ১৮৮০ কোটি টাকা আয় বাড়ছে দেশের ১০ কোটি পরিবার এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির। এর ভিতর ৯৪০ কোটি পাবেন কেন্দ্রীয় ও সমগ্র রাজ্য সরকার। আর ৯৪০ কোটি মোট ১০ কোটি পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ। সুতরাং পূর্বে যে বলেছি, মাত্র দু'বছরের লভ্যাংশ থেকেই লগ্নিকৃত দু'হাজার কোটি টাকা মূলধন উশুল হবে এই হিসেবই তার সত্যতা প্রমাণ করছে। ঋণগ্রহণকারীরা এই সময়ে ঋণমুক্ত হয়ে তাঁদের জামিন রাখা শেয়ারগুলি ফেরত পাবেন এবং তৃতীয় বছর থেকে এটা প্রত্যেকের অতিরিক্ত আয় হতে থাকবে। যদিও এ-ব্যবস্থার সূচনাটা এখানেই শেষ নয়। বর্তমান ব্যবস্থাকে যে-সর্বগ্রাসী ন্যায়হীনতা প্রায় উদরস্ত করে ফেলেছে এবং যার অনিবার্যতায় প্রতিটি ক্ষেত্রে হয়রানি, শ্রম অপচয় ও জীবনযাত্রা ব্যয় বেড়েছে কয়েকগুণ, সেটা এখনই অন্তত ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ হ্রাস পাবে। অন্যদিকে যে-ঘাটতি বাজেটের ধাক্কায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির প্রায় নাভিশ্বাস অবস্থা চলেছে তারও চির অবসান ঘটবে। অর্থাৎ একদিকের ভেজাল ও কালোবাজার বন্ধের সঙ্গে দ্রব্যমূল্য হ্রাস, অন্যদিকে অপচয় আর অপব্যয়ের সঙ্গে কর ও বিদেশী মুদ্রা ফাঁকি বন্ধ হলেই দেখা যাবে, প্রায় ৮০ ভাগ পরিবার এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির আয় বেড়েছে বছরে অন্তত ৩ থেকে ৪ হাজার কোটি টাকা। এই টাকা সঠিক পরিকল্পনায় যথাযাথ বিনিয়োগ হলে মাত্র পাঁচ বছরেই এ-দেশের সকল কর্মক্ষম মানুষের যুক্তিযুক্ত কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠবে। বস্তুতঃ অপচয়, অপব্যয় ও ফাঁকি যে এ-দেশে আজ কতটা ও কতদূর বিস্তৃত সে-তথ্য এখনও বের হয়নি আর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ভিন্ন তা সম্ভবও নয়, কিন্তু এ-পরিবর্তন যদি সম্ভব হয় তবে দেখা যাবে, যতটা সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে আসল পরিমাণ তার বহুগুণই বেশী।

কর্মক্ষেত্রের উৎস

পরিকল্পিত করপোরেশনের উৎপত্তি, কর্মনীতি ও তার সম্ভাব্য প্রাথমিক ফলের যৌক্তিকতা থেকে একটি বিষয় হয়ত কিছুটা স্পষ্ট হতে পেরেছে যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও শ্রেণী যে কারণে বা যে অবলম্বনে সমাজের উপর অতিরিক্ত কর্তৃত্ব করতে পারছেন এবং অধিকাংশ দেশবাসীকে বঞ্চিত ও দলিত করে অধিক সম্পদ ভোগের সুযোগ করে নিয়েছেন, একটি সার্বিক ও সর্বজনগ্রাহ্য পরিকল্পনার সাহায্যে তার অবসান ঘটাতে পারলে অর্থাৎ, সমাজের সকল মানুষের কর্তৃত্বে প্রতিকার ব্যবস্থা গড়ে উঠলে কেবল ওই প্রতিকারটাই অনিবার্য হবে তাই নয়, প্রতিটি মানুষের ভিতর ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যমও অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে। আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক কামনা তার প্রতিবন্ধক প্রতিরোধে আইনগ্রাহ্য শক্তি পেয়ে সফল পরিণতির দিকে পা বাড়ালে সেখানে এই পরিণতি হবে অনিবার্য। এই অনিবার্যতা নিত্য নতুন সফলতার সন্ধানে সার্বিক চেতনাকে সক্রিয়ও রাখবে। আর এরই অবশ্যম্ভাবীতায় দেখা দেবে ন্যায়সিক্ত কর্মক্ষেত্রের প্রাচুর্য এবং ন্যায়নিষ্ঠ কর্মশক্তি প্রয়োগের ঐকান্তিক বাসনা। অন্যায়ের পথ রুদ্ধ থাকলে এবং রুদ্ধ করতে সকল মানুষকে সক্রিয় দেখলে কারো পক্ষেই ন্যায়ের পথ ভিন্ন গতি থাকে না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, অপর কারো কর্মফল ভোগের সুযোগ না পেলে নিজের কর্মশক্তি প্রয়োগের চেতনাই কেবল সক্রিয় হয় এবং তার সফল পরিণতির পথ খুঁজতে থাকে। অপরের কর্মফল ভোগের সুযোগ বন্ধ করাই হচ্ছে একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের প্রথম কাজ এবং যে-কাজে সফল হতে ওই করপোরেশন থাকবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

উৎপাদন ও বণ্টন, প্রধানতঃ এই দুটি অবলম্বন যেমন শক্তি ও সম্পদের মূল উৎস, তেমনি এর উপর শ্রেণীবিশেষের অতিরিক্ত কর্তৃত্ব থেকেই বাকী প্রায় সমগ্র মানুষ হয়েছে বঞ্চিত, শোষিত ও লাঞ্ছিত। রাষ্ট্র যেখানে 'সর্বসাধারণের রাষ্ট্র' বিশেষণে ভূষিত সেখানেও অবস্থার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি।

সার্বিক মানুষের কর্তৃত্বনির্ভর অর্থনীতিতে আর্থিক সংগতির যোগান

যেমন সম্ভাব্য পরিণতি, কোন শক্তিও এখানে অপচয় হতে পারে না। বর্ধিত আর্থিক সংগতির মানসিকতা প্রভুত্বের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে এ-ক্ষেত্রে কেবল কর্মশক্তি প্রয়োগের দিকেই ধাবিত হতে বাধ্য হয়। এটা ওই পরিবর্তিত পরিবেশের পরিণতি এবং যার ফলে প্রত্যেকের সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বেড়ে যায় ও নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে থাকে। ভারতে ১০ কোটি পরিবারের এই সঞ্চয়-প্রবৃত্তি ও কর্মপ্রেরণাই হবে শ্রেষ্ঠ মূলধন।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখতে পেয়েছি বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ভারতের ১০ কোটি পরিবারের বাৎসরিক অতিরিক্ত আয় বাড়ছে ৯৪০ কোটি টাকা। দ্রব্যমূল্য হ্রাস এবং অন্যান্য অপচয় রুদ্ধঘটিত আয়ের পরিমাণ হবে আরও বেশী। এর জন্য ঋণ কিংবা নগদে তাঁদের মোট বিনিয়োগ করতে হয়েছে এক হাজার কোটি টাকা এবং সে-টাকা তাঁদের এক থেকে দেড় বছরের লভ্যাংশ থেকেই উশুল হয়ে যাচ্ছে। অতএব অন্তত তৃতীয় বছর থেকে লভ্যাংশের ওই ৯৪০ কোটি টাকা যদি তাঁরা নতুন মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করেন তবে তাঁদের পূর্বেকার আয়ে হাত পড়বে না, কিন্তু সঞ্চয় ও আয়ের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রও নিয়ত বেড়ে চলবে।

কোন ন্যায়নিষ্ঠ সমাজে জাতীয় মূলধন বিনিয়োগের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গেই ক্রমবর্ধমান জনশক্তি বা কর্মশক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগক্ষেত্র সৃষ্টি করা। বিশেষ করে যেখানে জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যধিক এবং বৈষয়িক দিক থেকে অনগ্রসর সেখানে এর ব্যতিক্রম ঘটলে সে-জাতির পিছিয়ে পড়া এবং অসুস্থ শক্তির প্রাদুর্ভাব রোধ প্রায় অসম্ভব। যদিও এরূপ ক্ষেত্রে শ্রেণী-বিশেষের প্রভাব ও তাদের সম্পদ সংগতি অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আর কেতাবী তত্ত্বে যাই থাক, আজকের সমগ্র সমাজ এই শ্রেণী-বিশেষের প্রভাব বৃদ্ধির এক সুপরিকল্পিত ধূর্ত মুন্শীয়ানা থেকেই যে রচিত এ-সত্য অস্বীকার করার মত কোন তথ্য নেই। শুধু তত্ত্বই এর অবলম্বন, তথ্য নয়। কিন্তু দ্রুত বা মন্থর গতি যাই হোক একদিন যে এর জন্য অশ্রুমূল্য কিছু দিতেই হবে এতে সন্দেহ নেই।

কর্মশক্তির অপচয় কেবল 'ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি' বলে একটা বিজ্ঞভাব আমাদের অনেকেরই রয়েছে। এর সঙ্গে 'বুর্জোয়া' 'প্রতিক্রিয়া' প্রভৃতি কত বিশেষণই না যুক্ত হয়ে থাকে। এই অর্থনীতির প্রধান অপরাধ 'এ বহুর কর্মক্ষেত্র সঙ্কোচন করে তাই নয়, কোথাও বৈষয়িক অগ্রগতি ঘটলেও আসলে তা থেকে কেবল শ্রেণীবিশেষই লাভবান হয়ে থাকে।' যারই হোক এ-ধারণা আদৌ মিথ্যা নয়। যদিও তথাকথিত প্রগতিশীল বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মানুষের কর্মশক্তি 'অপচয় হয় না' বলার মত তথ্য আছে কিনা এবং অপচয় হলে কী ভাবে ও কতটা হয় সে-সম্বন্ধেও একটা ধারণা থাকা দরকার। কারণ তত্ত্ব ও তথ্যের ভিতর এখানেও কিছু ফারাক আছে এবং তা নিয়ে তর্কও নেহাত কম নেই। কাজেই এ-সম্বন্ধে একটি সঠিক ধারণার সহজ উপায় হোল স্থানীয় প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী দপ্তর এবং সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলির কাজের পরিমাপ করা। এ-ক্ষেত্রে ভারতে অতিরিক্ত সুবিধে আছে, পরাধীন-স্বাধীন এই দুই কালের এবং বেসরকারী ও পরে রাষ্ট্রায়ত্ব এই দুটি অবস্থার চরিত্রই স্পষ্ট দেখা যাবে। অর্থাৎ বিতর্কিত দুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের শ্রমশক্তি কী ভাবে কতটা কাজে লাগে আর কোথায় কতটা তার অপচয় হয় অন্তত ভারতে তার সঠিক একটি চিত্র পাওয়া কঠিন নয়। এ-প্রসংগের আদত বিষয়ও এইটি। কারণ মানুষের অব্যবহার্য অলস কর্মশক্তি সুস্থ সমাজ ও সমৃদ্ধির সব থেকে বড় শত্রু। যে-ভাবেই হোক কর্মহীন মানুষের নৈতিক অধোগতি কিছু ঘটেই। আর যেখানে যত বেশী কর্মহীন ও বেকার মানুষ সেখানেই তত বেশী অসুস্থতা। পরিবেশের প্রভাবে সময়ের ব্যবধান কিছু ঘটলেও একদিন এ-অসুস্থতা সমগ্র সমাজকেই ধ্বংসের দিকে টেনে নেয়। সুতরাং আপাতত বছরে যে ৯৪০ কোটি টাকা অতিরিক্ত মূলধনের সন্ধান পাওয়া গেছে তাকে এমনভাবে বিনিয়োগ করতে হবে, যেন কর্মক্ষেত্রের সর্বাধিক সম্প্রসারণ ঘটে এবং সমগ্র দেশবাসীর বৈষয়িক সংগতি সুদৃঢ় ও গতিশীল হওয়ার শক্তি পায়।

কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং অন্যান্য কুটির ও

ক্ষুদ্রশিল্পের দ্রুত প্রসারই হোল সার্বিক মানুষের জন্য কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির কার্যকর উপায়। কিছুকাল এখানে সব পরিকল্পনারই মূল লক্ষ্য হতে হবে অধিকতর কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা। আর পূর্বেই বলেছি, ভারতকে এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হলে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অপরিহার্য হবে যার ফলে বেশ কিছু কর্মে নিযুক্ত মানুষ, হয়তো কয়েক লক্ষ, তাঁদের বর্তমান কাজ থেকে অপসারিত হবেন। দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য এর প্রয়োজন আছে ঠিক, কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের বিকল্প কাজের ব্যবস্থাও দেশের মঙ্গলের তাগিদেই করতে হবে এবং তাও করতে হবে যথাসম্ভব অভ্যস্ত কাজে। এঁদের বেশীর ভাগই কেরাণীশ্রেণীর এবং বাকী সব অন্যান্য। প্রস্তাবিত করপোরেশন তার বিভিন্ন দপ্তরে এর কিছু সংখ্যক নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কিছুই অবশিষ্ট থাকবেন। কাজেই এঁদের জন্য এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন, যার ফলে কর্মচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সেই বিকল্প কাজে নিযুক্ত হতে পারেন। এক্ষেত্রে জীবন বীমা করপোরেশন ও স্টেট ব্যাঙ্ক অবশ্যই বড় ভূমিকা নিতে পারবে। যেমন পরিকল্পিত করপোরেশন সৃষ্টি হওয়ার পরই এর বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে যে প্রায় ২০ লক্ষ কর্মী নিযুক্ত হবেন এবং যাঁদের প্রারম্ভিক বেতন ধরা হয়েছে মাসিক ২০০ টাকা, তাঁরা কাজে যোগ দেবার ৬ থেকে ৮ মাসের ভিতর প্রত্যেকেই অন্তত পাঁচহাজার টাকার বীমা পলিসি নিয়ে তাঁদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ যাত্রা শুরু করতে বাধ্য থাকবেন। নিয়োগপত্রের এ একটি শর্ত। এখানে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার বীমা পত্র বিক্রি হবে। এটা প্রাথমিক সম্ভাবনার অন্তর্গত। এই কর্মকাণ্ডে সঠিক পরিবর্তনের সূচনা হবে যাত্রারম্ভের বছর পাঁচেক পরেই। এই সময় পূর্বোক্ত করপোরেশনের কর্মধারার প্রভাবে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন, নির্মাণ প্রভৃতি কাজগুলি অর্থাৎ, সম্পদ সৃষ্টি ও তা বণ্টনের পূর্ণ কর্তৃত্ব দেশের সমগ্র মানুষের উপর সম অংশে ন্যস্ত হওয়ায় কর্মক্ষেত্রের এরূপ বিস্তার ঘটবে এবং সকলের আর্থিক সংগতি এমন একটি স্তরে উন্নীত হবে, যার ফলে কর্মক্ষম কোন স্ত্রী-পুরুষ একটি দিনের জন্যেও যেমন বেকার থাকবেন না, তেমনি প্রতিটি পরিবার গড়ে

অন্তত পাঁচ হাজার টাকার বীমা গ্রহণে সক্ষম ও ইচ্ছুক হবেন। এ সময় মোট বীমার পরিমাণ দাঁড়াবে কম করেও ৫০ হাজার কোটি টাকা আর এর জন্য প্রিমিয়াম পাওয়া যাবে বছরে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। সম্ভবত ৮ থেকে ১০ বছরেই এই সংখ্যা হবে দেড়গুণ এবং প্রতিদিনই এ সংখ্যা একটু করে বাড়তে থাকবে। অবশ্য শ্রেণী-স্বার্থ জড়িত ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এই উৎপাদনহীন ব্যবসা প্রস্তাবিত সমাজের স্বাস্থ্যের অনুকূল হবে কিনা তার মীমাংসা করবেন আগামী দিনের মানুষ। এ ভিন্ন আমরা আজ যে-সমাজে বাস করছি সেখানে দাঁড়িয়ে এই সমগ্র বক্তব্যকেই এক 'অর্বাচীন কল্পনা' বললে কিছুমাত্র দোষ হবে না। তবে এও দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি, প্রচলিত অর্থনীতিটা যদি সামান্য একটু ঘুরিয়ে দেওয়া যায় এবং ভারতের প্রকৃত জাতীয় আয়ের সঙ্গে সমগ্র কর্মক্ষম মানুষের কর্মশক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগজাত আয় যুক্ত হয়ে সকল পরিবারের ভিতর ন্যায্য অংশে বিভক্ত হয় তবে সেখানে কোন মানুষই একে 'অর্বাচীন কল্পনা' বলবেন না, বরং যাঁরা এই অনিবার্যতাকে এতকাল ঠেকিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন এবং যাঁরা এতে সায়ও দিয়েছেন তাঁদেরই সম্বন্ধে এঁরা আরও কঠিন কিছু বলবেন।

এই বীমাপত্র বিক্রির ক্ষেত্রেও সঠিক গণস্বার্থকর ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। এতে দেশবাসীর অর্থসংগতি ও ন্যায়বোধ আরও সুদৃঢ় হবে। অর্থাৎ আজকের এজেন্ট ও উন্নয়ন অফিসারদেব স্থলে প্রতিটি বণ্টন কেন্দ্রকে এজেন্সি দিয়ে এই কেন্দ্রাধীন পরিবারগুলির বীমাপত্র সংগ্রহ করলে প্রাপ্য কমিশন বীমাকারী পরিবারগুলিই পাবেন। বণ্টন কেন্দ্র এজেন্সি নেবে বীমাকারীদের প্রতিনিধি হিসেবে। এজেন্সি কমিশনের বর্তমান হার অনুযায়ী কোন ব্যক্তি ২০ বছর মেয়াদে ৫ হাজার টাকার বীমা করে বছরে ২০০ টাকা চাঁদা দিলে তাঁর মোট কমিশন আয় হবে ২৭০ টাকা। কিন্তু এর চেয়েও বড় বিষয় হোল, এই ব্যবসা উন্নয়নে একদল অফিসারের খানাপিনা ও ভ্রমণ খাতে যে-বিপুল অর্থ আজ ব্যয় হচ্ছে প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তা সম্পূর্ণ বন্ধ হবে এবং কাগজ ও ছাপাখানার ব্যয়ও অন্তত ৫০ ভাগ হ্রাস পাবে যেটা বীমাকারীর

বাড়তি বোনাস হিসেবে প্রাপ্য হলে বীমা করার আগ্রহ বহুলাংশে বেড়ে যাবে। প্রাপ্ত কমিশনের টাকা পরিবারের কর্তা তথা মূল সদস্যের নামে আলাদা ভাবে জমা থাকবে এবং তাঁর বিশেষ প্রয়োজনে ব্যয় হবে। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে এ-টাকা বীমাকারীর নামেও জমা হতে পারে। তবে পরিবারের কর্তার গুরুত্ব স্বীকারের শুভফল হবে যৌথ পরিবারের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি। মানুষের ভিতর শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে এবং মানুষকে সর্বাধিক ন্যায়ধর্মী ও কর্তব্যনিষ্ঠ করতে যথা সংগত যৌথ পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

এই বীমা ব্যবসা সংক্রান্ত আরও কিছু বক্তব্য আছে। দেশে নিত্য নতুন সমস্যা ও আর্থিক অনিশ্চিয়তা হেতু প্রায় ৭০টি পরিবারই এক অসহনীয় অবস্থায় রয়েছেন। আর এঁদের কাছে যে-সব বীমাপত্র বিক্রি হয় তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশই অসময়ে অচল হয়ে পড়ে। এতে এঁদের আর্থিক ক্ষতিও হয় প্রচুর। যদিও অনেকে বলে থাকেন, 'নানা স্বার্থে বেশ কিছু অচলযোগ্য বীমাপত্র বিক্রি হয় বলেই ওই সংখ্যাটা বেড়েছে।' এ ভিন্ন সারেণ্ডার করা বীমা থেকেও বীমাকারী ক্ষতিগ্রস্ত হন। আইন মোতাবেক কর্তৃপক্ষের অবশ্য ত্রুটি নেই। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষের এ-জাতীয় ক্ষতির পথ উন্মুক্ত থাকা কোন যুক্তিতেই শোভন নয়। সংগতও নয়। বণ্টনকেন্দ্র মারফত বীমা-পত্র বিক্রি হলে এ-জাতীয় ক্ষতি সহজেই বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ এখানে প্রতিটি পরিবারের বংশপঞ্জী এমন ভাবে তৈরী থাকবে এবং বণ্টন কেন্দ্রগুলির ওই এজেন্সি শাখা এমন ভাবে দৃষ্টি রাখবে, যেন আর্থিক বা শারীরিক অযোগ্য কোন ব্যক্তিই বীমা করার সুযোগ না পান এবং কারো অসময়ে বীমা বন্ধের প্রয়োজন না ঘটে।

প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজে এগিয়ে চলার গতি কখনই শ্লথ হতে পারে না। মূলধনের অভাব হয়না এবং মন্দার স্থানও এখানে থাকে না। মানুষের আকাঙ্খা ও স্বাধীন সত্তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ নিবিড় সহযোগীতা বন্ধনে আবদ্ধ। কাজেই এর গতিও হবে দুর্বার ও সীমাহীন। আর এ-গতি এক সময় অবশ্যম্ভাবী রূপেই প্রতিফলিত হবে সমগ্র প্রশাসন

যন্ত্রে—যেখানে জাতীয় সম্পদ সর্বাধিক অপচয় হয় বা হওয়ার পথ নিয়ত উন্মুক্ত হতে থাকে।

এমন একটি সমাজ অবশ্য পৃথিবীর কোথাও পত্তন হয়নি। প্রচলিত যে কোন সমাজেই বরং এরূপ কোন চেষ্টা শুধু বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাই নয়, সমগ্র শাসনব্যবস্থাই হয়ত ভেঙ্গে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। সুনির্দিষ্ট কোন বিকল্প ব্যবস্থার হদিস না পেলে সাধারণ মানুষই এ-ক্ষেত্রে বেশী দ্বিধাগ্রস্ত হন। এ-মানসিকতা কায়েমী ব্যবস্থার পুঁজি এবং এ দ্বারা শাসনযন্ত্রের উপর সব কিছু অর্পণ করার যুক্তি পোক্ত করে শাসক শ্রেণী তাঁদের স্থায়িত্ব কায়েম করার সুযোগ পান। অর্থাৎ জনগণের কাছে বর্তমান ব্যবস্থা অসহনীয় হলেও সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর বিকল্পের অভাবে যে-দ্বিধা জাগে তাকে তুলে ধরে প্রশাসনের কর্তৃত্ব হ্রাস করার সকল যুক্তিই এঁরা নস্যাৎ করে দেন। কাজেই এখানে চাই পূর্বকথিত দৃঢ়তা এবং চাই জনগণের ঐকান্তিক অগ্রণী ভূমিকা।

একটা কথা সম্ভবত খুব স্পষ্ট করেই বলার আছে,—সমাজকে কিছু মাত্র ন্যায়ের পথে এগোতে হলে এবং সেখানে সকল মানুষের জন্য স্থায়ী একটিও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করতে হলে বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার একটি করে অঙ্গছেদ করে গণশক্তি দ্বারা সে-স্থান পূর্ণ করতেই হবে। আজকের শাসনযন্ত্রে এই বাড়তি অঙ্গের সংখ্যা প্রায় ৯০ ভাগ এবং এই ৯০ ভাগ অঙ্গই যেদিন গণশক্তি দ্বারা পূর্ণ হবে একমাত্র সেদিনই মনে করার সময় আসবে সমাজতন্ত্রের পত্তন কার্যটা সফল হয়েছে। যদিও এই ছেদ ও সংযোজন দুটোই খুব শক্ত কাজ। কিন্তু এটাই একমাত্র পথ। কাজেই জনগণকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে তাঁদেরই, যাঁরা কর্তৃত্ব-মোহকে পরাস্ত করেছেন শুধু নয়, মানুষের উপর মানুষের ঘৃণ্য কর্তৃত্বকে অপরাধজ্ঞানই যাঁদের ধর্ম। এঁদের সন্ধান হবে পরে। কিন্তু যাঁরা অন্যের কর্তৃত্ব নস্যাৎ করতে চাইলেও সরকারী আমলা কর্তৃত্বের কিছুমাত্র বিকল্প প্রস্তাবেই আতকে ওঠেন এবং তর্ক তোলেন, 'অন্যত্র হচ্ছে কাজেই এখানেই বা হবেনা কেন?'—তাঁরা যে খুব সতর্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েও যেসব বাড়তি অঙ্গের কথা বলতে চেয়েছি তার মাত্র কয়েকটির

ক্রিয়াকাণ্ড তুলে ধরলে হয়ত অন্যের কাছে এ-বক্তব্যের সারবত্তা কিছুটাও স্পষ্ট হবে।

যেমন এদেশে কৃষিঋণ, কৃষিযন্ত্র, সার, বীজ, সেচের জল প্রভৃতি বণ্টনের জন্য দেশ জুড়ে প্রচুর অফিস, অফিসার, এজেন্ট, ডিলার এবং আরও কত কি আছে। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, উপদেষ্টা আর তাঁদের ছোট-বড় আমলারাও আছেন। কিন্তু এত সব থেকেও যে অধিকাংশ কৃষক সময়মত ও প্রয়োজনমত বস্তুগুলি পাচ্ছেন না প্রতিটি কৃষক ত কেবল সে-কথাটাই বলছেন। অথচ এর বিকল্পও ছিল এবং যত অর্থ এ বাবদ ব্যয় হচ্ছে তার হয়ত সিকিভাগ অর্থব্যয়েই কৃষকদের চাহিদা মিটতো। যেমন প্রস্তাবিত করপোরেশন যদি এ-দায়িত্ব নেয় এবং কৃষি অঞ্চলের বণ্টন কেন্দ্র মারফত কোথায় কখন কী বস্তু কতটা প্রয়োজন তার নির্ভুল তথ্য সংশ্লিষ্ট কৃষকদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে দেশের সংগতি অনুযায়ী ওখান থেকেই বণ্টন করে তবে প্রতিটি কৃষক তার প্রয়োজন ক্ষণেই দরকারী বস্তুগুলি পাবেন আর এর জন্য ওই সকল অফিস, অফিসার, এজেন্ট, ডিলার, মন্ত্রী আর আমলা পোষার দায় থেকে দেশবাসী সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। কৃষক নিজেও এই সব কেন্দ্রের সক্রিয় সদস্য তাই অপচয় বা অসহযোগীতার সম্ভাবনাই থাকবে না।

ঠিক এমনিই আছে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প বিভাগ, আছে মৎস্য চাষ, পশুপালন, গৃহ নির্মাণ ও বাণিজ্য বিভাগ, আছে লাইসেন্স, পারমিট, খাদ্য সংগ্রহ, বণ্টন, পরিবহন, বি. ডি. ও, জমির খাজনা ও বিভিন্ন কর আদায় প্রভৃতি আরও বহু বিভাগ। এর প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বই এই করপোরেশন গ্রহণ করতে পারে। দেশের মঙ্গলের জন্য এর প্রয়োজনও আছে। আর আজকের বিকল্প সন্ধানটা আরও কিছুটা তীব্র হয়ে সঠিক পথ ধরলে এও দেখা যাবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে এই সকল বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয়, এই প্রয়োজন স্বীকার করাটাই এ-সমাজে কিছুটা হীন-মন্যতার পরিচয়। বহুকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য না থাকলে এতে সায় দেওয়াই যায় না। কারণ এ-জাতীয় সব কাজই হতে পারে জনগণের

সক্রিয় সহযোগীতায় করপোরেশনের বিভিন্ন শাখা, বিশেষ করে বণ্টন কেন্দ্রের মাধ্যমে। যেমন ভূমিকর, পৌরকর, আয়কর প্রভৃতি সর্বপ্রকার করের জন্য সরকারী অর্থ দপ্তর প্রত্যেকের দেয় করের একটি অঞ্চল ভিত্তিক ফর্দ করে প্রতিটি বণ্টন কেন্দ্রে পাঠাবে এবং বণ্টনকেন্দ্র ঠিক সময়ে তা আদায় করে অর্থ দপ্তরে পাঠিয়ে দেবে। দাবীর সবটুকু সময় মত আদায় করার অবশ্য দায়িত্ব থাকবে এই বণ্টন কেন্দ্রের। এতে কাজ সহজ হবে, সকল দেশবাসীর ন্যায়বোধ সজাগ থাকবে এবং প্রভূত আর্থিক অপচয় থেকে দেশের সকল মানুষ মুক্তি পাবে। উপরন্তু ভূমি রাজস্ব প্রদান প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রেই যে-হয়রানি ও অতিরিক্ত দক্ষিণা-দান প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে তা থেকেও সকলে অব্যাহতি পাবে। আর সব শেষে এবং এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল, রাষ্ট্রের অধিকাংশ দায়িত্বভার দেশের সর্বপ্রান্তের সকল শ্রেণী মানুষের উপর বর্তালে তাদের ন্যায়নিষ্ঠা, সততা ও কর্তব্যবোধ অনিবার্য কারণেই সাবলীল হয়ে চূড়ান্ত সমৃদ্ধির স্তরে পৌঁছিবার দৃঢ়তায় উন্নীত হবে। রাষ্ট্রের সকল ভাল-মন্দের দায় যে সম অংশে সমগ্র দেশবাসীর, দায়িত্ববহনের অধিকারই তার যৌক্তিকতা স্মরণ করাবে।

এর পর স্বভাবতই এই প্রশ্ন হবে, 'এত কর্মী অনাবশ্যক হলে সেখানে কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হবে কীভাবে?' যদিও এর উত্তর পূর্বেই মিলেছে এবং সেখানে দেখতে পেয়েছি, যে-সম্পদ আজ মুষ্টিমেয় অফিস, অফিসার ও কর্মচারীদের শ্রীবৃদ্ধিতে নিঃশেষ হচ্ছে এবং যার পত্তন প্রধানত সামন্ততন্ত্রে হলেও পরবর্তী তন্ত্রগুলিতেও সীমিত হয়নি, বরং নিয়তই বেড়েছে ও বাড়ছে, সেই সম্পদ মূলধন করে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োগ করলে কর্মচ্যুত ব্যক্তিদের সঙ্গে সমগ্র কর্মপ্রার্থীরই স্থান সঙ্কুলান হবে। সীমাহীন এক বিরাট সম্ভাবনাময় কর্মক্ষেত্র রয়েছে ওখানে।

একটি হিসেবে প্রকাশ, 'পৃথিবীর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ নাকি ৬৬০ কোটি হেক্টর—আর এর ভিতর চাষ হচ্ছে মাত্র ১৫০ কোটি হেক্টর। এক হেক্টর জমিতে যত্ন নিলে কম করেও তিন টন খাদ্য

উৎপন্ন হতে পারে এবং পৃথিবীর সমগ্র চাষযোগ্য জমি যত্ন নিয়ে চাষ করলে এক হাজার কোটি মানুষ ও আনুপাতিক গৃহপালিত পশুর খাদ্য হয়েও উদ্বৃত্ত থাকে।'

হিসেবটায় কতটা সত্য আছে কিংবা এ-তত্ত্ব কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যে সমর্থিত কিনা সে-তথ্য অবশ্য সংবাদে নেই। কিন্তু একে যদি সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় (একেবারে যে মিথ্যা নয় তার কিছু তথ্য ত আছেই, আর তীব্র খাদ্যাভাবগ্রস্ত ভারতের কৃষিভূমির পরিমাণ ও উৎপাদনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেললে সেটা আরও একটু স্পষ্ট হবে) তবে আজ যেখানে পৃথিবীর ১/৩ অংশ মানুষ কৃষি কাজে নিযুক্ত থেকে (এশিয়ায় এ সংখ্যা অনেক বেশী) মাত্র ১৫০ কোটি হেক্টর জমি চাষ করছেন সেখানে বাকী ৫১০ কোটি হেক্টর জমি চাষ করতে আরও অন্তত ৩৫০ কোটি মানুষের প্রয়োজন হবে। সুতরাং আজকের বেকার নয়, আরও বহু দিনের বেকার মানুষের কাজ একমাত্র কৃষিভূমিতেই রয়েছে। ওই তথ্য থেকে আর একটি বিষয়ও স্পষ্ট হচ্ছে যে, পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ যে চিরকালই খাদ্যাভাবে পীড়িত তার মূলে অক্ষমতা যত না আছে তার অনেক বেশী আছে হয়ত এক অমানবীয় ধূর্ত চেতনা। কারণ উৎপাদন সংগতির সঙ্গে অভাবটা মানুষের বুদ্ধির মাপকাঠিতে একেবারেই সংগতিহীন।

কর্মক্ষেত্রের সন্ধান করতে যেয়ে একমাত্র কৃষিভূমিতেই পাওয়া গেছে ৩৫০ কোটি মানুষের কাজের সুযোগ। এ ভিন্ন এই কৃষির জন্য যে-শিল্পের প্রয়োজন এবং কৃষিজাত দ্রব্য থেকে যে-শিল্প সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে আরও বহু কোটি মানুষের কর্ম সংস্থান হতে পারে। এর পর আছে বিভিন্ন প্রকার খনিজ শিল্প এবং আরও কত কী? সুতরাং এ-ধারণা আদৌ অমূলক নয় যে, মানুষ বেকার হয়েছে বা হবে কর্মক্ষেত্রের অভাবে নয়, বরং এর মূলে রয়েছে ইচ্ছারই অভাব। কারণ মানুষের শক্তি নেই অথবা এই সন্ধান তারা জানে না এ-কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইচ্ছাটাই অন্তরায়। আর এ ইচ্ছা বন্ধক রয়েছে শ্রেণীস্বার্থের সিন্দুকে। প্রকৃতির অকৃপণ দান এবং অগণিত মানুষের অদম্য আগ্রহ ও অমিত শক্তিকে অনুকূল অবস্থায় পেয়েও

যে কাজে লাগানো যায়নি তার মূলে শ্রেণীস্বার্থ ভিন্ন অন্য কিছু থাকা সম্ভবই নয়।

কৃষি ও শিল্প, এ দুটোই আজ অবধি মানুষের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। জীবিকার তাগিদে আগামী দিনের মানুষেরও প্রধান ভরসা এই। যদিও নিষ্ঠা ও শ্রম ভিন্ন এ-ভরসার মূল্য খুব সামান্যই। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। আনুপাতিক সুযোগ এখানেও আছে। ১০টা ৫টার কেরানী মেজাজ এখানেও খুব বেশী মূল্যবান নয়। তবে মানুষ কিছুটা অভ্যাসের দাস। অভ্যাস একদিনে গড়ে ওঠে না, তাই পরিবর্তনেও সময় লাগে। আর বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তনে যে-বিপুল সংখ্যক কর্মীর কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে তাঁদের অভ্যাসটাও গড়ে উঠেছে আর একদল মানুষের স্বার্থরক্ষারই প্রয়োজনে। সর্বোপরি এঁরাও দেশের মানুষ। সুতরাং ন্যায়ধর্মে এঁদের যথাসাধ্য অভ্যস্ত কাজে ফিরিয়ে নেওয়া দেশের অবশ্য কর্তব্য। পরিবর্তিত সমাজে এ-সম্ভাবনা কতটা বাস্তব হবে আর একটু স্পষ্ট না হলে সংশয় দূর হবে না।

পূর্বে বলা হয়েছে, পরিকল্পিত সমাজ ব্যবস্থায় ৫ থেকে ৭ বছরে এ দেশে জীবন বীমা হবে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার। এর যুক্তিযুক্ততাও প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই আজ যেখানে সাকল্যে এর ১/১৫ অংশ বীমার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ৬০ হাজার কর্মী আছেন, সেদিন এ তুলনায় কর্মী প্রয়োজন হবে প্রায় ৯ লক্ষ। তবে এ হোল বর্তমান শ্রমদানের আনুপাতিক হিসেব। সমাজতন্ত্রে অবশ্যই এর গতি বাড়বে এবং আজকের তুলনায় ২/৩ অংশ কর্মীই যথেষ্ট বিবেচিত হবে। অর্থাৎ সেদিনের হিসেবে কর্মী প্রয়োজন হবে ৬ লক্ষ এবং এর ভিতর নতুন কর্মী হবেন ৫ লক্ষ ৪০ হাজার। আবার এই বীমার মতই কর্মক্ষেত্রের বিস্তার ঘটবে স্টেট ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে। একটি ন্যায়নিষ্ঠ বা সমাজতান্ত্রিক সমাজে অন্য সব লেনদেন ত বটেই, একগাদা কেন একাধিক ব্যাঙ্কও অর্থহীন। সমাজের স্বাস্থ্যহানিকরও বটে। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে-সমাজের কথা বলা হচ্ছে সেখানে আগামী ৫/৬ বছরের ভিতর প্রতিটি বণ্টনকেন্দ্রের

সঙ্গে একটি করে ব্যাঙ্ক শাখা রাখার প্রয়োজন ঘটবে। এ ক্ষেত্রে নতুন কর্মী প্রয়োজন হবে প্রায় ২ লক্ষ।

অবশ্য শুধু কেরানীপদ সৃষ্টি করে সার্বিক সমাজের কোন কল্যাণই হয় না, বরং তার উল্টোটাই হয়। যা হয়ে চলেছে সভ্যতা কাল থেকেই। ব্যক্তিতন্ত্র, দলতন্ত্র বা অন্য অর্থে ব্যক্ত সব তন্ত্রের তন্ত্রীদেরই আত্মরক্ষার এ এক তাত্ত্বিক কৌশল। কাজেই সমাজকে জনগণের সমাজ করতে হলে শুরুতেই অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার উদ্দেশ্যে চারটি মৌল কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যথা :—

(১) যে এক লক্ষ বণ্টনকেন্দ্রের কথা বলা হয়েছে তার প্রতিটি কেন্দ্রে একজন উপযুক্ত অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার এবং একজন সহকারীকে অন্তত ৫০ হাজার টাকা মূলধন ও সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দিয়ে স্থানীয় প্রয়োজন ও সুযোগের ভিত্তিতে শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী করা। এঁরা অনধিক এক বছরের ভিতর এক বা একাধিক শিল্প স্থাপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবেন। প্রথম বছর এঁরা নাম মাত্র (মাসিক ৩০০ ও ২০০ টাকা) পারিশ্রমিক নেবেন। কিন্তু শিল্প সৃষ্টি হলে নিজের যোগ্যতা ও সৃষ্ট শিল্পের সংগতি অনুযায়ীই এঁদের প্রাপ্য ধার্য হবে।

(২) কৃষি অঞ্চলের প্রতিটি বণ্টনকেন্দ্রের অধীন সমগ্র কৃষি-ভূমির জন্য একজন কৃষি বিশেষজ্ঞকে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে স্থানীয় কৃষকদের সহযোগীতায় সর্বাধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।

(৩) সুযোগ আছে এমন প্রতিটি বণ্টনকেন্দ্রে একজন পশু-বিশেষজ্ঞকে যুক্তিযুক্ত মূলধন ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার পশুপালনের ব্যবস্থা করা।

(৪) সম্ভাব্য মৎস্যচাষযোগ্য অঞ্চলের বণ্টন কেন্দ্রগুলিতে একজন মৎস্যচাষ বিশেষজ্ঞকে প্রয়োজনীয় মূলধন ও সাহায্য দিয়ে সর্বাধিক মৎস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।

এঁরাও সকলে ইঞ্জিনীয়ারদের মত প্রথমে মাসিক ৩০০ টাকা এবং পরে কৃতকার্যতা ও যোগ্যতার বিচারে মূল্য পাওয়ার অধিকারী হবেন। বস্তুত কৃষি, শিল্প, পশুপালন, মৎস্যচাষ এই চারটি ক্ষেত্রে যে

প্রায় তিন লক্ষ বিশেষজ্ঞ ও প্রায় একলক্ষ সহকারী নিযুক্ত হবেন তাঁদের দ্বারা এবং এরই সঙ্গে অপরিহার্যভাবে যে নির্মাণ ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠে সারা দেশব্যাপী কর্মযজ্ঞের পত্তন হবে সেখানেই দেশের সমগ্র কর্মক্ষম ব্যক্তির উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ এই পরিকল্পনাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে যেন অধিকাংশ কর্মক্ষম ব্যক্তি চিরকাল ওখানেই তাঁদের যোগ্য কাজ পান। এর স্থায়ী ও সুদূর প্রসারী শুভ পরিণতি হবে, শুধু জীবিকার সন্ধানে কোন মানুষকেই যাযাবরের মত ছুটতে হবে না, কিংবা 'এক অঞ্চলের মানুষ যেয়ে আর এক অঞ্চলের কর্মক্ষেত্র অধিকার করছে ও স্থানীয় মানুষদের বেকার বানাচ্ছে' এ অনুযোগের কোন সুযোগ থাকবে না। দেশের সকল মানুষ তাঁর গৃহকোণেই যুক্তিযুক্ত জীবিকার সন্ধান পাবেন। যে প্রশ্নে আজ দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা এক ধ্বংসকর পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং সুযোগ সন্ধানী কোন কোন বিদেশীর সংগে অপরিণামদর্শী কিছু ফন্দিবাজ স্বদেশী হাত মিলিয়ে এই আঞ্চলিক স্বার্থের অক্ষম মানসিকতাকেই তাঁদের সহজ সাফল্যের হাতিয়ার করতে চাইছেন তা চিরদিনের মতই স্তব্ধ হয়ে যাবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, দেশের অর্থ নৈতিক বিলি ব্যবস্থাভার শিল্পপতি, ব্যবসায়ী বা সরকারী আমলাদের করতলগত না থেকে দেশের সর্ব শ্রেণীর সকল মানুষের কর্তৃত্বে এলে মাত্র ছ মাসের ভিতরই এ দেশে অন্তত ২০ লক্ষ মানুষের নিশ্চিত-স্থায়ী ও মর্যাদাসম্পন্ন কর্ম সংস্থান হবে। আর এর ভিতর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হবে একলক্ষ শিক্ষিত ডাক্তার, একলক্ষ ইনজিনীয়ার, প্রায় ৭৫ হাজার কৃষি বিশেষজ্ঞ, ৭৫ হাজার পশুপালন বিশেষজ্ঞ, এবং প্রায় ৪০ হাজার মৎস্যচাষ বিশেষজ্ঞকে একটি সর্বাঙ্গীণ সুস্থ সমাজ পত্তনের দায়িত্বে নিযুক্ত করা। অবশিষ্ট কর্মীরা আসবেন এই সমাজ গড়ার কাজকেই সাহায্য করতে। কিন্তু দুই থেকে তিন বছরের ভিতর আরও প্রায় এক লক্ষ ডাক্তার এবং এক থেকে দেড় লক্ষ ইনজীনীয়ার সহ মোট কর্মী প্রয়োজন হবে কম করেও ৫০ লক্ষ। এ এক অবিশ্বাস্য আশ্চর্য কর্ম-যজ্ঞের অভ্যুদয়। কর্মের এখানে শেষ নেই, কাজেই কর্মী চাহিদাও

সীমাহীন। সার্বিক মানুষের কর্তৃত্ব নির্ভর সমাজে এটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কোন প্রতিকুলতাই একে স্তব্ধ বা মন্থর করতে পারে না।

আসলে আমরা বাস করছিই কিছুটা ন্যায়হীন আত্মসর্বস্ব ও কেবল আশ্বাস নির্ভর এক অবিবেচক সমাজে। অন্তত ৭০ ভাগ মানুষ একে অত্যন্ত তিক্তজ্ঞানে নিয়ত ধিককার দিয়েও কেবলই অসহায়তার গ্লানি ভোগ করছে। 'প্রগতি', 'সংহতি', সমদর্শীতা' সব তুর্যনিনাদ সত্ত্বেও তারা দেখছে, কলকারখানার শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জন্য গড়ে উঠছে বড় বড় হাসপাতাল, সহজ চিকিৎসার জন্য থাকছে ডাক্তার, ওষুধ। কিন্তু হতভাগ্য দিনমজুর, কৃষিশ্রমিক প্রভৃতি শ্রমিক সংজ্ঞায় ব্যক্ত ব্যক্তিরাও মরছে বিনা চিকিৎসায়। শহরবাসীর জন্য আছে আধুনিক হাসপাতাল, ধনীদের জন্য নার্সিং হোম, অথচ ৮০ ভাগ পল্লীবাসীর জন্য জোটেনা একজন ডাক্তার, এক ফোঁটা ওষুধ। আর এ ব্যবধান শুধু একটি ক্ষেত্রে নয়, সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রেই যে ব্যাপ্ত অসত্য ভাষণে সিদ্ধ না হলে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত করপোরেশন হবে একটি স্বয়ং শাসিত ও স্বয়ং সম্পুর্ণ সংস্থা। এর প্রতিটি বণ্টন কেন্দ্রও হবে যথাসাধ্য স্বয়ং সম্পুর্ণ। যা এখানে উৎপন্ন হবে না তার ক্রয় মূল্য নিজের বাড়তি উৎপন্ন পণ্য মূল্যের অবশ্যই সমান হতে হবে। এর জন্য কৃষি, শিল্প, পশুপালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি যে কোন উদ্যোগের যে কোন চাহিদা মেটাতেই করপোরেশন বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ প্রতি এক হাজার পরিবারের প্রতিটি ইউনিট স্বাধীনভাবে তাদের স্বচ্ছল জীবনের গতি বাড়াবার তাগিদ মতই সুযোগ পাবেন এবং যাদের গতি যত বাড়বে তাঁরা তত দ্রুত এগোবেন। যেহেতু শুধুমাত্র আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যেই কোন সমাজ সুস্থ হয় না; সুস্থতা আসে ওই স্বাচ্ছন্দ্য সার্বিক হলে, কাজেই পরিকল্পিত ব্যবস্থার সার্থকতা এখানেই যে, কাউকে শোষণ বা বঞ্চনা করার সুযোগ করপোরেশন দেবে না। পরস্পর বিশ্বাস, সদ্ভাব ও সাহচর্য হবে এরই পরিণতি।

সুস্থ সমাজের আর এক লক্ষণ সুন্দর স্বাস্থ্যের মানুষ। সুতরাং যে এক লক্ষ শিক্ষিত ডাক্তারের কথা বলা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকে একজন

শিক্ষিত কমপাউণ্ডার নিয়ে প্রতিটি বণ্টনকেন্দ্রে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের পত্তন করবেন। পরিবার পরিকল্পনা ও বীমাকারীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ; এ দুটিও এর সঙ্গে যুক্ত থাকায় ডাক্তারদের যুক্তিযুক্ত শ্রম-মূল্য পাওয়া সহজ হবে। এটা সূচনা। কিন্তু সূচনা না হলে শেষের চিন্তা নিরর্থক। এর দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে পল্লী অঞ্চলের প্রতিটি বণ্টন কেন্দ্রের সঙ্গে দশটি শয্যা-বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল।

এই কর্মক্ষেত্র ও কর্মী নিয়োগ প্রসংগের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে এবং সংগত কারণেই যার একটিকেও অবজ্ঞা করা চলে না। বরং বলা যায়, একে মৌল ভিত্তি না করে কোন অবস্থাতেই কোন সমাজ তার সকল অধিবাসীর স্থায়ী কল্যাণ করতে পারে না। অথচ দেখা যাবে, একে মৌল ভিত্তি করতে গেলে অনেকের কাছেই তা হবে অত্যন্ত অপ্রীতিকর এবং বহুজন হবেন তীব্র প্রতিবাদমুখর। কিন্তু যা সত্য, যা যুক্তিযুক্ত এবং যা অবশ্যম্ভাবী তাকে এড়িয়ে যাওয়াও সংগত নয়। এই দিক দুটির একটি হোলো পুরুষের কর্মশক্তি ক্ষুদ্র পরিসর অফিস ও অফিস ফাইল থেকে মুক্ত করে সেখানে স্ত্রীজাতির কর্মকেন্দ্র করতে হবে। আর অন্যটি, দেশের প্রতিটি মানুষই তার কর্মজীবনের শুরু ও শেষের ভিতর যে কোন সময়েই তার কৃতকর্মের উৎকর্ষতা তথা অর্জিত যোগ্যতার বিচারে দেশের যে কোন কর্মক্ষেত্রে তার যোগ্য স্থানে অভিষিক্ত হওয়ার অধিকার পাবেন।

বিষয় দুটি বোধ হয় আর একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। প্রথম কথা, পুরুষের কর্মক্ষেত্র তার শক্তির সঙ্গে সমতা হারালে ক্ষতি হয় দেশ এবং ওই কর্মী উভয়েরই। অফিসের ফাইল প্রায়শঃই এই সমতা রাখতে পারে না, শক্তির অপচয় হয়। কাজেই এ-শক্তিকে যতদিন ওই ফাইলে আবদ্ধ রাখার বিলাস থাকবে ততদিন দেশের সকল কর্মক্ষম মানুষের জন্য যুক্তিযুক্ত কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হবে এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমন সমাজে কেবল ধূর্ত ব্যক্তিরাই জয়ী হতে পারে কিন্তু এই সামাজিক ব্যবস্থায় কোন জাতির আত্মবিকাশ এবং পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের শক্তি জাগেনা। অলস বা অপচিত শক্তি অনাবশ্যক কাজে ব্যবহৃত হয়ে কেবল জটিলতাই

সৃষ্টি করে। কিন্তু এ পথ যদি রুদ্ধ থাকে, অর্থাৎ অনন্যোপায় এই কর্মশক্তি যদি বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় তবে অনিবার্য কারণেই সে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে নেবে। এই পশ্চিমবঙ্গে বসে বিভিন্ন অন্য প্রদেশাগত ব্যক্তির কাজের গতি লক্ষ্য করলে এ-বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ হবে। সমাজতন্ত্রের দামামা আজ যাঁরা বেশী বাজাচ্ছেন তাঁরা এর সঠিক পথ ধরে চললে এটা না বুঝবার অবকাশ ছিল না যে, পুরুষ শক্তির সৃজনক্ষম অংশ কেবল অফিস ফাইলে আবদ্ধ থাকলে সমাজে যে শূন্যতা ও জটিলতার সৃষ্টি হয় বহু কঠিন মূল্যেও তার প্রতিকার সহজ হয়না। অফিসের প্রয়োজনীয় অংশের দায়িত্বভার স্ত্রীজাতির উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব মূলতঃ এই কারণেই।

আর প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিষয় হোল, যোগ্যতার বিচারে দেশের সকল মানুষই যেমন যোগ্য কাজ পাওয়ার অধিকারী, তেমনি এই যোগ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রত্যেকের যে কোন সময়ে স্থানান্তরের যোগ্য স্থান অধিকারের সুযোগও চাই। এ-ব্যবস্থা আজ অবশ্য আছে কিছুটা নিজ কর্মক্ষেত্রের গণ্ডিতে। এই গণ্ডি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতেও সর্বত্র বাধা নেই। কিন্তু সাবেক কর্মকালের পুঁজি সেখানে জমা পড়ে না। এ-ব্যবস্থা পৃথিবীর কোথাও নেই। কমিউনিস্ট সমাজে এ জাতীয় যা আছে তার গোত্র স্বতন্ত্র। আসলে প্রস্তাবটির সরল অর্থ হোল, আজ কে কোথায় কোন কাজ করছেন বা কোথায় কী কাজে নিযুক্ত হলেন সেটাই তাঁর কর্মজীবনের একমাত্র ঠিকানা নয়, যোগ্যতার বিচারে নিয়তই তাঁর এ-ঠিকানা পালটাতে পারে। সমাজের সকল কাজে নিযুক্ত প্রতিটি মানুষ এই ঠিকানা পরিবর্তনের অধিকারী। শ্রেণীপুষ্ট সমাজে আরও বহু স্তোক বাক্যের ভিড়ে এর গুরুত্ব চাপা পড়ে আছে ঠিক, কিন্তু একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজে কর্মীমাত্রই হবেন সামাজিক কর্মী। এখানে 'সরকারী-বেসরকারী' বলে কোন কর্ম বা কর্মীরই আলাদা কোন সংজ্ঞা নেই। সকল কর্ম আর কর্মী একই সংজ্ঞা ও মর্যাদায় ভূষিত। অর্থাৎ আজ যিনি একটি বণ্টন, সরবরাহ বা অন্য কোন সংস্থার কর্মী কাল তিনিই ব্যাঙ্কের কর্মী, পরশু রেলের এবং তার পর হয়ত রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দপ্তরে কাজ করছেন। আবার

আজ যিনি কোন সরকারী অফিসের কেরানী কাল তিনিই একটি বণ্টন কেন্দ্র বা আর একটি ক্ষেত্রে কাজে লিপ্ত হবেন। এখানে যোগ্যতাই হোল আদত বিষয়। নিয়োগকাল ও ক্ষেত্র তাঁর একটিই, কিন্তু কর্ম-কাল শেষ হওয়ার পূর্বে তাঁর কর্মক্ষেত্রের ঠিকানা পরিবর্তন হতে যে বাধা থাকবে না এই মানসিকতা আর সামাজিক প্রতিশ্রুতি নিয়েই প্রতিটি মানুষ তাঁর কর্মজীবন শুরু করবেন। নকল বা মুখস্থ করা বিদ্যার ডিগ্রীকে অবলম্বন করে কোন যোগ্যতারই সঠিক মূল্যায়ন হবে না, হবে কর্মের উৎকর্ষতার বিচারে।

আর প্রকৃত গণকল্যাণ সমাজে ব্যক্তিগত কাজ ব্যতীত প্রতিটি কাজই হচ্ছে সামাজিক কাজ। এই সামাজিক কাজ-বণ্টন কেবলমাত্র যোগ্যতার বিচারেই হতে পারে এবং যে-কোন সময় যে-কোন কাজেই যোগ্যকে তার যোগ্য স্থানে অভিষিক্ত করে অযোগ্যকে স্থানান্তরে যেতে হবে। সমাজকে নিয়ত গতিশীল, ন্যায়নিষ্ঠ ও সার্বিক কল্যাণধর্মী রাখতে গেলে এ ভিন্ন গতি নেই। উপদেশ বা অনুরোধ যতই হৃদয়গ্রাহী হোক, আইন যতই কঠোর ও ব্যাপক থাক এবং অর্থ যতই ঢালা যাক, সমাজে অযোগ্য মানুষ যোগ্যতর কাজে থাকলে সেখানে সবই হবে বৃথা। অথচ অযোগ্যের যোগ্য স্থান অধিকার, যোগ্যের অনাদর আর অপমান এবং শক্তির অপচয়ে ধীরে ধীরে যোগ্যতার অভাব—এইত আজকের সমাজের চিত্র। কাজেই যোগ্যতার বিচারে ন্যস্ত কর্ম এবং কর্মীমূল্য ধার্য না হলে সমাজের কোন পরিবর্তনই ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারে না।

শ্রমমূল্য, শ্রমিক স্বার্থ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ

'উৎপাদন মানেই শ্রমফল'—মার্ক্স কথিত এ-বক্তব্য জীবন্ত সত্য। শ্রম-বহির্ভূত উৎপন্ন কোন বস্তুকে মানুষের ভোগে লাগাতেও কিছু শ্রমশক্তি অবশ্য প্রয়োজন। আর শ্রম যিনি দেন বা করেন তিনিই শ্রমিক।

তবে এই অর্থে ব্যক্ত হয়ে শ্রমিক যতটা পরিচিত হয়েছেন, 'শ্রম

যাঁর বিক্রি হয় তিনিই শ্রমিক’ এই অর্থে পরিচিত হয়েছেন তার অনেক বেশী। বস্তুত ‘শ্রমিক’ অর্থে আমরা চিহ্নিত করতে চেয়েছি কেবল তাঁদেরই, যাঁদের শ্রম অর্থের বিনিময়ে কেনা চলে। ব্যক্তির প্রয়োজনেই হোক, কৃষি-শিল্প বাণিজ্যেই হোক, আর রাষ্ট্রের কাজেই হোক, মূল্যের বিনিময়ে শ্রম যাঁর পাওয়া যায়, প্রচলিত সমাজে তাঁকেই শ্রমিক হিসেবে পরিচিত করা হয়েছে।

অবশ্য রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত শ্রমকে এই ‘শ্রমিক শ্রম’ আখ্যা দিতে কিছুটা সঙ্কোচ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও ‘সেবায় নিয়োজিত’ এই ভাবমূর্তি পৃথিবীর কোথাও গড়ে উঠেছে এ-তথ্য ব্যক্ত হয় নি। জোর করে কিংবা মূল্য দিয়েই এ-শ্রম নেওয়া হয়েছে। সুতরাং ‘সেবায় নিযুক্ত’ এই বিশেষণে এঁদের আলাদা মূল্যে পরিচিত করায় অন্য বিশেষ উদ্দেশ্য থাকলেও তাতে ন্যায়গ্রাহ্য কোন যুক্তি নেই। তবে এঁদের স্বতন্ত্র সংজ্ঞার একটা যুক্তি হতে পারে,—আর পাঁচজনের মত এঁদের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয়-গুলির তেমন কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। যদিও এর মূল্যও এঁরা স্বতন্ত্রভাবেই পেয়ে থাকেন। এটা যুক্তিযুক্ত কিনা শ্রমিকের সংজ্ঞা ও তাঁর মূল্য ধার্যের সময়ই সেটা বিবেচ্য হতে পারে। কিন্তু আপাতত এঁদের প্রসংগ থাক এবং এই সঙ্গে ব্যক্তিগত কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের কথাও বাদ যাক, আলোচনা সীমিত থাক সেই সব শ্রমিকদের বিষয়েই, যাঁদের শ্রম ক্রয় করে সম্পদ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আমরা দেখতে পেয়েছি, ধনীপুষ্ট বা ধনিক-তুষ্ট সমাজে সম্পদ সৃষ্টির নানা স্তরে শ্রমিক নিযুক্ত হন মজুরীর ভিত্তিতে। এই মজুরী ক্বচিৎ কোথাও ‘ন্যায্য’ আখ্যা পায়; আবার কোথাও ‘অন্যায্য’ এই যুক্তিতে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠে মূল ক্ষেত্রটির সঙ্গে আশপাশের সম্বন্ধহীন বহু ক্ষেত্রকেও কম-বেশী দগ্ধ করে। এর প্রধান কারণ, এঁরা শুধু শ্রমেরই মূল্য পান, শ্রম নিয়োগক্ষেত্রের সঙ্গে এঁদের অন্য কোন স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে না। এঁদের মূল্যও শুধু শ্রমটুকুর এবং শ্রমদান কাল অবধিই তা সীমাবদ্ধ। এই শক্তি বা কাল অন্তে শ্রমক্ষেত্রের সঙ্গে এঁদের সকল সম্বন্ধই শেষ হয়ে যায় বলে নগদ প্রাপ্তিটা ন্যায্য

স্তরে এলেও স্থায়ী হয় না, মনে হয় প্রাপ্য আরও ছিল। শ্রমক্রেতা তাঁর সততার মূল্য দিতে যেয়ে কোথাও একেবারে নিঃশেষ হলেও শ্রমিকের সন্দেহ যায় না। আর এই সন্দেহই চিরকাল শ্রমক্ষেত্রের কল্যাণ চিন্তা থেকে অধিকাংশ শ্রমিককে নিবৃত্ত রাখতে প্ররোচিত করে থাকে।

এ গেল অকমিউনিস্ট সমাজের শ্রমিকদের বিষয়। কিন্তু কমিউনিস্ট সমাজে শ্রমিকদের অবস্থা কী ?

যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায়, এর দুটি দিক আছে। একটি ব্যক্ত এবং অন্যটি অব্যক্ত। ব্যক্ত দিক—যা বাইরে প্রকাশ করা হয় আর অব্যক্ত দিক যা প্রকৃতই ঘটে অথচ শ্রমিকরাও জানবার, বুঝবার বা মন্তব্য প্রকাশের সুযোগ পান না। ব্যক্ত অংশে থাকে সমাজতন্ত্রের নামাবলি জড়ানো আর অব্যক্ত অংশে শুধুমাত্র শ্রম মজুরী। সহজ কথায় যার মোট ফল হোল, অকমিউনিস্ট সমাজের শ্রমিকদের মত এখানকার শ্রমিকদেরও কিঞ্চিৎ শ্রম মজুরীতেই বিদায় করা হয়, অন্য কোন স্বত্বের স্বীকৃতি থাকে না।

এ-প্রসঙ্গে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলের এক সাধারণ সম্পাদক শ্রীকেশব প্রসাদ শর্মার একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'চীন বা রাশিয়া কমিউনিস্ট দেশ ত নয়ই, সমাজবাদী দেশও নয়। সেখানকার শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থোন্নয়নের জন্যই অন্য দেশে মূলধন যোগান দিচ্ছেন। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ দ্বারাই কেবল এরূপ মূলধন সৃষ্টি করা সম্ভব। আমেরিকা, রাশিয়া বা চীন যে-দেশই অন্যদেশে মূলধন যোগান দিক না কেন, মনে রাখতে হবে যে, শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করেই ওই মূলধন গঠন করা হয়েছে। সুতরাং ওই সব দেশই শ্রমিক শ্রেণীর সমান শত্রু।'

এই বক্তব্য 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত' বলে কোন কোন ব্যক্তি বা দল মন্তব্য করলেও 'শ্রমিক শোষণ থেকেই মূলধনের সৃষ্টি' কার্লমার্ক্সের এই মন্তব্য কেউ অস্বীকার করতে পারেন কী ? সুতরাং যুক্তি মেনে চললে শ্রীশর্মার ওই মন্তব্য যে সত্যকেই প্রকাশ করেছে তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আর এও স্বীকার করতে হয় যে,

অকমিউনিস্ট, কমিউনিস্ট সকল নিয়োগকর্তাই শ্রমিক নিয়োগ করেন মুনাফার উদ্দেশ্যে। শ্রমিকদের শ্রমফলের অংশ আত্মসাৎ বা সঞ্চয় করার প্রয়োজন না হলে মজুরীর পরিবর্তে শ্রমফলের সবটাই ন্যায্য অংশে শ্রমিকদের ভিতর বণ্টন করা হোত। অর্থাৎ শ্রমফল সঞ্চয়ে ব্যক্তি-স্বার্থ না থেকে কেবলমাত্র তা শ্রমিক কল্যাণে নিবদ্ধ থাকলে সে-ক্ষেত্রে অপর সঞ্চয়কারীর কোন ভূমিকা থাকা সম্ভব ছিল না। অন্ততঃ শ্রমমজুরী ও সঞ্চয়ের পরিমাণ শ্রমিকদের অনুমতি সাপেক্ষ না থেকে পারত না। কিন্তু কোথাও তা হয় নি। নিয়োগকর্তারাই হয়েছেন সর্বেসর্বা। শ্রমদান কাল বা শ্রমশক্তি নিঃশেষ হলে শ্রমিকের সঙ্গে এঁদের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। তাঁদের প্রাপ্যও আর কিছু থাকে না। অর্থাৎ তাঁদের দেবার শক্তি যখন থাকছে না, কিছু পাওয়ার অধিকারই বা থাকবে কেন? কোথাও কিঞ্চিৎ থাকলেও সে অক্ষমের প্রতি করুণা। সমাজগ্রাহ্য অধিকার বলে চালাতে গেলেও তাতে ন্যায়গ্রাহ্য চরিত্রের ছাপ পড়ে না।

এখানেই অন্যান্য সমাজ ও কমিউনিস্ট সমাজের সঙ্গে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রভেদ। শ্রমিক তথা শ্রমদানকারীর প্রাপ্য কতটা ও কতকাল অবধি তিনি তা নেবেন এবং তার মোট প্রাপ্যের কত অংশ কী কী প্রয়োজনে সঞ্চয় করবেন তা ঠিক করার অধিকার রয়েছে শুধু তাঁর নিজেরই। সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এটা ঠিক করবেন। ন্যায় বিচারে বিশেষ একজন বা একদল ব্যক্তি এ-অধিকার পেতে পারেন না। কারণ ব্যক্তিগত কাজ ভিন্ন সমগ্র কাজই এ-সমাজে সামাজিক কাজ। আর এ-কাজে কোন একজন শ্রমিকের শ্রমফল শুধুমাত্র তার নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না, কাজেই তাঁর স্বার্থও শ্রমশক্তি বা শ্রমদান কাল অন্তে নিঃশেষ হতে পারে না। তাঁর শ্রমশক্তি সমাজের সকল শক্তির পরিপোষক ও পরিবর্ধক এক অখণ্ড সামাজিক শক্তির অন্তর্গত এবং এই শক্তিই সমাজকে সৃষ্টি করেছে, স্থিতি দিয়েছে ও বিকাশ ঘটাচ্ছে। সুতরাং সমাজের সব কিছুরই একটি ন্যায্য অংশ তাঁর প্রাপ্য। আর এ-প্রাপ্য তাঁর শ্রমশক্তি ও শ্রমদান কাল অন্তেও অব্যাহত থাকা ন্যায়-

সিদ্ধ এই কারণে যে, তাঁর সৃষ্টির স্থিতি হয়েছে, বিকাশ ঘটেছে। সমাজের বিকাশ ঘটাতে তাঁর শক্তি সমাজ নিয়েছে, সমাজ বিকশিত হয়ে পরবর্তী মানুষকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করছে। কাজেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্রম-মজুরী দিয়ে বিদায় করলে এই সকল বিকশিত ও সমৃদ্ধ মানুষ হবেন অকৃতজ্ঞ। সমাজতন্ত্রে এটা সম্ভব নয়। মানুষ এখানে অকৃতজ্ঞ হতে পারে না।

বিষয়টিকে আর একটু স্পষ্ট করা যাক। যেমন চাষী তাঁর শ্রম প্রত্যক্ষভাবে কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ করলেও সেই শ্রমফলেই শিল্পের একটি বৃহৎ অংশ সচল থাকে। আবার শিল্প-শ্রমিকের শ্রম ফলেই কৃষি যন্ত্র, সেচের জল, সার ইত্যাদি এবং চাষীর জীবনধারণের অধিকাংশ উপকরণ উৎপন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন একজন শ্রমিকের শ্রমশক্তিই নির্দিষ্ট একটি গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, সমাজের সর্বত্র তা ব্যাপ্ত। কাজেই তাঁর স্বার্থও একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকা যুক্তিসিদ্ধ নয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে-ভাবেই হোক, প্রতিটি শ্রমিকের শ্রমফলেই সমগ্র সমাজ বেঁচে আছে, সমাজ তার চলার শক্তি পাচ্ছে। সুতরাং প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকারও রয়েছে সর্বত্র। এ অধিকার স্বীকার করে নেবার মানসিকতা ব্যক্তি বা শ্রেণী-শাসিত সমাজে নেই। এ-মানসিকতা জন্ম নিতে পারে কেবল সমাজতান্ত্রিক সমাজে। যেখানে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী এমন কী রাষ্ট্রেরও মাধ্যম হওয়ার সুযোগ থাকবে না এবং প্রতিটি শ্রমিক সহ দেশের সকলেই হবেন নিজের নিয়োগকর্তা ও প্রাপ্য বণ্টনের ভারপ্রাপ্ত।

সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিস্বত্ব

মানুষ হোল স্বাধীন সত্তায় আস্থাবান সদাসতর্ক সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। নিজের স্বত্ব সম্বন্ধেও সে সতত সচেতন। আর সমাজতন্ত্রের অর্থ যদি হয় সকলের সমান অধিকার তবে রাষ্ট্রের সমগ্র ধনসম্পদের উপর যেমন চাই সকল মানুষের সম অংশ ও কর্তৃত্ব, তেমনি প্রথমেই চাই প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের এই স্বত্ব ও সত্তার সমান স্বীকৃতি। অর্থাৎ মানুষ এখানে

জন্মই নেবে এই নিশ্চয়তা নিয়ে যে, তার সাধ্যমত সর্বাধিক শ্রমদানের দায়িত্ব আছে, সসম্মানে ও সামাজিক সংগতির সম মূল্যমানে বেঁচে থাকার অধিকার আছে এবং এই দেওয়া ও পাওয়ার প্রত্যক্ষ কিছু কর্তৃত্বও তার আছে। যদিও এটা কার্যতঃ কোথাও নেই। যা বা যেটুকু আছে বলে প্রকাশ, তার সবটাই প্রায় স্তোকবাক্য। সেটাই স্বাভাবিক। সকল মানুষের ওই স্বত্ব ও সত্তা মেনে নিলে সমাজে শ্রেণীকর্তৃত্ব থাকে না, সার্বিক মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়, যেটা শ্রেণীস্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এখানে অন্য আর কোন পরিবর্তনেই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। এর একমাত্র পথ, সম্পদ আহরণ ও বন্টনে দেশের সকল মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। সম অংশে ও দায়িত্বে সকল মানুষের উপর এ-ভার ন্যস্ত থাকলে সমাজ ন্যায়হীন হতে পারে না, কিংবা একে অন্যের উপর প্রভুত্ব করতেও পারে না। সঠিক ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের প্রধান লক্ষণ হবে, সমাজের প্রায় সর্ববিষয়েই সকলের অংশ ও কর্তৃত্বের সমতা।

যেমন কাশ্মীরের কোন এক চাষী তাঁর বাগানে উৎপন্ন কয়েক ঝুড়ি আপেল বিক্রি করে আজ শুধু তার বাজার মূল্যটাই পাচ্ছেন। অপরের মর্জিনির্ভর এই মূল্য ন্যায্য কি অন্যায্য সেটা স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু ওই চাষী যদি প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজের নাগরিক হন (এই সমাজ এবং তার উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার একটি রূপরেখা পূর্বেই টানা হয়েছে) তবে তার ওই আপেল স্থানীয় বণ্টন বা সরবরাহ কেন্দ্রে বিক্রি করে তিনি এর ন্যায্য বাজারমূল্য পাবেন এবং এটা শুধু ওখানেই ব্যবহার হলে বণ্টন ও সরবরাহ কেন্দ্রের লভ্যাংশের সঙ্গে করপোরেশনের অর্জিত লভ্যাংশের অংশও পাবেন। আর এটা যদি দেশের অন্য অঞ্চলে রপ্তানি হয় তবে সেখানে যতবার হাত বদল হবে এবং তা থেকে যত মুনাফা হবে তারও একটা অংশ তিনি করপোরেশনের মাধ্যমে পাবেন। বিদেশে রপ্তানি হলেও তার লাভের অংশ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন না। এটা অন্য কোন সমাজ-ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। কেবলমাত্র পূর্ববর্ণিত করপোরেশন কিংবা অনুরূপ কোন সার্বিক মানুষের সম অংশ ও কর্তৃত্বনির্ভর সংগঠনের সক্রিয়তা থেকেই

সমাজে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার এই চরিত্র গড়ে উঠতে পারে। শুধু একজন চাষী বা শ্রমিকের কথা নয়, দেশের যেখানে যেভাবে যে-সম্পদই অর্জিত হোক এবং এর জন্য যেখান থেকে যেই শ্রম দিন প্রত্যেকেই তাঁর ন্যায্য অংশ পাবেন। একটি সঠিক ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের সার্থকতাই এই যে একজন অপরকে ঠকাচ্ছে বা ঠকাতে পারে এমন কোন ধারণা পোষণের সুযোগই সেখানে থাকে না। এই সামাজিক মানসিকতা সমগ্র অবিচারের একটি প্রধান প্রতিষেধক।

অবশ্য 'ব্যক্তিগত উদ্যোগ মাত্রই সমাজক্ষতিকর' এমন ধারণা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বরং ব্যক্তিগত উদ্যোগ বহু ক্ষেত্রেই অধিক মূল্যবান হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাহচর্য ও স্বীকৃতি অপরিহার্য। কারণ প্রতিভার দ্রুত বিকাশ ঘটাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগও একটি মৌল অবলম্বন। এখানে রাষ্ট্র দূরে থাকলে বা প্রতিবন্ধক হলে সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই যতক্ষণ না এটা সমাজক্ষতির পথ ধরছে ততক্ষণ ব্যক্তি-প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ সংগত নয়। বরং 'সার্বিক মানুষের কর্তৃত্বনির্ভর সমাজে কোন প্রতিভাই যে ব্যক্তিস্বার্থে মাথা তোলার অবকাশ পাবে না, এই যুক্তিকে গুরুত্ব দিলে সমাজ আরও বেশী প্রতিভার সাক্ষাৎ পাবে এবং আরও দ্রুত এগোবার শক্তি পাবে। অবশ্যই ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকেই শ্রেণীস্বার্থ দানা বাঁধে আর এরই সফল পরিণতি শেষে শ্রেণীশাসন পোক্ত হয়। দলীয় শাসন শ্রেণী প্রভাব মুক্ত হতে পেরেছে এর কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই। বেশী ক্ষেত্রেই সামন্ত-তন্ত্রের বিকল্প বা ওরই নতুন এক সংস্করণ রূপে এর আসল মূর্তিটা প্রকাশ পেয়েছে। অথচ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক মানুষের কর্তৃত্ব থাকলে এ-অবস্থার পত্তন সম্ভব হোত না। আজ যেখানে সমাজের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ পরনির্ভর, পরমুখাপেক্ষী সেখানেই প্রত্যেকের সত্তা, স্বত্ব এবং পারিবারিক অস্তিত্ব হোত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। আর এই সম অংশ ও কর্তৃত্বের আধার থেকে বিচ্ছুরিত হোত সকলে একই সঙ্গে ও প্রায় একই দ্যুতিতে।

তবে আশংকা এর পরেও কিছু থাকে। এ হোল আজ যাঁরা এই সমাজের কর্মী অর্থাৎ, বিভিন্ন কর্মকেন্দ্র ও শিল্প-বাণিজ্যের শেয়ার

কিনে অংশীদার হবেন তাঁদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর নতুন যাঁরা সেখানে আসবেন তাঁদেরও মূলধন বিনিয়োগ করে অংশীদার হওয়ার সুযোগ থাকবে কিনা? আর সেদিন থাকলেও এ-ধারা কতকাল চলতে পারবে? এটা ঠিক আশংকা না কূটতর্ক সে-আলোচনা থাক। কিন্তু ওই প্রথম ও দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার উত্তরে এই একটি বিষয়ের প্রতি জোর দিলেই যথেষ্ট হবে যে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের যেটুকু গতিবেগ আজ আছে ঠিক ততটুকু গতি বজায় থাকলেও অনির্দিষ্ট আরও বহু-কাল নতুন মূলধন ও শ্রমপ্রয়োগ ক্ষেত্রের অভাব ঘটবে না। আর সমস্বার্থ ও সার্বিক কর্তৃত্বে একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ গড়ে উঠলে সেখানে আরও যে-গতিবেগ আসবে তাতে এ-জাতীয় প্রশ্নই অবান্তর হয়ে পড়বে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, অনাগত ভবিষ্যতের এক কল্পিত সমস্যার অজুহাতে আজকের মানুষের প্রয়োজন অস্বীকার করার মত নির্মমতা আর নেই। তবে শুরুতে এ-সিদ্ধান্ত নেওয়া অবশ্যই যুক্তি-যুক্ত হবে যে, প্রতিটি অবসরপ্রাপ্ত কর্মী কেবলমাত্র তাঁর মৃত্যুকাল অবধিই তাঁর সমগ্র অধিকৃত শেয়ার নিজের হেফাজতে রাখার অধিকার পাবেন এবং মৃত্যু অন্তে এই শেয়ার করপোরেশনে জমা দিয়ে তার বংশধরগণ তখনকার বাজারমূল্য ফেরত নিতে বাধ্য থাকবেন।

সমাজে সব ব্যবস্থাই পত্তন হয় সমসাময়িক মানুষের প্রয়োজন এবং অনাগত মানুষের শুভ-কামনা থেকে। এটা নিয়ম এবং যুক্তিযুক্ত নিয়ম। আজকের ব্যবস্থা পরবর্তীকালের প্রয়োজনে নস্যাৎ হলে লজ্জার কিছু নেই। মানুষের প্রয়োজনের কাছে কোন ব্যবস্থাই স্থায়ী থাকার দাবী করতে পারে না। যদিও তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সমাজে এ-ধারণা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে নি। সেখানে পূর্বোক্ত ওই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রকেই সবকিছুর মালিক করে। চাষী, শ্রমিক, কর্মচারী কেউই কোন কিছুর স্বত্ব পায় নি। কাজেই এঁদের বংশধর বা পরবর্তী কারো স্বত্বের প্রশ্নও আসে নি। এ-ব্যবস্থা জনগণের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কতটা সংগতিপূর্ণ এবং গণচেতনায় কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সে-প্রশ্ন থাক। কিন্তু অন্যের মনের এ সংশয় কিছুতেই দূর হওয়া সম্ভব নয় যে, মানুষের পার্থিব সমস্ত স্বচ্ছ

যদি অপরের কর্তৃত্বনির্ভর থাকে তবে তার আত্মসত্তাও সেই অপরের মর্জিনির্ভর না থেকে পারে না। আর রাষ্ট্র হলেও যেখানে তার পরিচালকরাই সর্বেসর্বা শুধু নয় সমগ্র বিরোধীতামুক্ত, সেখানে তাঁদের মর্জিই বা অপরের যুক্তির মর্যাদা দেবে কেন? সুতরাং সঠিক সমাজ-তন্ত্রে এসব প্রশ্ন অবান্তর। উৎকোচ, উৎপীড়ন, আশ্বাস এর একটিও এ-সমাজে কাজে আসে না। সমস্বার্থে সংগঠিত সমষ্টিগত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্বেই কেবল এ-সমাজ সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারে।

কৃষিভূমির স্বত্ব, কৃষির অগ্রগতি ও কৃষকদের আত্মপ্রতিষ্ঠা

মানুষ প্রতিষ্ঠা চায় এককভাবে। এটাই তার মৌল কামনা, এর বাহ্যিক প্রকাশ ভিন্ন হলেও অন্তর তার আত্মকেন্দ্রীক। আর অন্য বহু সমস্যার মত ভূমি সমস্যারও মূলে আছে এই আত্মকেন্দ্রীক কামনা।

অবশ্য কামনা থেকেই সমস্যার উদ্ভব হয় না, সমস্যা দেখা দেয় কামনা বিফল হলে। বিফল না হলে অথবা সফলতার অন্য পথ খুঁজে পেলে সমস্যা দেখা দিতে পারে না। কাজেই সমাজকে যদি এমনভাবে গড়ে তোলা যায় যে সমস্যা দেখা দেবার পূর্বেই কামনা সফল পরিণতি পেয়েছে কিংবা একটি পথ রুদ্ধ হলেও আর একটি পথ সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেছে তবে সমস্যা সেখানে দাঁড়াবার স্থান পায় না। সকলের জন্য সকল পথ উন্মুক্ত রাখতে হলে অবশ্য সমাজকে সার্বিক মানুষের দায়িত্বে ন্যস্ত রাখা চাই। কামনার ন্যায্যতা বিচার এবং আর পাঁচজনের প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতেও এ-দায়িত্ব আবশ্যক। ভূমি সমস্যা কী ও কতটা এবং এর সঙ্গে কৃষক ভিন্ন অন্য সকলের সম্বন্ধ কতটা জড়িত কিংবা কৃষকদের প্রকৃত সমস্যা শুধু কৃষিভূমি না জীবিকা, এর প্রতিটি বিষয় দেশের সকল মানুষ সঠিকভাবে না জানলে ভূমি সমস্যার পর উৎপাদন সমস্যা, তারপর বিক্রয় ও মূল্য সমস্যা এবং সব শেষে কর্মক্ষেত্র ও জীবিকার সমস্যা এসে একটি জট পাকানো সমস্যা এখানে থেকেই যাবে। বিচ্ছিন্ন বা সাময়িক কোন মীমাংসায় কৃষকদের প্রকৃত কল্যাণ বিশেষ হবে না।

একটা বিষয় ভুলে যাওয়া সংগত নয় যে, কৃষকই হোন কিংবা শ্রমিক, কেরানী বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীই হোন, সমাজের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষের কারো সমস্যাই শুধুমাত্র তাঁর বৃত্তিটিতে নিবদ্ধ নয়। বৃত্তি একটি হেতু মাত্র। প্রধান হেতুও হতে পারে। কিন্তু মূল সমস্যা জড়িয়ে রয়েছে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গেই। আর সমগ্র ইতিহাস ঘাঁটলে এও দেখা যাবে প্রায় সকল সমস্যারই উৎপত্তি, বিকাশ ও স্থায়িত্ব ঘটেছে এই ৮০ ভাগ মানুষের উপর বাকী ২০ ভাগ মানুষের প্রভুত্ব থেকে। কাজেই এই ৮০ ভাগ মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে হলে বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অবশ্যই কিছু পরিবর্তন চাই। কারণ কৃষকরা এই ৮০ ভাগের অন্তর্গতই শুধু নয়, বৃহৎ অংশ এবং ভূমি সমস্যা মূলতঃ এঁদেরই। ভারতে কৃষিভূমির মোট পরিমাণ এবং কৃষকদের সংখ্যা যাচাই করলে স্পষ্ট দেখা যাবে, সমগ্র কৃষিভূমি শুধুমাত্র কৃষিজীবীদের ভিতর সমহারে বণ্টিত হলেও কেবল কৃষির উপর নির্ভর করে এরা ন্যূনতম জীবিকার সুযোগও পাবেন না। অধিকন্তু আজকের স্থিতিশীল বহু কৃষকই জীবিকাচ্যুত হবেন। অর্থাৎ কার অধিক জমি আছে আর কার তা নেই সেটাই যদি একমাত্র সমস্যা থাকে কিংবা জীবিকার প্রশ্নে এ-সমস্যাই গুরুত্ব পেয়ে থাকে তবে বলতে দ্বিধা নেই, এ-মীমাংসায় কৃষক-সমস্যার সুরাহা বিশেষ হবে না, কারণ এঁদের আদত সমস্যা হচ্ছে জীবিকা।

কোন সমস্যা সামাজিক সমস্যায় পরিণত হলে এবং তার সঠিক সমাধান চাইলে এর উৎপত্তির হেতুই হবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ভারতে ভূমি সমস্যা থেকেও বড় হোল সমগ্র কৃষক শ্রেণীর জীবিকা। অর্থাৎ কর্মাভাবই এঁদের মূল সমস্যা। কৃষিভূমিতে এঁদের সকলের স্থান সঙ্কুলান হয় না, তাই এ-সমস্যা এতটা প্রবল হতে পেরেছে এবং অন্য কর্মক্ষেত্রে বাড়তি কর্মশক্তি প্রয়োগ করে তার ন্যায্য মূল্য পেলে তবেই এ-সমস্যার সুরাহা হতে পারে। যদিও কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য স্থির রাখা এবং সেই মূল্যের সবটুকুই কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া প্রভৃতি আরও কিছু সমস্যা এখানে আছে। তবে এর সম্বন্ধ কৃষকদের সমৃদ্ধির সঙ্গে যতটা জীবিকার সঙ্গে ততটা নয়। বরং এখানে আর

একটি বড় সমস্যা হোল উৎপাদন। এর সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থ জড়িত তাই ভাবাবেগ বা দলীয় স্বার্থে এর সমাধান খুঁজলে শুধু কৃষক শ্রেণী নয়, সমগ্র দেশবাসীই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। হয়ত হচ্ছেনও।

পূর্বেই বলেছি, কৃষিভূমির প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ বা স্পর্শ-কাতরতা এসেছে কৃষকদের এটাই একমাত্র জীবিকার অবলম্বন বলে। দেশের সমগ্র শিল্প-বাণিজ্য এবং অন্যান্য অর্থাগমের ক্ষেত্রে যদি এঁদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটে ও সমান অধিকার বর্তে তবে অনিবার্য কারণেই এঁদের সমস্যা ত বটেই, সমাজের আরও বহু সমস্যার অবসান ঘটবে। তখন দেখা যাবে, সমগ্র কৃষিজীবী উৎপাদন বৃদ্ধির শেষ স্তরে পৌঁছিতে যেমন সকলে একত্রে চলেছেন, বাড়তি শক্তি প্রয়োগে দেশের গতি বাড়াতেও সকলে তৎপর হয়ে উঠেছেন। সহজ কথায় দেশের অন্যান্য কর্মযজ্ঞে কৃষকদেরও যোগ্য অংশ থাকলে এবং নির্ভরযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জীবিকার অন্য অবলম্বন পেলে কৃষি, কৃষিভূমি ও কৃষক সমস্যার মীমাংসা হতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হবে না।

অবশ্য প্রত্যেকের দখলী ভূমিসীমা স্থির করে প্রকৃত কৃষকদের হাতেই কৃষিভূমির স্বত্ব ন্যস্ত করতে হবে। এ-ক্ষেত্রে দ্বিধার কোন অবকাশ নেই। সমাজগ্রাহ্য ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত সকল সম্পত্তির উপর নিশ্চিত স্থায়ী অধিকার সুস্থ ও সাবলীল সমাজের একটি মৌল উপাদান। কৃষিভূমির বেলায় এটা আরো বেশী প্রযোজ্য। কিন্তু এ কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং সর্বজনগ্রাহ্য ন্যায়ের পথে না হলে কৃষকদের খুব বেশী কল্যাণ হবে না, বরং অকল্যাণ হবে সমগ্র সমাজের এবং সেই অকল্যাণ থেকে মুনাফা তুলতে চাইবে বিশেষ কয়েক শ্রেণীর মানুষ; যাঁদের ভিতর এমন সব রাজনীতিকও আছেন, যাঁরা কিঞ্চিৎ শ্রম-মূল্যে কৃষকদেরও শ্রমদাসে পরিণত করতে উদ্‌গ্রীব। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা হবে, যাঁদের কাছ থেকে অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ করা হবে তাঁদের ওই জমির সমাজগ্রাহ্য মূল্য প্রত্যর্পণ করা এবং যাঁদের ভিতর এ-জমি বণ্টন করা হবে তাঁদের কাজ থেকে ওই মূল্য আদায় করে নেওয়া। তবে এই লেন-দেন যেখানে নগদ অর্থের অভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেখানে পূর্ববর্ণিত করপোরেশন মধ্যস্থ হয়ে

ক্রেতার কাছ থেকে জমির প্রকৃত মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদসহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি ঋণপত্র গ্রহণ করে জামিন স্বরূপ মালিকানা স্বত্বের উপর কর্তৃত্ব করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অংশ থেকে এই ঋণ আদায় করে নেবে। আবার দরকার হলে বিক্রেতাকেও তাঁর প্রাপ্য মূল্যের জন্য সুদসহ অনুরূপ একটি ঋণপত্র নিজেই লিখে দিয়ে আদায়ীকৃত অর্থ দ্বারা তা পরিশোধ করে দেবে। এ-ব্যবস্থা শহরে সম্পত্তি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

এটাই ন্যায্য এবং সম্ভবত সহজ ও শ্রেষ্ঠ পথ। এতে উভয় পক্ষই লাভবান হবেন। কারণ যে-প্রায় অমানবীয় পরিণতিটা এসব ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং এই সেদিনই ভারতের বহু অঞ্চলে এরই একটা অনুকরণ প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাকেই সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ ও নিরুদ্বেগে সমাধা করা যাবে। অধিকন্তু এতে এক পক্ষের হারাবার গ্লানি ও বিদ্বেষ এবং অন্য পক্ষের পড়ে পাওয়ার অশ্রদ্ধা আর অবিবেচনা মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে না।

ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও সমাজতন্ত্র

ট্রেড ইউনিয়নের জন্ম শ্রমিক-মালিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে। মালিক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের ক্রমবর্ধিত পেষণ থেকে আত্মরক্ষা তথা স্বার্থ রক্ষার তাগিদেই শ্রমিক বা শ্রমিক-কর্মচারীর সম্মিলিত এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। ধনীস্বার্থপুষ্ট সমাজে এর অপরিহার্যতা এই কারণে অনস্বীকার্য যে একমাত্র ট্রেডইউনিয়ন শক্তিই এ-সমাজে মালিকের শোষণ শক্তিকে কিছুটা সংযত রাখতে সমর্থ। এ-শক্তি শ্রমিক-কর্মচারীর অবদান ও গুরুত্ব সম্বন্ধেও মালিকদের সচেতন এবং সতর্ক করে। বস্তুতঃ ট্রেডইউনিয়ন গড়ার পথ না পেলে অধিকাংশ শ্রমিককে আজও হয়ত দাস জাতির পর্যায়েই আবদ্ধ থাকতে হোত। অন্ততঃ আজ তাঁরা যেখানে এসে পৌঁছেছেন তা সম্ভব হোত না, কারণ এটা তাঁদের অধিকার ও আত্মবিকাশে সজাগ করেছে তাই নয়, সেই অধিকার আদায়ের শক্তিও যুগিয়েছে।

কিন্তু এ হোল প্রকৃত চিত্রের এক দিক। অন্য দিকে মালিক-

শ্রেণীর সৃষ্টি না হলে শুধু শ্রমিক শ্রেণী নয়, মানব জাতিরই আজকের এই অবস্থায় উন্নীত হওয়া সম্ভব ছিল না। পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশে এ-সত্য স্বীকার করা কারো কারো পক্ষে শক্ত ঠিক, কিন্তু প্রায় প্রস্তর যুগের অবসান কাল থেকে আরম্ভ করে অ্যাটম্‌, স্পুটনিক, কমপিউটারের যুগে উত্তরণ অবধি মানুষের প্রধান অবলম্বনই যে মালিক শ্রেণী একথা অস্বীকার করায় যুক্তি নেই। যে-অধ্যবসায় প্রতিভা ও সংগঠন শক্তির প্রভাবে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে এতটা উন্নতি ঘটেছে এবং মানব জাতিকে আজকের অবস্থায় নিয়ে এসেছে বিচ্ছিন্ন শ্রমশক্তির পুঁজিতে তা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। এখানে মালিক শ্রেণীর অবদানই মুখ্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে সবটুকু বললেও অত্যুক্তি হবে না। 'মালিকরা তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থে সব কিছু করেছেন' বললেও সমাজের এই অগ্রগতির সঙ্গে তাঁদের অবদানের গুরুত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। কয়েক হাজার বছর পূর্বের শ্রমিকদের কথা দূরে থাক, আজকের জাগ্রত ও আত্মসচেতন শ্রমিকরাও যে সংঘবদ্ধ হয়ে একটি নাতিবৃহৎ শিল্প গড়ে তুলতে বা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন না এ-কথা রূঢ় হলেও সত্য। শুধু সেদিন নয়, আজও কোন সমাজ এ-চেতনা জাগাতে বা এর্ সঠিক পথ দেখাতে পারে নি যে কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিই তাঁদের আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সকল দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। কাজেই ঘটনানির্ভর সমগ্র ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে এবং সমাজের আর পাঁচজনের ও আর পাঁচটি বিষয়ের প্রতি দৃক্‌পাত না করে কেবল ট্রেডইউনিয়নের পুঁজিতেই সমগ্র শ্রমিক-কর্মচারীর স্থায়ী কল্যাণ হবে, তাদের আত্মবিকাশ ও আত্মনির্ভতার শক্তি পূর্ণতা লাভ করবে এ-কথায় যুক্তি থেকে বোধহয় কুযুক্তির প্রভাবই বেশী।

যে-পক্ষেরই হোক সতর্কতা কেবলমাত্র নিজের অবদান ও অধিকারে নিবদ্ধ থাকলে অপর পক্ষকে নস্যাৎ বা হেয় করার প্রবণতাই প্রবল হয়। ঈর্ষা বা যুক্তিহীন গর্ব অন্তরকে আচ্ছন্ন করে, কল্যাণ কারোই হয় না। উপরন্তু সমাজও এতে কম-বেশী অচলতার দিকে এগোয়। শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে প্রায়শঃই যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে

থাকে তাতে সমগ্র সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়েই শেষ হয় না, অনেকের মন থেকে এর গুরুত্ব বোধটাই অন্তর্হিত হতে থাকে। অধিকারের দাবী একটি ক্ষেত্রে আবদ্ধ না থেকে অনেক সময় সমাজের আর সকলের প্রয়োজন অস্বীকারে এগিয়ে আসে এবং উৎপাদনের প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করে চলতে পেরে গোটা সমাজকেই দুর্বল ও অশালীন করে তোলে। হয়ত এরই একটি বাস্তব চিত্র দেখা যাবে আজকের ভারতে। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার স্থান এখানে নেই। তবে বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও সংবাদপত্রের সংবাদ সংগ্রহ করলেই দেখা যাবে, আর কিছু নাই হোক, এদের দাবীর দাপট অপরের প্রয়োজন ও অধিকারকে অস্বীকার করার অধিকার পেয়ে সমাজে এক চেতনা-লুপ্তকর আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছে। ওই সব সংবাদে এও দেখা যাবে, তুলনামূলক বিচারে যেখানে যত বেশী উচ্চ বেতন, অধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা, সেখানেই তত বেশী উপেক্ষা, অবহেলা, শক্তির অপচয় আর সেই জমা কাজের সুবাদে অতিরিক্ত পয়সার ব্যবস্থা। এই কাজে যে-অর্থ ব্যয় হয়,—বিশেষ করে সরকার-নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলিতে—তা দিয়ে নাকি এদেশে লক্ষাধিক শিক্ষিত যুবকের স্থায়ী চাকরী জুটতে পারে আর এর ভিতর একমাত্র সরকার চালিত কয়েকটি ব্যাঙ্কেই নিযুক্ত হতে পারেন প্রায় ১৫ হাজার। বছরে এদের ওভারটাইম বিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬ কোটি টাকা। কোটি কোটি অক্ষম, অনাহারক্লিষ্ট শিক্ষিত বেকারের দেশে এ-ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত কিনা সে-প্রশ্ন আজ নিরর্থক। কারণ এটা প্রগতির যুগ। আর এর গতি ট্রেডইউনিয়নে আরও দ্রুত। সাধারণ অর্থনীতি অন্য কথা বললেও ট্রেডইউনিয়ন তা স্বীকার করে না। ভূরিভোজের পাশে অনাহারও এই নীতি-শাস্ত্রে ন্যায়সিদ্ধ হতে বাধা নেই। আর দলীয় গণতন্ত্র? না সেখানেও এই নীতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা না জানিয়ে পথ নেই। ক্ষমতার ইমেজ গড়তে এই নীতির রসালো শক্তি সেখানে একটি মৌল উপাদান। যত ক্ষুদ্র সংখ্যক মানুষই এর সঙ্গে যুক্ত থাকুন তবু তাঁদের গুরুত্ব বেশী। তামাম বঞ্চিত মানুষের নামে এমন যে, অশ্রুবর্ষিত অপূর্ব বামপন্থী ইমেজ তারও প্রাণকেন্দ্র এখানে।

শ্রমিক-মালিক অথবা কর্মচারী-মালিক প্রধানতঃ এই দুইটি শ্রেণীর অস্তিত্ব নিয়ে আজকের সমাজ বেশী সোচ্চার, তাই সমাজ কর্তাদের দৃষ্টির বেশীটাই থাকে এদিকে নিবদ্ধ। যদিও এঁরাই সমাজের সবটুকু নয় এবং সর্বত্র এঁদের ভিতর স্বার্থ সংঘাতের হেতুও নেই। মালিক কৃষক বেশী ক্ষেত্রে নিজেই শ্রমিক এবং তাঁতি, ধোপা, কামার, কুমোর গোয়ালা প্রভৃতিও তাই। এঁদের কারো ক্ষেত্রেই শ্রমিক-মালিক স্বার্থ-ঘটিত সংঘাতের হেতু নেই এবং এমন আরও বহু বৃত্তিজীবীই আছেন এঁদের দলে। অথচ এঁরা কেউই আজকের এই ট্রেডইউনিয়ন মার্কা দ্বন্দ্বের কবল থেকে মুক্ত নয়। অন্ততঃ সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির অংশ এঁদের নিতে হয়,—'বন্ধ' 'ধর্মঘট' এর জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। স্থায়ী চাকুরীজীবীরা বরং আর্থিক ক্ষতির আশংকামুক্ত থেকে অন্য আর এক দিনের পরিবর্তে ঐ দিনটিতে একটি আমেজি ছুটির মহড়া দিতে পারেন। কিন্তু দিনমজুর, ছোট ব্যবসায়ী এবং পূর্বোক্ত বৃত্তিজীবীরা নিষ্ফলা দিনের বেদনা ছাড়া আর যা পান সে অভাবের তীব্র আর একটু জ্বালা। কিন্তু এঁদের কথা থাক। ট্রেডইউনিয়ন আসরে এঁরা অপাঙক্তেয়। বরং যাঁরা এখানে আমন্ত্রিত তাঁদের অবস্থাটাই একটু দেখা যাক্। তবে এখানেও ত প্রায়ই দেখা যায় ভূরিভোজের আশ্বাসটা কেবল আশ্বাসেই নিঃশেষ হচ্ছে, ভুল অক্ষম অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য পরিকল্পিত নেতৃত্বে বহু শ্রমিক কর্মচারীর চরম সর্বনাশ ঘটে যাচ্ছে আর এরই ভিতর অন্য একটি পক্ষ আড়ালে যেয়ে হয়ত বা একটুখানি তৃপ্তির নিঃশ্বাসও ফেলছেন। এর একটি নজির হয়ত ভারতে ১৯৭৪ সালের রেল ধর্মঘট। সমগ্র দেশ দিয়েছে এর জন্য নাকি ৬ শ' কোটি টাকা গচ্চা, শ্রমিক-কর্মচারীরা দিয়েছেন ও দিচ্ছেন চোখের জল, কিন্তু কারো কারো চোখে কিছু হাসিও ঝরেছে।

কিন্তু 'শ্রমিক-কর্মচারীর চরম আকাঙ্ক্ষা কী এবং কোথায় এর চূড়ান্ত পরিণতি?' এই প্রশ্ন যদি কেউ করেন তবে প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মচারীকেই হয়ত বলতে হবে, 'মালিকানায় অংশ তার চরম লক্ষ্য এবং এই অংশ লাভই এর শেষ পরিণতি।'

সম্ভবত এটাই সঠিক উত্তর। এ ভিন্ন আর কোন উত্তরকেই

সুচিন্তিত বা যুক্তিযুক্ত বলা চলে না। কারণ শ্রমিক-কর্মচারীর সুনিশ্চিত স্থায়ী উন্নতি, ভবিষ্যৎ বংশধরদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং চূড়ান্ত গতিশীল ও উৎপাদনক্ষম একটি পরিপূর্ণ সুস্থ আর সমৃদ্ধ সমাজের পক্ষে সর্বস্তরের সকল কর্মীর মালিকানায় অংশ লাভই হোল একমাত্র পথ। মানুষ মাত্রই চায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা। নিজের এবং বংশধর উভয়ের জন্যই তার সমগ্র চেষ্টা থাকে এদিকে নিবদ্ধ। আর শ্রমিক-কর্মচারী এবং মালিকদের ভিতর এই নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রভেদটাও সকলের দৃষ্টিপথে থাকে। কাজেই 'মালিকানায় অংশ লাভ যুক্তিগ্রাহ্য নয়' একথা অপরে কষ্ট করে না বুঝালে কেউ বিশ্বাস করতে পারেন না।

অথচ কোন ট্রেডইউনিয়ন নেতা কি এ কথা বলবেন? আন্দোলন করবেন মালিকানায় অংশ লাভের দাবী নিয়ে? আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, কেউই তা করবেন না। অন্ততঃ আজ অবধি কেউ তা করেন নি। কিন্তু কেন?

করেন নি, আদিতে এ-দাবী সম্ভব ছিল না। এ-চেতনাও হয়ত জাগে নি। তবে আজ এতে বাধা নেই। দাবীর শক্তি আর অধিকারও আছে। কিন্তু আদত ঘটনা ত এ নয় এবং দাবী শুধু শ্রমিক-কর্মচারীকে ঘিরেও নয়, যাঁদের নির্দেশে দাবীর গোড়াপত্তন এবং সে-দাবী সহজেই আন্দোলনের রূপ পায় তাঁরা প্রায় সকলেই রাজনীতির ব্যাপারী। প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা জড়িত নয় তাঁরাও অভিলাষী রাজনীতির প্রভাবে আবদ্ধ। দাবী সামনে রেখে এঁরা সকলেই চান শ্রমিক-কর্মচারীদের সেই অভিলাষের সার্থক মাঝি করতে। এর ভিতর কারো অভিলাষ রাজ্যপাট, কারো ওই ক্ষমতাকে প্রভাবিত করা, আবার কারো বা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিপত্তি ও তার বাঞ্ছিত ফল। রাজতন্ত্রের পরবর্তী তন্ত্রগুলিতে ট্রেডইউনিয়ন নেতারা বেশী খাতির পাচ্ছেন 'প্রগতির প্রভাবে' এ-কথা যতটা সত্য তার বহু গুণ বেশী সত্য বোধ হয় এই যে, রাষ্ট্রকর্তারা বুঝে গেছেন, শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন তথা সঙ্গী বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের এই সংগঠিত শক্তিকে চটিয়ে ক্ষমতার ইমেজ নিরাপদ রাখা যাবে না।

কিন্তু শ্রমিক-কর্মচারী সকলেই যদি মালিকানায় অংশ পান তবে তার পরিণতি হবে ট্রেড ইউনিয়নের অপমৃত্যু। কারণ মালিকানার অংশ অর্থে মালিকশ্রেণীভুক্ত হওয়া। আর কোন প্রতিষ্ঠানে সকলেই যদি মালিক হন অর্থাৎ, শ্রমিক-কর্মচারী অর্থে ও চরিত্রে কেউ ব্যক্ত না হন তবে স্বভাবতই সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের কর্তৃত্ব শুধু নয়, কোন অস্তিত্বই এর থাকতে পারে না। রাষ্ট্রকর্তাদের ইমেজ হারাবার ভয় থাকে না এবং একে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত বা রাজনীতিগত উদ্দেশ্যও অকেজো হয়ে পড়ে। সুতরাং খুব সহজ যুক্তিতেই ধরা পড়ে, কোন ট্রেডইউনিয়ন নেতা, তিনি যত বড় শ্রমিকদরদীই হোন, মালিকানায় অংশ দাবী করতে কিংবা অন্য কেউ করলেও এই দাবী আদায়ের লক্ষ্য অবধি নেতৃত্ব দিতে পারেন না। আদতে এমন একটি দাবীর প্রতি তাঁর সমর্থন থাকাই সম্ভব নয়। এ গেল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এক দিক।

কিন্তু আরও একটু সন্ধান করলে দেখা যাবে, শ্রমিক-কর্মচারী সমস্যার স্থায়ী কোন সমাধানই এঁদের কাম্য হতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে এঁরা নিজেরাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েন। যদিও কোন শ্রমিক-কর্মচারীই ব্যাপারটিকে ঠিক এভাবে দেখতে অভ্যস্ত নয়। 'সমস্যা সৃষ্টি অথবা জটিল হলে তবেই যে তাদের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বাড়ে' ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের এই সদা সতর্ক আত্মমূল্যবোধটাই সহজে কারো দৃষ্টিতে আসে না। এ-অবকাশও অবশ্য কারো থাকে না। নিত্য নতুন দাবীর পাশে 'শ্রমিক-কর্মচারীরা শোষিত' এবং 'মালিকরা অকৃতজ্ঞ ও অবিবেচক কাজেই তাঁরা শোষক' (এর সঙ্গে বুর্জোয়া শব্দকে কেন্দ্র করে যেসব বিপ্লবী ভাষা উচ্চারণ হয় খাঁটি বিপ্লবী চেতনা না থাকলে জিবে তা জড়িয়ে যাবে) প্রভৃতি বক্তব্য এত জোরালো কণ্ঠে নেতারা বলতে থাকেন যে অন্য চিন্তা সেখানে ঘেঁষতেই পারে না। কর্মপ্রদানকারী মালিকের সব বক্তব্যই 'উদ্দেশ্য প্রণোদিত' বা 'গণস্বার্থক্ষুণ্ণকর' মনে হয়। আর শ্রমিক-কর্মচারীর এই মানসিকতাই হোল ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের পাকা সনদ। অবশ্য সব নেতাই এ-মনোভাব জাগিয়ে দিতে পারেন না এবং শুধু তথ্যের

উপর নির্ভর করলেও এ-মনোভাব সকলের জাগে না। এর জন্য বেশ কিছু কসরতের প্রয়োজন থাকে। কিন্তু একবার এটা জেগে উঠলে তখন আর মনেই পড়েনা 'বিরুদ্ধেও বলার কিছু থাকতে পারে।' কিংবা বিকল্প আর কিছু থাকাও সম্ভব। অনেকের এ-চেতনাও লুপ্ত হয়ে যায় যে, মালিকপক্ষ রস কিছুটা নিংড়ে নিলেও যে-রসে তাঁরা বেঁচে আছেন ও পুষ্ট হচ্ছেন তার গোড়াপত্তন শুধু নয়, তার অস্তিত্বের মূলেও আছেন সেই মালিকরাই। অন্যদিকে বহু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কেবল শ্রমিক রসে বেঁচে থাকেন তাই নয়, তাঁর উত্তরপুরুষদের বাঁচার ব্যবস্থাটাও বেশ পোক্ত করে ছাড়েন। অনেককেই বলতে শুনেছি 'এদেশেই এমন অনেক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আছেন যাঁদের প্রকাশ্য কোন আয় নেই, ছিলও না কোন দিন, অথচ আজ তাঁরা প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী।'

ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এটা বোধহয় স্বর্ণযুগ, কিন্তু কোন মতবাদে বিভ্রান্ত নয় এমন বহু ব্যক্তিই বলছেন, 'এই স্বর্ণযুগে দেশের শ্রমিক-কর্মচারী শ্রেণী সার্বিক বিচারে কেবল পিছিয়ে পড়ার বিদ্যেটাই রপ্ত করতে পেরেছেন, দেশের গতি সঞ্চারে বা তাঁদের উত্তর-পুরুষদের নিরাপত্তার পাঠ নিতে পারেননি। বংশধর কারো চাকরীর আশ্বাসও যে সমাজ বা পরিবারের নিরাপত্তার গ্যারান্টি নয় এই বোধটাই লোপ পেয়েছে। এর মূল দায়িত্ব কার সেটা তর্কের বিষয় হতে পারে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের নামে একদল ঘুঘু রাজনীতিক শ্রমিক-কর্মচারীদের হাতিয়ার করতে না চাইলে দেশের অর্থনীতি এবং কর্মহীনতার পরিস্থিতি হয়ত বা এতটা দুর্বিসহ হয়ে উঠত না। কারণ এদেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের যত ক্রটিই থাক, কিন্তু অন্য কারো দুঃখ অস্বীকার করার চেতনা ছিল না। অথচ আজকের অবস্থা যে অনেকটাই পালটে গেছে এ-কথা অস্বীকার করা শক্ত। এটা রাজনৈতিক চেতনা, না চেতনাকেই রাজনীতির পায়ে বলি দেওয়া সাধারণ মানুষের বর্তমান অবস্থাতেই সে-প্রশ্নের উত্তর আছে।

ভারতের মত অনগ্রসর গণতান্ত্রিক দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটি বড় শরিক মার্ক্স ভক্তরা। এঁরা অন্তত তাই

বলতে চান। কিন্তু শ্রমিক-কর্মচারীর এই সকল দরদী বন্ধুরা অন্যত্র যে-আন্দোলন করছেন তার প্রধান উদ্দেশ্য হয় যদি শ্রমিক-কর্মচারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা তবে কমিউনিস্ট সমাজে কোন শ্রমিক-কর্মচারীই শুধু মজুরী নির্ভর হয়ে থাকতেন না, প্রত্যেকেই মূলধন, লভ্যাংশ এবং কর্তৃত্বের অংশীদার হয়ে উঠতেন। কারণ আত্মপ্রতিষ্ঠা কেবল আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে হয় না—যদিও এই স্বাচ্ছন্দ্যও নাকি এখন অবধি এঁদের কল্পলোকে—আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয় আত্মনির্ভরতায়। চিন্তা, কর্ম ও কর্মফল আহরণে তাঁর আত্মকর্তৃত্বে। এই কর্তৃত্বই সমাজে তাঁর আত্মসত্তার স্বীকৃতি। আর এটা যেখানে নেই সেখানে মানুষের অস্তিত্বই হয়ে পড়ে অর্থহীন। মানুষ এখানে সম্পূর্ণ বিকসিত হতে বা জীবনের মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এটা বিশ্বাস করা শক্ত। একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের যেটা মৌল উপাদান তারই উপস্থিতি হয় অনিশ্চিত। অথচ ওখানকার ট্রেড ইউনিয়নগুলির এতে কোন উদ্বেগ আছে তার প্রমাণ নেই। তাঁরা বরং এমন পথ ধরেছেন বা ধরতে বাধ্য হয়েছেন, যার প্রধান লক্ষ্য শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থের সমগ্র বিষয়টি মালিক পক্ষ তথা সরকারী কর্তাব্যক্তিদের প্রতিবাদহীন মর্জিতেই চলতে পারে

কমিউনিস্ট সমাজের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে অনেকে বলেন, 'সরকার নিযুক্ত এজেন্সী।' কারণ উৎপাদন বণ্টন, নির্মাণ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই এঁদের প্রধান কাজ সাহায্য করা ও গতি বাড়ানো। সর্ব ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখা এবং গুণগত ও পরিমাণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রতিই এঁদের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়। এটা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। কারণ দেশের সার্বিক কল্যাণে এ ভিন্ন পথ নেই। এই সঙ্গে শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্যও কিছু কিছু সুপারিশ এঁরা করতে পারেন। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের যা প্রধান কর্তব্য হিসেবে অন্যত্র প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ, শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ন্যায্য মজুরী ও অন্যান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার আদায় করা, সেই দাবী নিয়ে কেউ এখানে সোচ্চার হতে পারেন না। এখানে রাষ্ট্রকর্তাদের মর্জিই শেষ কথা। এ নিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের ভিতর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে

ট্রেড ইউনিয়ন পাণ্ডাদের অবশ্যই সরকারী নির্দেশের সামিল হতে হয়। নিজেদের বিশেষ অধিকারই শুধু নয়, অস্তিত্ব বজায় রাখতেও এ ভিন্ন পথ নেই। কারণ এসব ক্ষেত্রে সামান্যতম বিরোধীতার অর্থ 'রাষ্ট্রদ্রোহ'। তবে এমন অবস্থা সাধারণত দেখা দেয় না। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাও এখানে বুদ্ধিমান ও সতর্ক। উপরন্তু শ্রমিক-কর্মচারীদের বিরূপতাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বা 'বুর্জোয়া ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রকর্তারাই যেমন দমন করেন, সেই সঙ্গে একই যুক্তিদ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদেরও মুখরক্ষা করতে সাহায্য করে থাকেন।

দলাধীন সমাজতন্ত্রের মহিমাই এই যে কিঞ্চিৎ শ্রম মূল্যেই তার তামাম শ্রমিককুল মালিক বনে যান। আর এও তাঁদের বুঝতে হয় যে, তাঁরাই সে-সমাজের ভাগ্যবিধাতা। যেন যাত্রা আসরের রাজাধিরাজ। যদিও অনেকের মুখেই প্রকাশ পেয়ে থাকে 'দুনিয়ার ধোঁকার বাজারে এই কৌশলটাই আজ মধ্যমণি। 'শ্রম যাঁর সেই মালিক' এই শ্লোগানও কিছু মজুরী ঠেকিয়ে দিব্যি চলে যেতে পারে। অন্যত্র শ্রম মজুরীর সঙ্গে মালিকরা একাত্ম হতে পারেন না, কিন্তু এখানে মজুরী ও মালিক একাত্ম।'

কিন্তু আমি হয়ত আলোচ্য প্রশ্ন থেকে একটু দূরে সরে গেছি। আমার মূল প্রশ্ন ছিল, সমাজতন্ত্রে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন—অপরিহার্য বা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য কি না ?

মনে হয় এর উত্তর খুব সহজ ভাবেই দেওয়া যায়,—না। কারণ প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল কথাই হোল শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধের অবসান। অথবা বলা চলে, শ্রমিক ও মালিক একই সম্বন্ধযুক্ত অস্তিত্ব। শ্রম যাঁর তিনিই মালিক বা মালিক যিনি তিনিও শ্রমিক। অর্থাৎ অন্য আর কারো অধিকার বা কর্তৃত্ব যেখানে নেই। সুতরাং দ্বন্দ্বের আশংকাও নেই। দ্বন্দ্বের উৎপত্তি এবং তা মীমাংসার প্রশ্ন সেখানেই দেখা দিতে পারে যেখানে একাধিক স্বার্থসন্ধানী শক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং সেই ভিন্ন শ্রেণী স্বার্থের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয় অথবা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু শ্রমিক ও মালিক এই দুটি শ্রেণীই যদি না থাকে কিংবা এঁরা যে সংজ্ঞায়ই ব্যক্ত হোন তার

পরিচয় যদি একটিই থাকে এবং তাদের স্বার্থ ও কর্তৃত্বও ভিন্ন না হয়ে অভিন্ন হয়, অর্থাৎ মাত্র একটিই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণী বা পক্ষের অবস্থিতি যদি সমাজ অপরিহার্য করে নেয় তবে সেখানে দ্বন্দ্বের কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। এর আবির্ভাবও কল্পনা করা যায় না। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের উদ্দেশ্যই দুটি পরস্পর বিরোধী স্বার্থের ভিতর একটি যুক্তি-গ্রাহ্য সমন্বয় সাধন করা। শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থে এবং তাঁদের দ্বারা গঠিত হলেও এর ভূমিকা অনেকটা তৃতীয় পক্ষের মত। আর এ যদি না হোত তবে বাইরের রাজনৈতিক নেতা বা অন্য কারোই নাক গলাবার অবকাশ থাকত না। কিন্তু যে-সমাজে দু'টি পক্ষেরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হচ্ছে না সেখানে তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন কোথায়?

আমরা প্রায়ই শুনতে পাই, এদেশ সেদেশে সব দেশের কমরেডরাই বলছেন, 'কোন কমিউনিস্ট সমাজেই মালিক সংজ্ঞায় ব্যক্ত হওয়ার মত দ্বিতীয় আর একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই।' কিন্তু কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের ব্যক্ত তথ্য থেকে কি এর প্রমাণ মেলে? বিশেষ করে তথাকার ট্রেড ইউনিয়নগুলির অবস্থিতি ও ভূমিকা থেকে? 'অন্য কোন মালিক নেই', এই বক্তব্যের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের সংগতি ঘটাতে গেলে বরং ওই যুক্তিটাই আরও হাস্যকর হয়ে পড়ে। আসল কথা, ব্যক্তি মালিকের অস্তিত্ব নস্যাৎ করার শক্তি থেকে এসেছে 'মালিক নেই' এই তাত্ত্বিক যুক্তি। কিন্তু রাষ্ট্রমালিক তথা রাষ্ট্রকর্তা ও আমলা মালিকের চরিত্র অন্য মালিক থেকে পৃথক নয় বলেই প্রয়োজন ঘটেছে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের। ট্রেড ইউনিয়ন না হয়ে এর চরিত্রের আলাদা সংজ্ঞা থাকলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ধনবাদী সমাজের শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধের মত এখানকার শ্রমিক-রাষ্ট্রমালিক সম্বন্ধের ভিতর একটা দূরত্বের প্রাচীর না থাকলে এই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের আদৌ কোন প্রয়োজন ঘটত না।

আরও সঠিকভাবে বললে বলতে হয়, সকলের স্বার্থ যদি সমান হয় এবং সমানভাবেই তা বিবেচিত হয়, আর বিবেচনার অধিকারও যদি থাকে নিজেদেরই জিম্মায়, তবে সেখানে এ-জাতীয় কোন বিবাদ থাকা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সেই বিবাদ মীমাংসার যুক্তিতে আর

একটি শক্তির উপস্থিতিও হয় অসম্ভব। ভিন্ন স্বার্থ না থেকে সকলের স্বার্থটা অভিন্ন হলে কোন যুক্তিতেই একে সম্ভব করা চলে না।

জাতীয় সংহতি ও তার তথ্যগত সংগতি

সমাজতন্ত্রীদের উদ্দেশে জর্জ বার্ণাডশ'. একস্থানে বলেছিলেন, 'অন্য কোন পরিকল্পনাই কার্যকর হবে না এবং একমাত্র সেইটিই হবে সন্তোষজনক পরিকল্পনা, যেখানে ব্যক্তি, বয়স, কর্ম ও পিতৃপরিচয় নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষই হবে সমাজের সমান অংশীদার।'

জাতীয় সংহতির প্রকৃত চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হলে এবং কোন দেশের সমগ্র অধিবাসীকে স্থায়ী সংহতির সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করতে হলে জর্জ শ'য়ের এই উক্তিকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতেই হবে এবং এর সঠিক ভাবমূর্তিকে সর্বস্তরে আরও স্পষ্ট করে তার ফললাভ করতে হলে এও মেনে নিতে হবে যে, এর জন্য দেশের সমগ্র বিষয়-বস্তুর বিলি-ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা চাই যার সঙ্গে প্রতিটি দেশবাসীরই থাকবে সক্রিয় সংযোগ, থাকবে সমস্বত্ব ও কর্তৃত্ব।

কিন্তু দেশের সকল মানুষকে এই স্বত্ব ও কর্তৃত্ব দিতে গেলে সমাজে শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার সমগ্র যন্ত্রটিই ভেঙ্গে পড়ে। ভেঙ্গে পড়ে শ্রেণী বিশেষের নেতৃত্ব ও প্রভুত্বের সৌধ। যাঁরা চিরকালই অপরের শ্রমফলে পুষ্ট এবং যাঁরা এঁদের পুষ্ট রাখার অধিকার থেকেই কেবল পুষ্ট হন ও কর্তৃত্ব করার শক্তি পান তাঁরা কিছুতেই এ-ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেন না। অথচ এই শ্রমফল ও কর্তৃত্ব বণ্টনের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে প্রতিটি জাতির সংহতির-মূল প্রশ্নটি।

জাতি হিসেবে কে কতটা সবল বা দুর্বল তার সঙ্গে সে-জাতির সংহতির সম্বন্ধ অবশ্যই কিছুটা আছে। তবে এটা শেষ কথা নয়। কোন জাতি যথেষ্ট সবল হওয়া সত্ত্বেও অসংহতির প্রকাশও দেখা যায়। সাধারণ মানুষের চোখে এটা বিস্ময়কর, কিন্তু যে-প্রভাবশালী শ্রেণীর কর্তৃত্বে সমাজ চলে তাঁরা জানেন, অসংহতির সকল উৎস বন্ধ হলে এ-সমাজের ভিতই নড়ে যাবে যেটা তাঁদের আদৌ অভিপ্রেত

নয়। কোন জাতির সমগ্র শক্তি সমবেত হয়ে প্রত্যেকের অধিকার আদায়ের সন্ধান দিক সেটাও এঁদের কাম্য হতে পারে না। উৎপাদন, দেশরক্ষা এবং বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার প্রয়োজনে যতটা সংহতি প্রয়োজন ঠিক ততটাই এঁরা আশা করেন। চেষ্টাও থাকে, সাধারণ মানুষের সংহতির শক্তি যেন এর বেশী না এগোবার প্রয়োজন বোধ করে। অতএব এঁদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংহতি কোথাও দানা বাঁধবে এ-ধারণাই ভুল।

এ-ব্যাপারে কমিউনিস্ট সমাজের চিত্রটা দৃশ্যতঃ একটু ভিন্ন। অন্য পাঁচটি বিষয়ের মত এখানেও তাঁরা জুতসই একটি সমাধান সূত্র পেয়েছেন। যদিও মূল সূত্রটা সেই তাত্ত্বিক আশ্বাস। তবে এ-ক্ষেত্রে একটু বীররসের মিশ্রণই অতিরিক্ত। জানি মন্তব্যটা কিছু মানুষের কাছে পীড়াদায়ক। কিন্তু কোন অনুষ্ঠানবিরোধী আশংকা যদি বল-প্রয়োগের আবশ্যকতা অবধি পৌঁছে তবে তাকে দর্শকবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন বা সফল উদ্যোগের নিদর্শন মনে করা শক্ত। বরং এর বাহ্যিক বাহবাটুকু যে ওই বল প্রয়োগের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনারই প্রতিক্রিয়া, এ-ধারণায় আসা অনেক সহজ। আসলে অদৃশ্য ঈশ্বরের মূর্তিটা শুধু কল্পনাই করা যায় এবং প্রত্যেকে তাঁর কল্পনা দ্বারাই এ-মূর্তি গড়েন। এটা যাঁরা পারেন না তাঁদের অবস্থা অনেকটা অক্ষম অকমিউনিস্টদের মত। তবে এও ত অনেকে বলেন, 'কোন সমাজ যদি তার সকল মানুষের মতামত ও কর্তৃত্বনির্ভর না হয়, অথবা সকলের আত্মীক সত্তার অবাধ প্রকাশ অসম্ভব হয়, তবে সে-সমাজে সংহতি শব্দটাই হয় বন্ধ্যা।' সহজ কথায়, কোনকিছু অনুসন্ধানের চেতনাই জনগণের লুপ্ত হয়ে যায়। এটাই কি সংহতির মূল সূত্র?

অবশ্য সঠিক অর্থে এই ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি কোন সমাজেই নেই। যাকে গণতন্ত্র বলে চালানো হচ্ছে সেখানেও এ-সত্তার স্বীকৃতি খুব সীমিত। তবে এই অস্বীকৃতির উপায়টা ভিন্ন এবং এর ভিতর উন্নত দেশগুলিতে বেশ কিছুটা উদার। এর সঙ্গে সংহতির সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ নয়, বরং এই শেষোক্ত দেশগুলি তাঁদের জাতীয় সংহতির প্রশ্নকে যে অনেকটা সহ্যসীমা স্তরে উন্নীত করতে পেরেছেন এবং জনগণের

সহযোগীতার ক্ষেত্রও প্রশস্ত হয়েছে তার মূল কারণ যথেষ্ট বৈষয়িক অগ্রগতি। অথবা বলা চলে, বশম্বদ সহ সমাজকর্তাদের উপচে পড়া ভোগাবশিষ্টের প্রাচুর্যেই জনগণ আত্মতৃপ্ত বলে অসংহতির বাইরের প্রকাশটা নিত্যই অশালীন স্তরে পৌঁছে না। আসলে এও হয়ত এক তামাসা। প্রাচুর্য (?) বঞ্চনার প্রকৃত চেহারাটা ফিকে করে দিয়েছে, অথবা বাইরের জৌলুস ভিতরের সত্যকে ঢাকা দিতে পেরেছে তাই প্রশ্নকারীর আত্মমূল্যবোধটাও কিঞ্চিৎ চাপা পড়েছে। প্রাচুর্য যে-জাতীয় সংহতির একটি বাহ্যিক অবলম্বন এটা তার প্রমাণ। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, প্রাচুর্য যেখানে ব্যক্তি মূল্যের মাপকাঠিতে সার্বজনীন এবং সার্বিক কর্তৃত্বে তা নিয়ন্ত্রিত কেবল সেখানেই এটা ভিত্তি হতে পারে। আর এ যদি না হোত তবে সমৃদ্ধ দেশের জনগণের ভিতর পরস্পর সংঘাত, সংঘর্ষ বা বিদ্বেষ প্রায় অদৃশ্যই থেকে যেত।

কিন্তু এদিক থেকে অনুন্নত দেশগুলির অবস্থাই হয়ত সব থেকে কাহিল। বিশেষ করে ভারতের মত জনবহুল এবং বহু ভাষা ও সম্প্রদায় অধ্যুষিত দেশে জাতীয় ঐক্যের ধারণা যে প্রায় ধোঁয়াটে অবস্থায়ই রয়েছে এর প্রমাণ সর্বত্র। অন্তত যতটা গুরুত্ব এর প্রাপ্য ছিল তার শত ভাগের এক ভাগও বোধহয় পায়নি। পরাধীনতার গ্লানি থেকে যে-ঐক্য বা সংহতি একদিন গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষিত চেতনা তাকে কিছুমাত্র সমৃদ্ধ করতে পারেনি, বরং সংহার যথেষ্টই করেছে। করেছে, কারণ ভিতেই এর ফাটল ছিল। আর তাইত স্বাধীনতার শুভ লগ্নেই 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হায়' বলার লোক জুটেছিল এবং তা কান পেতে শুনবার লোকও কিছু ভিড়েছিল। সংখ্যায় এরা হয়ত বেশী ছিল না, কিন্তু প্রতিবাদের ঝড়ও ত ওঠেনি। প্রতিষেধক না থাকলে বিষের ক্রিয়া বন্ধ হবে এ-ধারণা কাজেই অর্থহীন।

ভারতবাসী তার বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা পেয়েছে ঠিক। কিন্তু এর মর্ম উপলব্ধির শক্তি কোথায়? কোথায় তা গড়ে তোলার আয়োজন? শক্তি জন্মলগ্নে যেটুকু বা ছিল আজ তাই কী আছে? থাকলে শাসনক্ষমতা-লোলুপ ব্যক্তিরা প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা,

ভাষা আর সব শেষে স্বাতন্ত্র্যতার দাবী তুলতে কিংবা এই দাবীর সপক্ষে প্ররোচনা দিয়ে সাধারণ মানুষকে এতটা বিভ্রান্ত করতে পারতেন না। এর অখণ্ডতা নিয়ে ত বটেই, অন্য বিষয়গুলি নিয়েও কেউ নতুন সমস্যা সৃষ্টির পথ মাড়াতেন না। অথচ সকলেই জানেন, অনৈক্য আর অসংহতি এই প্রায় সমার্থবোধক শব্দ দুটি সমাজের উপর প্রভুত্ব করার সুযোগ পেলে—অর্থাৎ এর অনুরাগীরা প্রভাব বিস্তারের পথ পেলে একটি শক্তিশালী জাতিকেও যেকোন মুহূর্তে ধ্বংসের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে। ভারত যে বারে বারে বিদেশী শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত, পরাজিত অথবা পরাধীন হয়েছে তার মূলেও ছিল এই অনৈক্য বা অসংহতি। শুধুমাত্র সামরিক শক্তির প্রভাবে কারো পক্ষেই হয়ত ভারতবাসীকে পরাভূত করা সম্ভব হোত না, যদি না এর পিছনে থাকত শ্রেণীবিশেষের লোলুপ স্বার্থপরতা, প্রলোভন তাড়নায় কিছু বিবেকহীন মানুষের বিদেশী শক্তির সঙ্গে গোপন সহযোগীতা এবং অক্ষম শাসন-ব্যবস্থার পরিণতি থেকে এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষের অসন্তুষ্টিজনিত নির্লিপ্ততা।

এর হেতুও অবশ্য ছিল। শাসকশ্রেণীর অবিবেচনা আর অব্যবস্থা যত না ছিল তার বহু গুণ বেশী ছিল সেখানে আত্ম-স্বাতন্ত্র্যতা ও হৃদয়হীনতা, মূলতঃ যেটা সাধারণ মানুষদের ওই পথ গ্রহণে প্রভাবিত করেছিল। সেদিনের রাজা বাদশাহ ও তাঁদের প্রিয়-পাত্ররা নিজেদের ভোগের পাত্র পূর্ণ করতে অধিবাসীদের যতটা পীড়ন করেছেন তাদের প্রয়োজনের গুরুত্ব তার সিকিভাগও উপলব্ধি করেননি। আর এই মানসিকতাই এনে দিয়েছিল ওই পরিণতি। এ সব তথ্য দেশবাসীর অজানা নয়। চরিত্র অজানা নয় বর্তমান ক্ষমতাবিলাসীদেরও। কিন্তু ওই গ্লানি মুছে ফেলার পরও যদি এ-দেশবাসী আত্মসচেতন তথা তার সংহতি সচেতন না হতে পারে এবং একই উপসর্গ দমনের শক্তি না পায় তবে বুঝতে হবে, মাঝে কয়েক শতক লুপ্ত হলেও জাতির চরিত্রে সেদিনের সেই লজ্জাকর প্রবৃত্তিগুলি আজও ঠিক তেমনটিই প্রবাহিত রয়েছে। সংহতি কোন জাতিরই ফরমাস দিয়ে বা ফরমাস জারি করে হয় না। হওয়া সম্ভবও নয়।

এর আবির্ভাব ও স্থিতির স্থান অন্তরে। প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠার পরিবেশ পেলে তবেই এর আগমন ও বিকাশ ঘটে, ধীরে ধীরে স্থায়িত্ব আসে এবং জাতির দাবী মেটে। সাময়িক প্রয়োজনের উত্তেজনায় অথবা আসুরিক শক্তির প্রভাবে কোন জাতি তার সংহতির সাক্ষাৎ কিছুটা পেলেও তার স্থায়িত্ব হয় সাময়িক। প্রভাবে থাকে সংশয়। কথার প্রলেপ বা দমন শক্তির চাপ এর কোন আবরণেই ভিতরকার তাপ প্রবাহ দীর্ঘ দিন ঢাকা থাকে না; যে কোন মুহূর্তেই আত্মপ্রকাশ করে সমাজদেহের শান্তি ঝল্‌সে দিতে পারে। দিয়েও থাকে তাই। প্রয়োজন সার্বিক অন্তর স্পর্শ করার সুযোগ না পেলে সে-বস্তু কোনকালেই যে জাতীয় সংহতির দ্যোতক হয়ে ওঠে না বর্তমান ভারতই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

জাতীয় সংহতির প্রকৃত যে রূপ একজন খাটি জাতীয়তাবাদী ও মানব দরদী মানুষ কল্পনায় আঁকেন, পৃথিবীর কোথাও তা গড়ে ওঠেনি। সাময়িক আর আংশিক প্রকাশই এর আছে এবং তার মূল্যও ওইটুকুই। যে দেশ যত উন্নতই হোক এ প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি যে তাদের ভিতর কোন অনৈক্যের প্রকাশ নেই। আসলে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কোন জাতির পক্ষেই একে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থা এবং শ্রেণী শাসন এর প্রধান অন্তরায়। বঞ্চনা, অন্যায়, অবিচার ও ভীতির প্রয়োজনকে নিঃশেষে মুছে ফেলার পরেই আসে ঐক্যের শক্তি। রাষ্ট্র সার্বিক মানুষের কর্তৃত্বনির্ভর না হলে এই শক্তিকে কেউ শ্রদ্ধা করলেও আবাহন করার সুযোগ পায় না। কারণ শ্রেণীনির্ভর শাসন-ব্যবস্থা একে সহ্য করতে পারে না। কথাটা কঠিন, কিন্তু একান্ত সত্য এবং হাজার হাজার বছরের শ্রেণীশাসনের ইতিহাস স্বীকৃত।

রাষ্ট্রকে সমগ্র অধিবাসীর 'অছি' বলা হয়। অন্তত রাজতন্ত্রের পর সমগ্র দলতন্ত্রীদের প্রধান ভাষ্যই এই। কিন্তু রাষ্ট্র তার সমগ্র অধিবাসীর সমস্বার্থরক্ষায় সক্ষম এবং সকলের প্রতি একই ব্যবহার ও বিশ্বাস স্থাপনে কৃতনিশ্চয় এটা প্রমাণ করার মত চরিত্র নিয়ে কোথাও দেখা দেয়নি। বরং এর বিপরীতটাই দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্র

যেদিন তার সকল অধিবাসীর ন্যায়নিষ্ঠ অছি হতে পারবে সেদিন অসংহতির কোন প্রশ্নই আর দেখা দেবে না। কারো অনুযোগের অবকাশও থাকবে না।

জাতির ঐক্য বা সংহতির জন্য সকল রাষ্ট্রকর্তাই কিছু চিন্তিত। যখন যতটা প্রয়োজন তার জন্য সাধ্যমত সতর্কও। বিপদের আশংকা যতক্ষণ থাকে তার গুরুত্বের পরিমাপে সতর্কতা আর গলার জোর বাড়ে। দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেন, কারণ এটা এঁদের কর্তব্য। কিন্তু শুধুই কি কর্তব্য ? কিংবা জাতীয় স্বার্থের দোহাই ?

চীনের ভারত আক্রমণের সময় একমাত্র তখনকার চীন-সুহৃদ কমিউনিস্ট ভিন্ন এদেশের সব নেতাই জাতির ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। ভারত-পাক যুদ্ধের সময়ও এঁরা সরব হয়েছেন। আর কোন জাতিব নিরাপত্তা, অগ্রগতি ও মর্যাদা যে নির্ভর করে সে-জাতির ঐক্যের উপর, এ-বোধ প্রতিটি সুস্থ মানুষেরই আছে। কেউই এ-সম্বন্ধে অজ্ঞ নয়। অনৈক্যের পতাকা তুলে কোন দলপতি না এগোলে দেশবাসী যে ঐক্যবদ্ধই থাকেন এরও প্রমাণ আছে। কিন্তু বিরামহীন উপদেশকারীবা তাঁদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পরিহার করে, অন্ততঃ সংযত করেও কী নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন ? 'আসাম অহমদের' 'বিহার বিহারের', 'উড়িষ্যা উড়িয়াদের' বলে যাঁরা দাবী তুলেছেন তাঁরাও কিন্তু ওই উপদেশকারী আর শাসকগোষ্ঠীরই অন্তর্গত। এরপর অন্যান্য রাজ্য থেকেও যদি একই রব ওঠে তবে পরিণতিটা কোথায় যেয়ে ঠেকবে ? ঐক্য আর সংহতিই বা যাবে কোথায় ? ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যের পর সম্প্রদায়-ভিত্তিক রাজ্যের দাবীও ত অসম্ভব নয় ? খুব স্পষ্ট না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এ-দাবী উঠেওছে ইতিমধ্যে। একটি রাজ্যে ত কেবল মাত্র সম্প্রদায় গরিষ্ঠতার যুক্তিতেই জেলার পত্তন হয়েছে। আর একটি রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল আরও একধাপ এগিয়ে একেবারে আত্মস্বাতন্ত্র্যই দাবী করেছেন। এঁরা তবে কোন ঐক্যের পূজারী ?

বস্তুত দেশের কোন কোন অংশের ক্রিয়াকর্মে অনেকের মনেই হয়ত প্রশ্ন জেগেছে, অতীতের মত কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি

রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে গণ-অভিযোগকে পুঁজি করে অথবা স্বাধীকারের নামে অঞ্চল বিশেষ নিয়ে এক একটি সামন্তরাজ্য সৃষ্টির তালে নেই ত? অবশ্য এঁরাও জাতীয় ঐক্যের কথাই বলছেন এবং এঁদের প্রতিটি কাজে দেশবাসীর সহযোগিতাও চাইছেন। এঁরা অতীব বুদ্ধিমান। কাজেই জনগণের ঐক্য আর সহযোগিতা এযুগে রাজ্যপাট অলঙ্কারের যে অপরিহার্য অবলম্বন এ বোধ এঁদের থাকবে বইকি?

জনসহযোগিতার আবেদন অবশ্য সরকারবিরোধী দলপতিদেরও। সরকারী কর্তারা যে সব ক্ষেত্রে জনসহযোগিতা চান, বিরোধী নেতারা প্রায় সেইসব ক্ষেত্রেই সহযোগিতা চান তার বিরোধীতার জন্য। যেমন 'বন্ধ্ সফল কর' এবং 'বন্ধ প্রতিরোধ কর' বলে এঁরা উভয়েই ভিন্ন অর্থে জনসমর্থন চেয়ে থাকেন। আর গণতন্ত্র জাতীয় কিছু একটা থাকলে বিরোধীদলের বক্তব্য 'গুরুত্বহীন' বললেও নস্যাৎ করা যায় না। যদিও একই বিষয়ে উভয় পক্ষের পরস্পরবিরোধী অনেক আবেদনেই সাধারণ মানুষ হন বিভ্রান্ত। তাঁরা পড়েন বিপদে। তবে এসব সত্বেও সাধারণ মানুষ যথাসাধ্য সরকারী বক্তব্যকেই সমর্থন জানান। আর এদিক থেকে ভারতবাসী যে মোটেই কৃপণ নয় তার প্রমাণও আছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন তার পরেও থাকে, যে-রাজ্য সরকার বলছেন 'রুজী-রোজগারের সুযোগগুলি কেবলমাত্র তাঁর রাজ্যের অধিবাসীর জন্যই রক্ষিত থাকবে, কারণ এ সুযোগ সীমিত'— এবং যার ফলে তথাকার অন্য রাজ্যবাসীর অসহায়তা, নিঃস্বতা বা অনাহার অনিবার্য হয়ে উঠছে, তাঁরাও কি এর জন্য ওই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন? আর এটাই হবে জাতীয় ঐক্যের উপাদান? কিংবা যে-রাজ্য সরকার এই রুজীর সঙ্গেই এর গোড়া ধরে টান দিয়ে অন্যের মাতৃভাষাকেও কবর দিতে চাইছেন সেই সরকারের কাজেও কি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এগিয়ে আসবেন ঐক্য গড়তে? নিজের অনাহার, সম্ভাব্য মৃত্যু বা শিক্ষা সংহারের পরোয়ানা যাঁদের হাতে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সেই সব মানুষই তৎপর হবেন এমন অপূর্ব ধারণা সম্ভবতঃ কেবল এদেশের কোন কর্তাব্যক্তি হলেই

করা যায় এবং কেবল এখানেই এর পরেও জাতীয় ঐক্যের জিগির তুললে কেউ কিছু বলে না। যদিও অনেক অবুঝের অসতর্ক উক্তিও শুনেছি,—'এর চেয়ে বড় তামাসা আর ত কিছু দেখা হয়নি!'

আসলে এর মূলে আছে হয়ত অক্ষম মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর অযোগ্য ব্যক্তির উচ্চাসন অধিকারের অনিবার্যতা। নির্লিপ্ত গণচেতনার সুযোগে এঁরা সমাজের মধ্যমণি হয়ে নিজের অযোগ্যতা আড়াল করতে স্থানীয় বা আংশিক মানুষের স্বার্থের ধুয়ো তুলে বাজিমাত করতে চান। এতবড় একটি দেশের সব দিকে তাকাবার শক্তিই এঁদের নেই। এ-শক্তি থাকলে অঞ্চল বিশেষের স্বার্থ বা শ্রেণীবিশেষের জন্য আলাদা বন্দোবস্তের দাবী তোলার পূর্বে নিজেরই অযোগ্যতার লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে যেতেন। যিনিই হোন, আত্মস্বার্থবোধ আর অক্ষমতা তাঁর নৈতিক চেতনাকে একেবারে পঙ্গু করে না দিলে একটি গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে এ-ধরনের উক্তি আদৌ সম্ভব নয়। এমনিতেই ত এদেশের সাধারণ মানুষের পর্বতপ্রমাণ সমস্যা, কিন্তু স্বাধীনতার পর আঞ্চলিক স্বার্থের নামে নতুন আর এক বিদ্বেষ এসেছে যেন ফাউ। আর দেশটা যেহেতু বৃহৎ এবং বহু ভাষা ও বিভিন্ন সম্প্রদায় অধ্যুষিত, কাজেই বিদ্বেষ সাধক ষড়যন্ত্রকারীদের তীর্থভূমি হতেই বা কতক্ষণ? জাতীয়তাবোধের ভিত পোক্ত থাকলে তবুও বা কথা ছিল। কিন্তু তা যখন নেই এবং অভাবি মানুষ তাঁদের দুর্গতি লাঘবের কার্যকর কোন পথের হদিসও পাচ্ছে না, তখন এর সম্ভাব্য পরিণতি 'প্রতিরোধ করা যাবে' এ ভরসায় যুক্তির প্রভাব কোথায়?

সব কিছুরই একটা অন্তিম কাল আছে। আশ্বাস বা মোহের প্রভাবও অনন্তকাল একইভাবে থাকে না। সার্থক অসার্থক যাই হোক একদিন এর পূর্ণকাল উপস্থিত হয়ই। একদল মানুষকে আর একদল মানুষ অজ্ঞ ভাবতে পারে শক্তির দাপটে। অবজ্ঞাও করতে পারে। কিন্তু সত্য থেকে চিরকালই দূরে রাখতে পারে না। আজই ত অনেকে বুঝতে শিখেছে এবং প্রশ্নও তুলেছে, স্বাধীনতার ২৮ বছর পরেও যারা উপেক্ষিত, বঞ্চিত এবং প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ এর কোন শুভফলের

অংশীদার হতে পেল না, তারা এর পাহাড়প্রমাণ ঋণের দায় বইবে কেন? গাঁয়ের শিশু ও রুগীদের বঞ্চিত করে যে-দুগ্ধ প্রকল্প শুধু তার কর্মচারী আর শহরবাসীকেই পুষ্ট করছে তারও লোকসানের ভাগ তারা নেবে কেন? শহরবাসীর খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, রাস্তাঘাট, যানবাহন প্রভৃতি খাতে রাজস্বের সিংহভাগ নিঃশেষ হবে, কোটি কোটি টাকা ঋণ করেও এঁদের আরাম বাড়াবার ব্যবস্থা হবে, আর তারও দায় নিতে হবে তাদেরই যারা দিনান্তে দুমুঠো অন্নের আশ্বাসও পায় না? কেন?—এ-প্রশ্ন 'অমূলক' বলে চালাতে গেলে কিন্তু সততা আর আন্তরিকতার উপর সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হবে। বিদ্বেষ চেতনাকে আচ্ছন্ন করে তার সরলতাটুকুও গ্রাস করবে। করবেই। তত্ত্বকথার কায়েমী চালাকী চিরকালই চলবে এ-ধারণাই ভুল।

আর প্রশ্ন কী শুধু এদেরই? যে-অগুণতি মানুষ চা-বাগানে, বিভিন্ন জঙ্গলে, কলকারখানায়, হাট-বাজার-স্টেশনে 'কুলী-মজুর' নামে খ্যাত, কিংবা যারা শহুরে বাবুদের কাছে 'ঝাড়ুদার, মেথর, ধাঙ্গড়' (আজকের পোশাকী নাম হরিজন) বলে পরিচিত তাঁরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পুরুষানুক্রমে একই কাজ করে চলেছে তাই নয়, মানুষ হিসেবেও এদের মূল্যটা প্রায় একই স্থানে আবদ্ধ রয়েছে। আইন করে এদের কিছু সুযোগ দেওয়া হয়েছে ঠিক, কিন্তু সেই সুযোগ গ্রহণ করার পরিবেশ কোথায়? কোথায় তার আয়োজন? আয়োজন আছে কেবল রাজনৈতিক মুনাফা আদায়ের। নিশ্ছিদ্র সে-ব্যবস্থা। কিছুই সেখানে গলিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু এরাও পূর্ণাঙ্গ মানুষ। মর্যাদা-বোধ এবং আর পাঁচজনের মত মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রয়োজন এদেরও আছে। শুধু চাকরীর সংখ্যা তত্ত্বে, শিক্ষার নামে কিছু অর্থদানে কিংবা কয়েকটা পাকা বাড়ী বিলিয়ে ত তার মীমাংসা হয় না। আর হয় যে না এ-বোধ এতকাল সুপ্ত থাকলেও আজ এদেরও যে জেগেছে তার লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। হয়ত একদিন এ-বস্তু দ্বিধা সঙ্কোচের গণ্ডী পেরিয়ে অভিযোগের রূপ নিয়েই এগিয়ে আসবে। শুধু আইন থাকলেই যেমন অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না, তেমনি একের প্রয়োজনে কোন

বিশেষ আইন বা সুযোগ অন্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেই। যে যুক্তিতেই হোক, একের জন্য কোন বিশেষ সুযোগ অন্যের ন্যায়বোধ ও কর্মপ্রেরণাকেও নীম্নগামী করে তোলে। মন নিয়ত যুক্তিবিমুখ হতে চায়। হচ্ছেও ঠিক তাই। "অনুন্নত" সংজ্ঞায় সংরক্ষিত সুযোগের প্রায় সবটাই ভোগ করছেন ওই নামে আত্মপরিচয়কারী একদল ফন্দীবাজ ব্যক্তি। এ-অনুযোগ ওঁদেরই সরল অংশের, আর যোগ্যতার মান ? না ! থাক সে কথা ? কিন্তু সহায়-সম্বল-আশ্রয়হীন-অনাহারক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চবর্ণের সন্তানরা উন্নত না অনুন্নত সেও কি একটা প্রশ্ন নয় ?

এ-অসংগতি প্রায় সর্বত্র। 'যুক্তিহীন সমাজ অসহায় ও দুর্বলদের প্রতি দরদ দেখায় কাগজপত্রে। কার্যতঃ যার ফল ভোগ করে অন্যে। এ-দরদ থাকে অনেকের জন্যই। যেমন ফুটপাত, গাছতলা বা উন্মুখ প্রান্তরে যারা ভূমিষ্ঠ হয় এবং সারা জীবন সমাজের আবর্জনা হয়ে ওখানেই একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য হয় তাদের জন্যও ত মাঝে মধ্যে কিছু দরদ ঝরে। অথচ এর মূল্য কতটুকু ? এই বেদনা-সিক্ত জীবনের কতটুকু তথাকথিত সভ্য সমাজ জেনেছে এবং জানতে চেয়েছে ? তবু এরাও কিন্তু মানুষ এবং সমাজের আর পাঁচজনের মতই পূর্ণাঙ্গ মানুষ। সুখ, দুঃখ, বেদনাবোধ এদেরও আছে। আর এ যারা ভুলে যায় বা অস্বীকার করে তারা নিজেদের সভ্য ভাবে গায়ের জোরে অথবা জবর দখল করা সামাজিক সুযোগের অধিকারে। কিন্তু এর জবাবদিহি একদিন করতেই হবে। দিকে দিকে এই সকল অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত আর নির্যাতিত মানুষদের প্রাণের ঠাকুর আজ জেগে উঠেছে। শত-সহস্র অভিযোগ নিয়ে কোটি কোটি অভিযোগকারী মিছিল করে এগিয়ে আসছে।

এরা আসবেই। বিভ্রান্ত করা যাবে না। উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে বা ধমক দিয়ে নিবৃত্ত করা যাবে না। এমন কি কংক্রিটের দেয়াল ঘেরা সর্বাধিক মজবুত স্ট্রং রুমে থেকেও কেউ আত্মরক্ষা করতে পারবে না। কারণ এরা যে মানুষ সে-কথা এরা বুঝতে পেরেছে। সুতরাং একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়, দেশের একটি মানুষকে বাদ দিলেও সংহতির বাঁধন

পোক্ত হবে না। অসংহতির মূল শিকড় তুলতে হলে সম্মিলিত মানুষেরই সমবেত শক্তি চাই।

আমরা দেখতে পেয়েছি, এত যে ঐশ্বর্যশালী দেশ আমেরিকা সেখানেও নিয়ত সমস্যার পাহাড় জমছে। অশান্তির আগুন নানা প্রান্তে জ্বলছে। সাদায় কালোও অসদ্ভাবই কি সেখানে কম? মনের মিলনে ইংরাজ জাতির ভিতরকার ফারাকটাও কারো অবিদিত নয়। আর কমিউনিস্ট দুনিয়ার জনমনের এই জিজ্ঞাসার পথইত রুদ্ধ। কাজেই জাতীয় সংহতির মূল সূত্র যে এই সকল মহামতি রাষ্ট্রও আয়ত্ত করতে পারেনি এটা যেমন একটি সত্য তেমনি এই আয়ত্তের পথ যে কেবল শ্রেণীস্বার্থেই রুদ্ধ রয়েছে এও ততোধিক আর এক সত্য। আদত কথা, জাতীয় সংহতির একটিই মাত্র উপাদান আছে এবং তাও আছে কেবল ব্যক্তিস্বার্থ ও সমিষ্টির স্বার্থের সংহতির ভিতর। এই দুটি স্বার্থ পরস্পর একাত্ম হলে তবেই একটি জাতির ঐক্য সম্পূর্ণ হতে পারে। এর আর কোন বিকল্প নেই।

ধর্মীয় আচরণ ও ন্যায়ধর্ম

মানব চেতনায় ঈশ্বরের আবির্ভাব একটি আকস্মিক ঘটনা, না তার অজ্ঞতা, ভীতি কিংবা বুদ্ধিদীপ্ত উপলব্ধির পরিণতি, অথবা এর একটিও নয় এবং মানুষের কোন অবদানই নেই এতে, সবটাই ঘটেছে ওই ঈশ্বরেরই অপার করুণায় অর্থাৎ, জীবশ্রেষ্ঠ মানুষকে সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্যের সন্ধান দিতে তাঁর অনিবার্য আত্মপ্রকাশেরই তাগিদে; এ-সব নিয়ে প্রশ্ন যদি কারো জাগেও তবে তা জাগতে পারে একমাত্র পণ্ডিতজন-চিত্তে। সাধারণ মানুষের কাছে এ-জাতীয় প্রশ্ন অবান্তর। একেবারেই অচিন্তনীয় ও অপ্রয়োজনীয়। কারণ ঈশ্বর এদের অন্তরে শুধু আবির্ভূতই নয়, তাঁরই করুণাসিক্ত দান হিসেবে অত্যন্ত সুদৃঢ় প্রভাব নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ-মনে কোন সংশয় নেই। নতুন কোন প্রশ্নও নেই। "ঈশ্বরই আদি এবং জীব মাত্রই তাঁর সৃষ্টি, কাজেই 'আবির্ভাবের' প্রশ্ন অবান্তর" আর "জীবের প্রতিটি চেতনার উন্মেষ

ঘটেছে এবং তা নিয়ন্ত্রিতও হচ্ছে ওই ঈশ্বরেরই নির্দেশে সুতরাং 'উপলব্ধি' বা 'বুদ্ধির বিকাশ' এ ধারণাও অজ্ঞতারই নামান্তর"—এই যাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাদের কাছে বিরুদ্ধ যেকোন প্রশ্নই ত আহম্মুকি। সন্দেহ প্রকাশ মানেই অধর্ম।

ধর্ম সম্বন্ধে কারো বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। যুক্তি থেকে এখানে মনের দাবীই বড়। আর নাস্তিক হলেও যুক্তি যাঁরা মানেন তাঁরা স্বীকার করেছেন, এর আর কোন মূল্য যদি নাও থাকে তবু এই চেতনা যে মানুষকে সমাজবন্ধনে আবদ্ধ হতে সব থেকে বেশী সাহায্য করেছিল এতে সন্দেহ নেই। সূচনায় বিচ্ছিন্ন, বিবাদ-লিপ্ত ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ ও পরস্পরের ঘনিষ্ঠ করতে এর অবদান ছিল অপরিসীম। মানুষের ভিতর ন্যায় ও অন্যায় বা সত্য ও অসত্যের একটি সম্ভাব্য চিত্র এঁকে তাদের পাশব প্রবৃত্তি দমনের শক্তি যুগিয়েছিল। কাজেই ঈশ্বর কী, কে এবং মানবমনে কখন ও কীভাবে তার উৎপত্তি সে-তত্ত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষের যেমন নতুন কোন প্রশ্ন নেই, তেমনি যাঁরা এর প্রভাবকে তেমন আমল দিতে সম্মত নয় তাঁরাও এ-অনুমান করেন যে, এ সম্বন্ধে যাঁর যে ধারণাই গড়ে উঠুক, তার সূচনা হয়েছিল মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধতারই কোন এক নিকটবর্তী সময়ে। পরে এর ব্যাপ্তি ঘটেছে এবং বিভিন্ন পরিচয় ও ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হয়েছে।

তবে এসব এখানে বাহ্য। প্রসঙ্গটির মুখ্য বিষয়, আবির্ভাব বা উপলব্ধি যেভাবেই হোক, প্রায় সমগ্র মানুষের কাছে যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং প্রত্যেকের প্রত্যয়, এ বস্তু সার্বিক আর পেতেও চায় সম অধিকারে, কাজেই কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় একে তাঁদের কর্তৃত্বে রাখতে চাইলে সেটা যুক্তিসিদ্ধ হয় কিনা? যদিও যেই হোন, এ বস্তুর বিশেষ একটি পরিচয়ে তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত রাখতে চাইলেও সে-দাবী অসার প্রতিপন্ন হয় যখন তাঁরাই আবার প্রমাণ করতে চান যে 'তিনিই তাবৎ জীবের সৃষ্টি ও রক্ষাকর্তা এবং সমদৃষ্টিই তাঁর ধর্ম।' সুতরাং দাবী যাঁর যাই থাক, তাবৎ জীবের সৃষ্টি ও রক্ষাকর্তা সমদৃষ্টিধর্মী হয়ে আংশিক জীবের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকবেন

এ ধারণা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বরং তিনি সকলকেই যে সমান অধিকার দিয়েছেন এটাই ন্যায়গ্রাহ্য হয়। তবে আসলে এ একটি তর্ক। এটা বাদ দিলে বাকী যা থাকে তার বাহ্যিক প্রকাশমূল্য যতটা অন্তরে উপলব্ধির মূল্য তার বহুগুণ বেশী। বস্তুত এর প্রকৃত মূল্যের সবটাই উপলব্ধিনির্ভর। অনুভব করার শক্তি না থাকলে কিংবা সেই প্রয়োজন বোধ না করলে সম্ভবত এর কিছুমাত্র মূল্য নেই। আর এই উপলব্ধি জাগাতে অপরের উপদেশের যদিওবা কিছুটা মূল্য থাকে কিন্তু কারো এ নিয়ে কর্তৃত্ব করার ন্যায়ত কোন অধিকার নেই। থাকলে অথবা এ-অধিকার ন্যায্য বলে স্বীকার করলে সে-কর্তৃত্ব সত্যকে দলিত বা বিকৃত না করে কখনই প্রয়োগ করতে পারে না।

অবশ্য এ হোল যুক্তির কথা। সত্য উপলব্ধির পরিণতি বা যাকে বলা হয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত। যুক্তি এবং সত্য মেনে চললে তবেই এতে সায় দেওয়া যায়। অথচ দেখা যাচ্ছে, সেই আদিমকাল থেকেই একদল মানুষ এ-সত্য অস্বীকার করে চলেছেন এবং একে তাঁদের কর্তৃত্বে রাখা নয়, উপজীব্য করেও রেখেছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রভাব প্রকাশ করতে বিভিন্ন সময়ে যে-সব ধর্মীয় আচরণ ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মতত্ত্বের পত্তন হয়েছে তাকে হাতিয়ার করে অর্থাৎ, অপরের সেই তাত্ত্বিক অনুভূতিকে পুঁজি করে একদল মানুষ প্রথম থেকেই জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন। শুধু ধর্মগুরু, ধর্ম-প্রচারক, পাণ্ডা, পুরোহিত প্রভৃতির উপজীবিকা অপরের ধর্মবিশ্বাস তা নয়, ধর্মকে রাজনীতির জালে আবদ্ধ করেও একদল মানুষ সুযোগ করে নিয়েছেন আর একদল বা সমগ্র একটি ধর্ম-বিশ্বাসী সম্প্রদায়কেই তাঁবেদার ও দোহন করার। যদিও এই শেষের দলটি আদিতে ছিলেন না, এঁরা এসেছেন পরে এবং প্রধানতঃ রসসন্ধানী ধর্ম ব্যবসায়ীদের মদত দানের মূল্যে। আর ধর্মগুরু, ধর্ম-প্রচারক, পাণ্ডা, পুরোহিতরা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিংবা স্বধর্মের প্রতিষ্ঠা মানসে কোন সময় মাত্রাধিক মাতামাতি করলেও সমগ্র একটি জাতি বা সম্প্রদায়কে হিংসায় মত্ত করতে পারেননি আর পারলেও সে শুধু ব্যতিক্রম। যেমন ফরিশি পুরোহিতদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হয়ে

যীশুশিষ্য জুডাস এক বিরাট কুকীর্তি করেন এবং যার ফলে যীশুখ্রীষ্টের অকাল তিরোধান ও সমগ্র মানব জাতির এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়। যদিও এরও পিছনে ছিল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান স্বার্থ-সন্ধানী এক দুর্বল রাজশক্তি তথা রাজনীতি। কিন্তু ধর্ম যেখানে রাজনীতি আশ্রিত বা রাজনীতিকের আত্মপ্রতিষ্ঠার অস্ত্র, সেখানে ন্যায়নীতি ও মানবতার সকল চিহ্নই প্রায় অন্তর্হিত হয়ে যায়। ইতিহাসে এর বহু নজির আছে। রাজনীতি ধর্মনির্ভর হলে বরং সেক্ষেত্রে তার অকল্যাণ শক্তিই হ্রাস পায়। অশোকের শেষ রাজত্বকাল এর প্রমাণ। কিন্তু ধর্মই যদি রাজনীতি আশ্রিত হয়ে পড়ে তবে তার কল্যাণকর প্রভাব ত' কিছু থাকেই না, রাজনীতিকেও অন্ধ ও যুক্তিহীন করে ছাড়ে। ঔরঙ্গজেব হয়ত এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। ধর্মকে হাতিয়ার করে তিনি ক্ষমতার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন ঠিক, কিন্তু তার নৃশংসতা পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী কাউকেও রেহাই দেয়নি। সেদিন সারা ভারত ব্যাপী এক গর্বীত নিষ্ঠুরতার বিভীষিকা ও মানবরক্তের বন্যা নেমেছিল। এ-দৃষ্টান্ত আরও আছে। বস্তুত ধর্ম যেদিন রাজনীতির স্পর্শ পেয়েছে ধর্মান্ধতার পত্তন না হোক, বিকাশ ঘটেছে এবং নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতাকে সামিল করেছে সেদিনই। রাজনীতি-আশ্রিত ধর্ম শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত স্বার্থের চেতনা জাগায়। প্ররোচনা দেয় বিচ্ছেদের। অর্থাৎ যা একদিন সমগ্র মানুষকে একত্র হওয়ার চেতনা দিয়েছিল, বিভেদ ভুলিয়ে পরস্পরকে এক সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল, রাজনীতির স্পর্শে সেটাই হয়ে ওঠে বিচ্ছেদের মাধ্যম। বিচ্ছেদ রাজনীতির একটি ধর্ম। কিন্তু রাজনীতির স্পর্শে ধর্ম হয়ে ওঠে বিভীষিকাময়। মানুষকে ভীতিবিহ্বল করে এ তার বিজয় ডঙ্কা বাজাতে চায়। ভারতে এই রাজনীতি-আশ্রিত ধর্ম বা ধর্মীয় রাজনীতির শেষ অবদান দেশ বিভাগ। কিন্তু সর্বশেষ কী? খুব ক্ষীণ হলেও একটি কণ্ঠ যেন বারে বারেই বলতে চাইছে—'না না আরোও আছে।'

পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যবঞ্চিত আর ক্ষমতাহীন মানুষই পৃথিবীর বৃহত্তর অংশ। ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ও নির্ভরতাও এঁদেরই বেশী। 'ধর্ম

মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ' এ ধারণা বদ্ধমূল হতে পেরেছে কারণ আর কোন বস্তুই এঁদের সহজলভ্য নয়। কাজেই ধর্ম তথা ঐশ্বরিক ধ্যান ধারণা এঁদের কাছে শুধু মাত্র আচরণীয় বিষয় নয়, দুর্দিনে সান্ত্বনা ও আশ্রয়স্থলও। সব অবিচার, সব ব্যথাকেই সহ্য করে এঁরা এর উপর দায়িত্ব চাপিয়ে। স্বধর্মের অবমাননা কিংবা ধর্মচ্যুতির সম্ভাবনা অনিবার্য হলে তবেই এঁদের এ-চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। সাধারণ মানুষ যে কতটা ধর্মভীরু, শান্ত ও সংবেদনশীল এঁদের স্বাভাবিক সময়ের চরিত্র লক্ষ্য করলে সহজেই তা ধরা পড়ে। অভাব, অশিক্ষা ও অবিচার তীব্র না থাকলে এই মানসিক অবস্থান থেকে এঁদের নাড়ানো বোধ হয় শক্ত হোত। অন্তত কোন রাজনীতিকের পক্ষে তা হোত আরও কঠিন। কাজেই শান্ত পরিবেশ আর সমৃদ্ধ সমাজ যেমন রাজনীতির একটি শত্রু, তেমনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একমাত্র আশ্রয়ই হোল অসুস্থ সমাজ। ধর্ম রাজনীতিআশ্রিত হলে তার স্থান অন্যত্র নিরাপদ হয় না, হয় কেবল এখানে। এও কারো অজানা নয়; কোন সাম্প্রদায়িক দল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত হয়ে ধর্মকে পুরোভাগে রাখলে ঐ সম্প্রদায়ের লাভ যতটা হয় সমগ্র সমাজের ক্ষতি হয় তার বহুগুণ বেশী। এর কারণ ধর্ম এক্ষেত্রে মুখোশ মাত্র, আদতে থাকে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ। আর এই নীচতা চাপা পড়ে কল্পিত এক শত্রুকে উপস্থিত করার কৌশলে।

একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত,—১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর এই মাত্র ৯ মাসে বাংলাদেশে যে ৩০ লক্ষাধিক মানুষ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বীভৎস ভাবে খুন হয়েছিলেন তাঁদের প্রায় সকলে এবং খুনীদেরও সকলেই ছিলেন একই ধর্মী। স্বধর্মীতার বন্ধন এক্ষেত্রে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয়নি। বিবেক কিছুমাত্র বাধা দেয়নি; স্ত্রী-জাতির উপর ইতিহাসের সর্বাধিক বর্বর আর বীভৎস অত্যাচারে, সংখ্যাহীন গৃহদাহ, লুণ্ঠন প্রভৃতি নৃশংস অত্যাচারে। আর আকার-প্রকারে প্রভেদ থাকলেও এটাই কিন্তু নিয়ম এবং একমাত্র ইতিহাস। এর সঙ্গে আকস্মিকতার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই। নিহত আর অত্যাচারিত ওই লক্ষ লক্ষ মানুষই অধার্মিক ছিলেন, কর্মফল বা

ভাগ্যলিপি ওঁদের ওই-ই ছিল কিংবা মৃত্যু বা অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে খোদাতাল্লার কাছে করুণ আবেদন এঁরা করেননি এর একটিও সত্য নয়। কিন্তু তবু এঁরা রক্ষা পাননি। বরং রক্ষা যাঁরা পেয়েছেন এবং প্রায় কোটি সাতেক মানুষকে রক্ষা করতে যাঁরা পেরেছেন তাঁরা অন্য কোন শক্তির মুখাপেক্ষী হন নি; একমাত্র আত্মশক্তিকেই সকল শক্তির আধার বলে জেনেছেন। সম্ভবত এটাই শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি। সঠিক ধর্মও বোধ হয় এই। যে-শক্তি নিজের এবং অপরের অন্যায় দমনে সক্ষম সেটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

পূর্বেই বলেছি, ঈশ্বর আছেন কি নেই কিংবা মানুষের চেতনা ও কর্মের উপর তার প্রভাব কী, কতটা বা কীভাবে ব্যক্ত সে-তথ্য আর তর্ক স্বভাবতই সাধারণ মানুষের কাছে এক অবান্তর বিষয়। ঈশ্বর এদের কাছে জীবন্ত সত্য, চিরন্তন অস্তিত্ব। এখানে দ্বিমত নেই। কিন্তু এই উপলব্ধি যেখানে বাইরের পরিবেশে খাপ খায় না বা কেউ প্রতিবন্ধক হয় বিরূপতা দেখা দেয় সেখানেই। এর দায়িত্ব এঁদের নয়, দায়ী পরিবেশ বা পরিস্থিতি—যার স্রষ্টিকর্তা প্রধানতঃ রাজনীতি, রাজনীতিক ও কিছুটা হয়ত বা ধর্ম ব্যবসায়ী। পরিবেশে অর্থনৈতিক প্রভাবটা সম্পূর্ণই রাজনীতিকদের অবদান। কাজেই সমস্যা এদিক থেকেও বাড়ছে। সত্যকে চিনে নেবার অবকাশ সীমিত হচ্ছে এবং ন্যায়নীতি ও সততা আকড়ে থাকার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। আর এরই ফলে ক্ষমা, সেবা ও মহত্ব,—ধর্মীয় সত্তার যেটা মৌল উপাদান তা দ্রুত লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এও হয়ত রাজনীতিকদের এক বিরাট জয়। রাজনীতির চরণতলে মাথা নত করা ভিন্ন আর যেন কারো গতি না থাকে।

সমগ্র বিষয়টির আদত অংশও বোধ হয় এই। ধর্মই হোক, কিংবা সত্য, সততা, মহত্ব আর ন্যায়বোধই হোক, সব কিছুই নির্ভর করে মানুষের স্বাধীন ও সুস্থ চিত্তবৃত্তির উপর। আত্মনির্ভর না হলে যেমন স্বাধীন চেতনার পূর্ণতা আসে না এবং কোন সত্যকেই সঠিক ভাবে চেনা যায় না, তেমনি কর্ম ও জীবিকার স্বাধীনতা ব্যতীত কারো আত্মনির্ভরতাই সম্পূর্ণ হয় না। অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ সামাজিক পরিবেশই

এখানে মূল কথা। কোনটা সত্য কোনটাই বা অসত্য এবং ধর্ম কী আর কীই বা অধর্ম এ-বিষয়ে সঠিক ধারণা জাগতে পারে একমাত্র স্বাধীন ও আত্মনির্ভর মানুষের। সহজ কথায়, আত্মনির্ভরতা থেকে আত্মসত্তা সজাগ ও সতর্ক হয় আর এই সতর্কতা থেকেই সমগ্র ঘটনার যথার্থতা ধার্য নির্ভুল হয়। অথচ পৃথিবীর যে-প্রান্তেই তাকান যাক দেখা যাবে প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ বাকী ২০ ভাগ মানুষের পদানত হয়েছে মূলতঃ প্রাপ্য অর্থনৈতিক অধিকারচ্যুত হয়ে এবং যার ফলে তাদের আত্মীক সত্তাকেও ওঁদেরই পায়ে ডালি দিতে হয়েছে। কী করে এই ২০ ভাগ মানুষ এত শক্তির অধিকার পেলেন সেটা স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে যারা পরাধীন ধর্মীয় আচরণেও তারা স্বাধীন থাকতে পারে না। অন্তত সংসারী জীবনে তা সম্ভব নয়।

চালাকী বা দৈহিক শক্তির সঙ্গে ধর্মীয় আচরণের সম্বন্ধ নেই। এর দ্বারা ওই তত্ত্বটার দুর্বলতা অথবা অসারতাই কেবল প্রকাশ করা যায়। অনেকের বিচক্ষণ বোধশক্তিটাও স্তব্ধ রাখা যায়। কাজেই কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমাজ একে প্রশ্রয় দিলে সেখানে ধর্মের নামে ব্যভিচার কিছুটা বাড়বেই। ঐশ্বরিক শক্তির উপর কিছুমাত্র আস্থা থাকলে তাঁর এ-বিশ্বাস না থাকারও যুক্তি নেই যে, চালাকী বা দৈহিক শক্তির মত সম্প্রদায় বা শ্রেণীভেদে ধর্মীয় আচরণ বিধানটাও যথেষ্ট ন্যায়সিদ্ধ নয়। অর্থাৎ কোন ধর্মীয় আচরণ বিধিতে শ্রেণীভেদে বিশেষ অধিকারের নির্দেশ থাকলে ধরে নেওয়াই সংগত, তার মূলে আছে হয় চালাকী নয়ত দৈহিক শক্তির প্রভাব। একে ধর্মীয় অনুশাসন বললে সেটা স্রেফ ষড়যন্ত্র। সমসাময়িক ব্যবস্থা বললে তারও অন্য অর্থ হয় না। কারণ ধর্মীয় বিধি বিধানগুলি যাঁরা তৈরী ও লিপিবদ্ধ করেছেন ওই বিশেষ অধিকারগুলি কেবল তাঁদের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর সম্ভবত এই কারণেই এইসব অধিকার কোন কোন ক্ষেত্রে বীভৎস বা ব্যভিচারের শেষ প্রান্তে নেমেও সমাজগ্রাহ্য হতে পেরেছে।

ভারতে হিন্দুসমাজে একদিন 'সতীদাহ' নামে জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে মারা হোত। অথচ আজকের চেতনাশীল ব্যক্তি মাত্রই

বলবেন, 'ওই সতীদের দৈহিক শক্তি যদি পুরুষদের সমকক্ষ হোত তবে ধর্মীয় অনুশাসন বা নির্দেশ এর কোন যুক্তিতেই এটা সমাজগ্রাহ্য হতে পারত না। আর দৈহিক শক্তিতে যদি সমগ্র সতীকুল অর্থাৎ, স্ত্রী জাতি পুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতেন তবে বিধানটা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হলেও ধর্মসিদ্ধ হতে আটকাতো না।

ঠিক এমনিই কোন সমাজে যদি একই সঙ্গে একাধক স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থাকে ধর্মসিদ্ধ বা ধর্মীয় নির্দেশ, এমন কী তার অনুমোদিত অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে সেটাও হয়েছে ওই দৈহিক শক্তির দাপটে। এই শক্তিতে স্ত্রীরা সমতুল্য হলে তাঁদের পক্ষেও একই সঙ্গে একাধিক স্বামীগ্রহণ ধর্মগ্রাহ্য বা ধর্মীয় অধিকার-ভুক্ত হতে এতটুকু আটকাতো না। আর এর পরেও যদি এ-ব্যবস্থা চলে থাকে তবে চলেছে পুরুষের দৈহিক শক্তিরই প্রভাবে। এ-ধরনের কোন ব্যবস্থার সঙ্গেই ঈশ্বর বা কোন ধর্মের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই। যেটা আছে সে শুধু চালাকী অথবা দৈহিক শক্তি। আর এই চালাকী বা দৈহিক শক্তির দাপট থাকে অজ্ঞ, অসুস্থ ও অবিবেচক সমাজেই। বিজ্ঞ কোন মানুষের চেতনায় এমন কোন চিন্তা স্থান পেতেই পারে না। ধর্মের দোহাই দিয়ে অথবা ক্ষমতালোভী মানুষদের চাপ দিয়ে আইন সৃষ্টি করে সমাজের কোন একটি অংশই বিজ্ঞ এবং ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের কাছ থেকে বিশেষ কোন অধিকার আদায় করতে পারে না। চীন, রাশিয়া প্রভৃতি কমিউনিস্ট সমাজ অন্তত এদিক থেকে যথেষ্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও শক্তি প্রয়োগের পথ পরিহার করতে না পারলে কোন ব্যবস্থাই ধর্মকে বিবাদমুক্ত এবং তার শ্রেণীচরিত্র একেবারে মুছে ফেলতে পারে না। অপরের অনুকরণের বিষয়ও এ হয় না।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, আদম, আল্লাহ্ অথবা অন্য আর একজন সে-তর্ক অবান্তর। কারণ সকলে এবং সকল ধর্মে একজনকেই মাত্র এ-অধিকার দিয়েছে। কেউই এ কথা বলেননি যে তাঁর সৃষ্টিকর্তা আলাদা এবং শুধুমাত্র তাঁর সম্প্রদায়কেই সৃষ্টি করেছেন। সকলের দাবী 'তাঁর সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র এবং সর্বেসর্বা।'

অন্য আর একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব কেউ স্বীকার করেননি। সুতরাং একথা অস্বীকার করার কিছুমাত্র সুযোগ নেই; বরং সকলকেই মেনে নিতে হবে—তিনি যে-নামেই ব্যক্ত হোন আমরা প্রত্যেকেই তাঁর সৃষ্টি এবং তিনিই সকলের পূর্বপুরুষ বা পরমপিতা। অর্থাৎ একজনই মাত্র সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব দাবী করলে এবং যেটা প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসী মানুষের দৃঢ় দাবী তবে এও মেনে নিতে হবে যে, আমরা যে যে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীভুক্তই থাকি এবং যে ধর্মী হই আর যে নামেই তাঁকে ডাকি, আদত কথা আমরা সকলেই তাঁর সন্তান এবং একে অপরের ভাই। এখানে অন্তত কোন কিন্তু অথবা বিবাদ থাকা সম্ভব নয়।• বিবাদ কিছু যদি থাকেই সে আছে বরং সম্পত্তিরই ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে। একদল মানুষ ঈশ্বরদত্ত তথা সকলের পিতৃদত্ত সম্পত্তির অধিকাংশ আত্মসাৎ করে আছে ও করতে চাইছে তাই বিবাদ স্থায়ী হয়ে আছে এবং ধর্মের নিরপেক্ষ মূর্তিটাও সকলে সম্যক উপলব্ধি করতে পারছে না। কিন্তু এই পিতৃদত্ত সমগ্র সম্পত্তি যদি সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হতে পেত তবে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদের সকল হেতুই অন্তর্হিত হয়ে যেত।

আরও স্পষ্ট করে বলা চলে, ধর্মের যে-অংশ মানুষে মানুষে দূরত্ব বাড়িয়েছে, পরস্পরকে অবিশ্বাস ও হেয় করতে দিয়েছে, সেই অংশটিকে চিরতরে মুছে ফেলার একমাত্র পথই ছিল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে সকলের ভিতর ন্যায্য অংশে বিভক্ত করে দেওয়া। এর বিকল্প কিছু নেই। বিকল্প অন্য আর যেকোন ব্যবস্থাই সহনশীলতা ও একাত্মতার অন্তরায়। যদিও এই বিভাজন কার্যও খুব সহজ নয়। বিশেষ করে আজকের সমাজে এটা আরও কঠিন। জোর করে কিছু করতে গেলে ভিতরের তাপ থেকেই যাবে। কাজেই যা কিছুই করা হোক সকলের গ্রহণযোগ্য ন্যায্যতায় এবং অত্যন্ত সুদৃঢ় সঠিক পথেই তা করতে হবে। এর জন্য সর্বাগ্রে চাই সর্বজননিয়ন্ত্রিত একটি ন্যায়নিষ্ঠ তথা ব্যক্তি, দল এবং রাজনীতিমুক্ত প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজ। খাঁটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধর্মই হোল রাষ্ট্রের প্রতিটি সম্পদ সুষ্ঠু ও ন্যায্য অংশে সমাজের সকলের ভিতর ভাগ করে দেওয়া।

ধর্ম নিয়ে কোন গুরুগিরির স্থান এ-সমাজে নেই। প্রয়োজনই নেই। কারণ 'মা' এই শব্দ উচ্চারণে যেমন অপরের সাহায্য লাগে না এবং শিশু যে-ভাষায় ও যে-সুরেই ডাকুক মা ঠিকই তা শুনতে পান, অর্থ বোঝেন ও উত্তর দেন, সর্বশক্তিমান ও অন্তর্যামী ঈশ্বরও তেমনি যে-ভাষায়, যে-সুরে ও যে-নামেই যে ডাকুক অবশ্যই তা শুনতে পাবেন। অন্তত এটুকু বিশ্বাস ও নির্ভরতা না থাকলে তাঁর অস্তিত্বই হয় অর্থহীন। যেহেতু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান আর সর্বজ্ঞই নন, তিনিই প্রতিটি মানুষের সকল চেতনা ও কর্মের নিয়ামক রূপে সমগ্র ধর্মবিশ্বাসীর কাছে পরিজ্ঞাত কাজেই তাঁর কোন এজেণ্ট বা পরিচায়ক অপরিহার্য বললে 'তিনি-সর্বশক্তির আধার ও সর্বজ্ঞ' এই যুক্তিই হয় অসার্থক ও অর্থহীন। অসত্যও।

কিন্তু এর চেয়েও সরল কথা,—সকল ধর্মের সার ও শেষ নির্দেশ যে সত্য, সততা ও সেবা, এ শুধু তাঁদের ধর্মগ্রন্থের ভাষ্য নয়, ভগবান বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ, শ্রীচৈতন্যদেব থেকে আরম্ভ করে যত মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়েছেন সকলেই এক বাক্যে বলে গেছেন। কল্যাণই হোক আর মুক্তিই হোক, মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় কর্তব্যের কথা কেউ বলেননি। এ-সম্বন্ধে মহান এক প্রাজ্ঞ পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে দয়া করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' কাজেই ঈশ্বরকে জানতে, বুঝতে এবং ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে চিনে নিয়ে আত্মীক উৎকর্ষতায় লাগাতে এই সব বাণীর মর্ম সন্ধানই যথেষ্ট। বরং সমগ্র সামাজিক মানুষকে এই সত্য, সততা ও সেবায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে সমাজকর্তাদের প্রথম কাজই হবে, সমাজ থেকে শ্রেণী-প্রভাব দূর করা এবং দ্বিতীয় কাজ হবে, প্রতিটি মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় ঐ বাণীগুলি বড় বড় হরফে লিখে রাখা। এটাই সম্ভবত সঠিক পথ। সম্প্রদায়, শ্রেণী ও বর্ণগত ধ্যান-ধারণার অসারতা সম্পর্কে সতর্ক করবে এই বাণীগুলি। এর পর দেশের সকল সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলি সমগ্র দেশবাসীর জাতীয় উৎসব হিসেবে পালন করা আবশ্যিক হলে

ধর্মীয় আচরণের সঠিক মূর্তি সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠা আরও সহজ হবে।

পাকা রাস্তা। সোজা এর নিশানা। ভুল করার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। পার্থিব জীবনে সকলের ভিতর যুক্তিগ্রাহ্য সমতা থাকলে ধর্মীয় চেতনা নির্ভুল তত্ত্বের সন্ধান পাবেই। আর এই পথ ধরে চলতে চলতে কোন দিন কারো ভিতর নতুন প্রশ্নের উদয় যদি হয়ই তবে তাঁর বিবেকই এর সঠিক উত্তর বলে দেবে। এ-ক্ষমতা আর কারো নেই। থাকতে পারেও না।

রাষ্ট্রভাষা, শিক্ষা ও জীবিকা

রাষ্ট্রভাষার আত্মীক অর্থ সম্ভবত সমগ্র একটি রাষ্ট্র-মানুষকে একত্র রাখার ভাষা। চলতি অর্থে রাষ্ট্রিক কাজের ভাষা হলেও এর আদত অর্থ অবশ্যই হবে দেশের সকল মানুষের ভাব বিনিময় ও সংযোগ রক্ষার ভাষা। সমগ্র দেশের যাঁরা মঙ্গল চান তাঁদের পক্ষে এর অন্য অর্থ করা শক্ত। অনেকের পক্ষে অন্য অর্থের প্রয়োজন স্বীকার করাও শক্ত।

দেশে একটি মাত্র ভাষা থাকলে সেখানে কোন সমস্যাই নেই। সমস্যা হয় বহু ভাষা থাকলে এবং সেটা আরও প্রকট হয় একাধিক ভাষা দাবীদার হলে। যদিও এ-সমস্যার মূল উৎস আর্থিক ও সামাজিক কর্তৃত্ব। এ-বিষয় পরে। কিন্তু বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রে একটি মাত্র ভাষাকে যদি পরস্পর ভাব বিনিময় ও সংযোগ রক্ষার পরিধি থেকে রাষ্ট্রিক কাজের দায়িত্বে উন্নীত করতে হয় তবে সে-ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য কি হবে? সম্ভবত এ হবে ওই ভাষাটিরই গুণগত যোগ্যতা। দেশের আর সব ভাষার তুলনায় এ শ্রেষ্ঠ কিনা? আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অবদানগুলি এর আয়ত্তাধীন কিনা? এবং আজ না থাকলেও আগামী দিনের জন্য অন্যের তুলনায় এ যোগ্যতর কিনা? কারণ এ যদি না হয় তবে ওই দায়িত্বের আংশিক অধিকার পেলেও এ হবে ব্যর্থ। অন্য ভাষাভাষীর আশংকা ও অসন্তোষ বাড়বে এবং একসময় এর

গতিরোধ বাসনা প্রতিরোধ প্রবৃত্তিকেই সক্রিয় করবে। যেমন করেছে কিছুটা আজ দক্ষিণ ভারতে। জোর করে একে বন্ধ করা যায় না আর তা যদিও যায় তবু মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অন্তত গণতন্ত্রের ভাবমূর্তি রক্ষা পায় না। কারণ মনের ও পেটের খোরাক দু'টোই এর সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ।

বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রে একটি মাত্র ভাষাকে সর্বেসর্বা করার বাসনা একমাত্র শ্রেণীস্বার্থপুষ্ট সমাজেই দেখা দিতে পারে। 'শ্রেণী স্বার্থ' ও 'শাসন' এখানে প্রায় একই চেতনার অভিব্যক্তি। একে অপরের শক্তির উৎস। গণতন্ত্রে এ-চেতনার স্থান নেই। দেশের সকল মানুষের সমস্বার্থ এর মূল কথা। আর ভাষা এখানে একটি অংশই নয়, সম্ভবত প্রধান এবং মৌল অংশ। কাজেই 'সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থ সমভাবে বিবেচিত হচ্ছে' বলতে হলে এও এখানে স্বীকার করতে হয় যে, রাষ্ট্রভাষার অধিকার মূলত সংযোগ রক্ষার গণ্ডীতেই নিবদ্ধ থাকবে আর সর্বশক্তির আধার হবে প্রত্যেকের মাতৃভাষা। কারণ মানুষের প্রতিভা বিকাশে শুধু নয়, আত্মনির্ভরতায় মাতৃভাষা যতটা সাহায্য করতে পারে অন্য কোন ভাষার পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়। বিশেষ কোন সুযোগ থেকে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে এ কিছুটা সম্ভব হলেও সমগ্র একটি জাতি অপর ভাষার সাহায্যে প্রতিষ্ঠা পাবে এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর এ যাঁরা অস্বীকার করেন অথবা যুক্তির ফাঁদে ফেলে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রলোভন দেখান তাঁরা সে-জাতির 'প্রকৃত সুহৃদ' এ অন্তত সুস্থ মানুষ কেউ বিশ্বাস করবে না। অর্থাৎ সমৃদ্ধ মাতৃভাষাই যে সমৃদ্ধ জাতির শ্রেষ্ঠ বন্ধু এতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। সন্দেহ থাকলে সেটা দুষ্টবুদ্ধিজাত।

ভারত একটি বহু ভাষাভাষী দেশ। এ আয়তনে যতটা বড় জনসংখ্যায় বড় তার বহুগুণ। দীর্ঘকাল বিদেশীরা এ-দেশ শাসন করেছে, শোষণ করেছে। তাদের সমগ্র ব্যবস্থাই ছিল দখলী স্বত্বের নিরাপত্তার নিরিখে গড়া। দেশের একদল বাছাই করা মানুষকে তারা তাদের নিজের ভাষায় তালিম দিয়ে শাসন ও শোষণ কাজের সহায়ক করে নিয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল প্রধানত এই উদ্দেশ্যের

পরিপোষক। বিদেশী ভাষায় শিক্ষিত অথবা দীক্ষিত এই সকল ব্যক্তিরা স্বদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে নাড়ির সম্বন্ধ প্রায় কোন ক্ষেত্রেই গড়ে তুলতে পারেননি। সে-চেষ্টাও বড় একটা হয়নি। অর্থাৎ শাসক ও শাসিতের চারিত্রিক দূরত্ব ঘুচাতে দখলদার বিদেশীরা যতটা অক্ষম ও অনিচ্ছুক ছিল, তাদের অনুগ্রহভাজন এই দেশীয় সঙ্গীরাও প্রায় ততটাই উদাসীন ছিলেন। এর ভিতর ব্যতিক্রম যেটুকু তার প্রভাব সার্বিক সমাজে পড়েনি।

এ হোল স্বাধীনতার পূর্বেকার ইতিহাস। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও যে একদল বিশেষ অর্থে, চেতনাশীল মানুষ ওই বিদেশী ধ্যান-ধারণাকে নস্যাৎ করতে পারেননি তারই অনিবার্য প্রকাশ এই রাষ্ট্রভাষার দ্বন্দ্ব। সমগ্র ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখলে এবং কিছু রাজনীতিকের বক্তব্যে যে-সুর প্রকাশ পেয়েছে তার সঠিক অর্থ করলে সাধারণ মানুষের একথা মনে করার হেতু ঘটে যে, আজও এক শ্রেণীর ভারতবাসী আন্তরিক ভাবেই কামনা করেন, 'রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র সহ যাবতীয় বিষয়-বস্তুর উপর মূল কর্তৃত্বটা একদল বিশেষ মানুষের জিম্মায়ই ন্যস্ত থাক।' অন্তত 'শাসনযন্ত্রে সর্বস্তরের সকল মানুষের অবাধ গতি যে মোটেই বিজ্ঞোচিত অধিকার নয়' বহু দিনের এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারণা এঁরা ত্যাগ করতে পারেননি। যদিও সকলেই জানেন, শাসনযন্ত্রকে গুরুগম্ভীর ও গণ্ডীবদ্ধ রাখার যুক্তিটা 'শাসক' অর্থে ব্যক্ত ব্যক্তিদেরই গুরুত্ব বাড়াবার ফিকির। জনগণকে আজ্ঞাধীন ও আজ্ঞাবহ রাখার এ এক সহজ অবলম্বন। তথাকথিত রাষ্ট্রভাষা বিশেষজ্ঞ এই সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইংরাজী অথবা অন্য একটি মাত্র আঞ্চলিক ভাষাকে মধ্যমণি রেখে চিরকালই হয়ত এই শাসন ও অভিভাবকের অধিকারটা করায়ত্ব রাখতে চান। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন অনন্তকাল অমীমাংসিত থাকলেও এঁদের ক্ষতি নেই, কারণ ততকাল অন্তত এই মৌরসী অধিকারটা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

ইংরাজীর সপক্ষে প্রধান যুক্তি 'ভাষাটি সমৃদ্ধ, আন্তর্জাতিক এবং দেশের সকল অংশের অধিবাসীকে সম অধ্যাবসায়ে আয়ত্ব করতে হবে তাই অঞ্চল বিশেষের প্রতি পক্ষপাতের প্রশ্ন উঠবে না।

ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করতে এ-ভাষার একটি বিশেষ অবদান ত ছিলই, এমন কি আজও তা কিছুটা আছে।'

অন্যদিকে যে-আঞ্চলিক ভাষাকে ইংরাজীর স্থলাভিষিক্ত করার দাবী উঠেছে তার পক্ষে যুক্তি 'ভাষাটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা।' যদিও এখানে মতভেদ আছে। কিন্তু অন্য যুক্তি 'এ-ভাষা সহজবোধ্য এবং সহজেই আয়ত্ত করা যায়। তা ছাড়া অধিকাংশ ভারতবাসীই এ ভাষা কম-বেশী বোঝেন ও ব্যবহার করেন।'

এঁদের উভয়ের যুক্তিতেই ধার আছে। এবং এঁরা সকলেই যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এতেও সন্দেহ নেই। বিশেষ করে শেষোক্ত যুক্তিবাদীরা 'সহজবোধ্য' ও 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' যুক্তির সঙ্গে আরও একটি যুক্তি দেখিয়েছেন, '৫৫ কোটি মানুষের একটি ঐতিহ্যশালী জাগ্রত দেশ কোন বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিলে নিজের ভাষার দীনতার সঙ্গে তার মানসিক দীনতাও একেবারে ভিখারির স্তরে নেমে যাবে। এই বিদেশী ভাষা যতই উন্নত আর জাতীয়তাবোধের দিশারী হোক।' আর সব শেষের যুক্তি ; 'যে-ভাষা এত বড় একটা জাতির দু'শ বছরের পরাধীনতার সাক্ষ্য বহন করছে তাকে খুশী মনে মেনে নেবার প্রবৃত্তি সে-জাতির সকলের ভিতর থাকবে এ কিছুতেই সত্য হতে পারে না।'

এ সবই জোরালো যুক্তি। এবং এই শেষের মন্তব্যটি এতই হৃদয়গ্রাহী যে প্রতিবাদের চিন্তাকেই যেন স্তব্ধ করে দেয়। একটি স্বাধীন জাতির সব থেকে গর্বের যদি কিছু থাকে সে তার জাতীয়তা-বোধ এবং ভাষাই যার মুখ্য অবলম্বন। স্বাধীন দেশের ৫৫ কোটি মানুষ তার আত্মপরিচয় দেবে আর আত্মনির্ভরও হবে বিদেশী একটি ভাষার উপর নির্ভর করে এর চেয়ে অবাস্তব কল্পনা যেমন নেই, তেমনি এর চেয়ে হীনতাই কি আর কিছু আছে ?

কিন্তু প্রশ্ন কি শুধু এই ? এবং শুধু এই বিদেশী ভাষা বর্জন করলেই এদেশে ভাষা সমস্যার সমাধান হবে ? এ বর্জনে দেশবাসীর আত্মমর্যাদা হয়ত বা কিঞ্চিৎ চাঙ্গা হবে। কিন্তু আত্মবিকাশের পথ ? সেটাও কি মুক্ত হবে ? ভাষা দেশী হওয়া সত্ত্বেও যদি মাতৃভাষা না

হয় এবং মাতৃভাষা হয়েও তার যদি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মণিকোঠায় পৌঁছিবার যোগ্যতা না থাকে তবে সে-ভাষা কি সমগ্র জাতিকে বিকশিত করতে পারে? ভাষা দ্বন্দ্বের নিগূঢ় রহস্যও কিন্তু এখানে। আসল প্রশ্ন এড়িয়ে অথবা তাকে আড়ালে রাখতে প্রসঙ্গের গুরুত্বহীন অংশ নিয়ে এমন দাপুটে তর্ক সৃষ্টি হয়েছে, যেন অধিকাংশ দেশবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় 'এ প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করছে হিন্দী না ইংরাজী অথবা অন্য আর কোন ভাষার ভিতর ঠিক গ্রহণযোগ্য কোনটি কেবল তার উপরই।' এটা অবশ্য নিয়ম। জনসাধারণকে মূল সমস্যা এবং তার যুক্তিযুক্ত সমাধান থেকে দূরে রাখার এ একটি সহজ কৌশল। সাধারণ মানুষকে প্রশাসননির্ভর এবং তার অনুগ্রহভাজন রেখে সেখানে শ্রেণীবিশেষের কর্তৃত্ব স্থায়ী করতে ভাষা যে একটি নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার 'হিন্দী না ইংরাজী' এই জোরালো তর্ক তারই ফল। অর্থাৎ 'রাষ্ট্রকর্তৃত্বে আর প্রশাসনযন্ত্রে স্থান লাভই যে সুখ সমৃদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদা লাভের সহজ এবং নিশ্চিত নিরাপদ পথ' একদল বুদ্ধিমান মানুষের এই অভিজ্ঞতালব্ধ বৈষয়িক চেতনায় 'পাছে বঞ্চিত হই, অন্য ভাষার প্রাধান্যে আমার অধিকার খর্ব হয়' এই দুশ্চিন্তা ঢুকে রাষ্ট্রভাষার তর্কটাকে ঘোরালো করে তুলেছে। সাধারণ মানুষ কিন্তু এ-তর্কের সামিল নয়। তারা চায় আত্মবিকাশের সহজ অবলম্বন। চায় জ্ঞানজগতে পৌঁছুতে মাতৃভাষার সাহায্য। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি থেকে রুটি ও রুজির সমস্যাটা দ্রুত সমাধা হয়। অহিন্দী অঞ্চলের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে আশংকা তার. মূলেও আছে এই অনিশ্চয়তা। কাজেই তাঁদের ইংরাজী প্রীতিটা 'অনাবশ্যক' বলাও শক্ত।

একথা শুনতে খারাপ লাগবে ঠিক, কিন্তু রুজি ও রুটির প্রশ্ন যে তার চেয়েও বড়। মাতৃভাষার আকর্ষণও খাটো নয়। কোন স্বাধীনচেতা মানুষ অন্যভাষার অনুশীলন করবে কিন্তু তাঁবেদারী করতে কিছুতেই সম্মত হবে না। অন্যদিকে আত্মসচেতন জাতি ভিন্ন রাষ্ট্র-ভাষার সঙ্গে স্বদেশের স্বাধীনসত্তা ও সংহতির সমন্বয় ঘটাতেও পারে না। সুতরাং দেশের সমগ্র মানুষের যাঁরা কল্যাণ চান এবং কল্যাণ

চান দেশেরও তাঁরা প্রত্যেকের মাতৃভাষার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন। শুধু আত্মবিকাশের জন্য নয়, চেতনা বিকাশের জন্যও এটা অপরিহার্য। ভাষা যার যাই হোক তাঁর শিক্ষা যদি সম্পূর্ণ হয় তবে সে-ব্যক্তি সকল ভাষা ও ব্যক্তির প্রতিই শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। পরিপূর্ণ শিক্ষার এটা অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু এই শিক্ষা যদি অন্য ভাষার সাহচর্যে হয় এবং তা সম্পূর্ণতার দাবীও করে তবু এর জন্মসূত্রের অহংভাবটা চেতনাকে একটু ব্যবধান রাখতে প্ররোচিত করবেই। আর মাতৃভাষার সঙ্গে অন্যভাষার মৌল প্রভেদও ঠিক এইখানে। স্বাধীনতার ২৮ বছরেও এই সরল সত্যটি কারো বোধগম্য হয়নি, বিশেষ করে ভারতের ভাষা 'বিশেষজ্ঞদের, এ আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু শুধু মাতৃভাষায় শিক্ষাদান আর সে-শিক্ষার রাষ্ট্রীক স্বীকৃতিই কি রাষ্ট্রভাষা দ্বন্দ্বের শেষ কথা? মনে হয় একটি বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রে তাও সম্ভব নয়। মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ এবং সে-শিক্ষার রাষ্ট্রিক স্বীকৃতি অবশ্যই সমগ্র দেশবাসীর মৌল অধিকার। তবে বহু ভাষাভাষী দেশে রাষ্ট্র ভাষার স্থায়ী মীমাংসা চাইলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বা অত্যন্ত কঠিন ধাপ পেরুতে হবে। অর্থাৎ 'রাষ্ট্র' ও 'রাজ্য' এই দুটি ভিন্ন সত্তার মৌল্য ব্যবধান ঘুচিয়ে এদের উপর ন্যস্ত বর্তমানের দুটি ভিন্ন চরিত্রের ক্ষমতার স্থলে একটিই সার্বিক সামাজিক ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। কারণ রাষ্ট্রভাষা দ্বন্দ্বের প্রায় সব রহস্যই নিহিত রয়েছে এই দুটি ভিন্ন চরিত্রের ক্ষমতার সঙ্গে। বিষয়টি কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্থায়ী কল্যাণের পক্ষে অবশ্যই অপরিহার্য। আর যে-শক্তির অভ্যুদয়ে এটা সম্ভব হবে সে কেবল রাষ্ট্রভাষার মীমাংসাতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে না, দেশের তাবৎ সমস্যা সমাধানেও সক্ষম হবে। এর সহজ পরিচয়, সমগ্র রাষ্ট্রমানুষের আত্মমূল্যবোধ এবং যে বোধ জাগ্রত হলে ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হয় সমাজকে দুষ্ট প্রভাব মুক্ত করে সেখানে ন্যায়নিষ্ঠ পরিবেশের পত্তন করা। আরও সহজ করে বললে বলতে হয়, রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব হিসেবে যে-অধিকার আজ শ্রেণী বিশেষের হেফাজতে ন্যস্ত রয়েছে তার প্রায় সবটাই দেশের সর্বস্তরের সকল মানুষের উপর

অর্পণ করার পথ পেলে রাষ্ট্রভাষার দ্বন্দ্ব তার সমর্থক অভাবে আপনা থেকেই সমাধানের সঠিক পথ মুক্ত করে দেবে।

'রাষ্ট্র' নামক এক অতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা তার এক ক্ষুদ্রতম সংখ্যক মানুষের করায়ত্ব থাকে বলে বাকী প্রায় তাবৎ মানুষের সঙ্গেই এঁদের একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এ দূরত্ব পরস্পর সন্দেহ জাগিয়ে ক্রমে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে,—যার অঙ্গীভূত শোষণ আর বঞ্চনা প্রভৃতি অভিযোগও। রাষ্ট্রভাষা এই রাষ্ট্রিক ক্ষমতা আর দায়িত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আজ যুক্ত। কিছুটা হয়ত চিরকালই ছিল। কিন্তু এটা ব্যাপক হয়েছে ওই ক্ষুদ্র সংখ্যক মানুষের প্রয়োজনে। কাজেই এর যুক্তিগ্রাহ্য মীমাংসা করতে হলে রাষ্ট্র তথা কেন্দ্র ও রাজ্য কারো জিম্মায় এমন ক্ষমতা থাকা সংগত নয়, যা বহু ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রেও একটিমাত্র ভাষানির্ভর থাকবে কিংবা তা দখলের জন্য কেউ অতিরিক্ত আকর্ষণ অনুভব করবে। আমরা যদি চিন্তার প্রসার ঘটিয়ে এমন একটি সমাজের সাক্ষাৎ পাই, যেখানে —যেমন ভারতের ক্ষেত্রেই—সমগ্র আই. সি. এস., আই. পি. এস, আই. এ. এস, প্রভৃতি পদগুলি সহ শাসনযন্ত্রে আলাদা মর্যাদা রক্ষাকারী সকল পদই অনাবশ্যক বলে পরিত্যক্ত হয়েছে, আর দেশের সর্বস্তরের সকল কাজই সম্পন্ন হচ্ছে প্রত্যেকের মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধারণ কর্মী এবং ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও তাঁদের কমিটিদ্বারা তবে একটিমাত্র ভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ বা প্ররোচনা স্বভাবতই স্তব্ধ হয়ে যায়। এ ভিন্ন কর্মপ্রাপ্তির অন্য সুযোগ যদি চাহিদা মত উন্মুক্ত থাকে এবং তার আর্থিক মান ও সামাজিক মর্যাদা যদি একই হয়—যেটা শুধু সঠিক সমাজতন্ত্রে নয়, যে কোন একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের পক্ষেই অপরিহার্য—তবে বিশেষ একটি ভাষাকে সর্বেসর্বা করা বা তাকে কেন্দ্র করে সমস্যা থাকার কোন প্রশ্নই আসে না। এর পর দেশের কোন একটি ভাষা 'রাষ্ট্রভাষা' এই সংজ্ঞায় ব্যক্ত হয়ে যুক্তিগ্রাহ্য নির্দিষ্ট সীমা অবধি মর্যাদা পেলে কারো কিছুমাত্র ঈর্ষার হেতু হয় না এবং এ-ভাষা শিক্ষা করে রাষ্ট্রের ও নিজের গুরুত্ব বাড়াতে কারো দ্বিধাও জাগে না।

একটা কথা খুব স্পষ্ট করেই হয়ত বলা চলে, গণমনে কিছুটা ভীতি এবং অপরিহার্য নির্ভরশীলতা জাগিয়ে রাখতেই রাষ্ট্রযন্ত্রে কতকগুলি গুরুগম্ভীর পদের সৃষ্টি হয়েছে। এর সূচনা অবশ্যই সামন্ততন্ত্রে। কিন্তু সেখান থেকেই এর মৌরসী পাট্টা এবং কিছুটা হয়ত শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের যন্ত্রও। ভারতে প্রতিটি দখলদার শাসক এ-যন্ত্রের পূর্ণ ব্যবহার করেছেন, শাসনযন্ত্রে নিত্য নূতন শাখা সৃষ্টি করে এর পরিধি বাড়িয়েছেন। গণ সমর্থনে গণ রস নিংড়ে নেবার এটা মোক্ষম অস্ত্র। কিন্তু এর পরে? —থাক সে-আলোচনা। কারণ সেটা খুব সুখকর হবে না। তবে লক্ষ্য হয়ত সকলেই করেছেন, এত যে সহযোগিতার আবেদন জনগণ কিন্তু একজন সরকারী পেয়াদার পিছনেও কেবল 'কত্তা' 'কত্তা' করে ঘোরাঘুরির সুযোগটাই পেয়েছে। জানিনে, আবেদনকারী কর্তারা এখানেই আর একটু দ্বিধা সংকোচ ত্যাগ করতে বলছেন কিনা? তা না হলে এটা ত কারো না জানার কথা নয় যে, অর্থবহ কোন সহযোগিতার পথ এখানে একেবারেই রুদ্ধ এবং এ-সহযোগিতা পেতে গেলে তাদের জিম্মায় কিছু কাজের দায়িত্বও দিতে হয়। সেটা বর্তমান শাসন কাঠামোয় সম্ভব কি?

অপরের দৃষ্টিতে এর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষার হয়ত তেমন সম্বন্ধ নেই। যেমন নেই সম্ভবত জাপান, জার্মান, বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ-বাসীর কাছে। সামাজিক বিধি-বিধানে ওঁরা উন্নত বলে নয়, মাতৃ-ভাষায় শিক্ষা, জীবিকা ও প্রশাসনের ভাগীদার হওয়ার সুযোগ রয়েছে তাই অন্যভাষা এই সবের মাধ্যম হলে সমাজের উপর কী প্রতিক্রিয়া হয় এবং সাধারণ মানুষ কীভাবে ও কতটা অসহায় হয়ে পড়ে ওঁদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ভারতবাসীও এতকাল হয়ত এটা জানেনি। কিন্তু স্বাধীনতার পর অবশ্যই কিছুটা জেনেছে বলেই দিকে দিকে অভিযোগ, অনুযোগ বা প্রতিবাদের সুর বেজেছে! অবশ্য সমস্যা এখানে একটি নয়, আরও আছে। সকলের মাতৃভাষা যতদিন না আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসরে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে ততদিন সাহায্যকারী একটি ভাষার প্রয়োজন নস্যাৎ করা যাবে না। আবার প্রত্যেকের মাতৃভাষা যোগ্যস্থান পেলেও অন্য প্রদেশবাসীর শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত

রাখতে হবে। এটা আবশ্যিক। তবে সময়সাপেক্ষ। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে শিক্ষা, রুজি এবং দেশের সমৃদ্ধি ও সংহতি সেখানে কোন বাধাই বাধা হতে পারে না।

যোগাযোগ এবং শিক্ষা ও রুজির বাহন তুটি পৃথক ভাষা হওয়া কিছুমাত্র অন্যায় নয়। বহু ভাষাভাষী দেশে সেটাই সংগত। এতে কারো সংশয় থাকে না। অবশ্য সকল ভাষার সমন্বয়ে একটি সার্বিক ভাষার জন্ম হলে এ-প্রশ্ন তখন থাকেনা। কিন্তু ভারতের সমস্যা আজ ত্রিবিধ,—শিক্ষা, জীবিকা ও যোগাযোগ। যোগাযোগের ভাষাকে কেবল ভাববিনিময়ের স্তর অবধি উন্নীত করলেও চলে। কিন্তু শিক্ষা ও জীবিকার ভাষাকে শেষ স্তর অবধি না নিয়ে উপায় নেই। অথচ কিছুটা লজ্জার হলেও আধুনিক যুগের নির্যাস বের করার শক্তি এ-দেশের একটি ভাষারও নেই। এ-প্রয়োজনই এতকাল গুরুত্ব পায়নি। কাজেই আজ এর জন্য প্রচুর সময় ও অধ্যবসায় আবশ্যক। অথচ ততকাল জাতি অপেক্ষা করতে পারে না। অপেক্ষা করলে বা ধীরে চললে কেবল পিছিয়ে থাকার ব্যবধানই বাড়বে। সমগ্র দেশবাসী এটা মেনে নিতে পারে না। সুতরাং অন্তত মাতৃভাষার সমৃদ্ধির প্রয়োজনেও আজকের কোন উন্নত গতিশীল ভাষার সাহচর্য অপরিহার্য। এতে দোষ নেই। না জানার চেয়ে জানবার সুযোগ ত্যাগ করাটাই দোষের। তাছাড়া ভাষা যেটাই হোক তাকে সম্পূর্ণ ও সবদিক থেকে বিকসিত হতে চিরকালই সকল শক্তিধর ভাষার সাহচর্য চাই। 'কারো কাছ থেকেই নেবার প্রয়োজন নেই' এমন দাবী সম্ভবত কোন ভাষাই করতে পারে না। যদিও এই সাহচর্যের প্রশ্নেও এদেশের অনেকে কিছুটা উন্নাসিক। শুধু তাই নয়, যে-ভাষাটি এতকাল সাহায্য করেছে এবং সহজেই করতে পারে সেই ইংরাজীর প্রতি এঁরা আরও বেশী স্পর্শকাতর। এ যে আর একটি ভাষার প্রতি আকর্ষণ তাও ঠিক নয়। এ কেবল ঈর্ষা,—যার মূলে আছে হয়ত কিছুটা অজ্ঞতা বা শয়তানি। ইংরাজ জাতির অনেক কুকীর্তি আমরা ভুলতে পারিনি ঠিক। কিন্তু ইংরাজী ভাষাই যে আজও প্রায় সমগ্র বিশ্বের তাবৎ মানুষের নিত্য নতুন আবিষ্কার ও উপলব্ধির সংবাদ অকৃপণভাবে বিশ্ব মানুষের

দরবারে পৌঁছে দিচ্ছে এটা অস্বীকারের পথ নেই। বিশেষ করে ভারতবাসীর জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করতে এর অবদান আজও তুলনাহীন। সুতরাং 'সাহায্য অনাবশ্যক' বলার যোগ্যতা যেখানে নেই সেখানে 'আংরেজী হটাও' বললেই কর্তব্য শেষ হয় না।

'আংরেজী হটাও' বক্তাদের অনেকেই বিশ্বরাষ্ট্রের কথা বলে থাকেন। এর ভিতর ২।১ জন হয়ত বা এর স্বপ্নও দেখেন। কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্রের জন্য একটি বিশ্বভাষাও যে আবশ্যক এবং তারই প্রতিষ্ঠা চাই সকলের আগে, এ বোধহয় কারো মনে পড়েনা। হিন্দী বিশ্ব-ভাষায় উন্নীত হবে এমন ধারণা থাকা সম্ভব নয়। ইংরাজীই হয়ত এর যোগ্য প্রার্থী। কাজেই বিশ্বরাষ্ট্রের হাক ডাকে আসর গরম করে যাঁরা সম্ভাব্য বিশ্বভাষাকে 'অচ্ছুৎ' করার পরামর্শ দেন তাঁদের আসল উদ্দেশ্য নাও যদি জানা যায় অন্তত এই অবাস্তব বক্তব্যের পরিণতি সম্পর্কে দেশবাসীর সতর্কতার প্রয়োজন একটু আছে বই কি? বিশেষ করে এ যদি রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে ব্যক্ত হয়।

আদত কথা এবং তার পক্ষে প্রচুর যুক্তিও আছে,—দেশের মঙ্গলের জন্যই আরও বেশ কিছুকাল এদেশে ইংরাজী ভাষার প্রয়োজন থাকবে। অন্তত যতদিন না সমগ্র ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এর বিকল্প হওয়ার যোগ্যতা পাচ্ছে ততদিন এর সযত্ন অনুশীলন না হলে আমাদের ভাষা এবং জ্ঞান, দুয়ের গতিই মন্থর হবে। তবে এও ঠিক, একে রাষ্ট্রভাষা ত নয়ই, রাষ্ট্রীয় কাজে সর্বেসর্বার ভূমিকায় রাখলেও দেশের সমস্যা কেবল বাড়তেই থাকবে। ইংরাজী থাকবে মূলত দেশবাসীর জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিধি বাড়াতে এবং তাদের মাতৃ-ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে। রাষ্ট্রভাষা তথা যোগাযোগের ভাষা হবে হিন্দী। আর শিক্ষা, জীবিকা ও রাষ্ট্রিক কাজের বাহন হবে সকল অধিবাসীর নিজস্ব মাতৃভাষা। তবে রাষ্ট্রিক কাজের যে-অংশ বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সেখানে ইংরাজীও থাকবে।

সকল রাষ্ট্রেই তার সর্ব প্রান্তের অধিবাসীর ভিতর সংযোগ রক্ষাকারী সর্বজনবোধ্য একটি ভাষা থাকা চাই। এ না থাকলে সে-রাষ্ট্রের গতি হবে মন্থর, অধিবাসীর জাতীয়তা বোধ হবে দুর্বল।

সহজ ভাববিনিময়ের অক্ষমতাই অবিশ্বাস আর অশ্রদ্ধাকে প্রতিষ্ঠা করবে। কেবলমাত্র ভারতের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম অসম্ভব। অন্য দিকে এই বৃহৎ দেশের সকলেই উচ্চমানের শিক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন এও বোধহয় সম্ভব নয়। আর যদিও বা এ কোনদিন সম্ভব হয় তবে তা হবেন প্রত্যেকের মাতৃভাষাতেই। কিন্তু একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ পরস্পর ভাব বিনিময়ের ভাষা খুঁজে পাবে না এ কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। দেশের সকলেই সকলের সঙ্গে সহজ ভাব বিনিময়ে সক্ষম এই হোল একটি স্বাধীন দেশের নাগরিকের সর্বনিম্ন আত্মপরিচয়ের শর্ত। বহু ভাষাভাষী দেশে এর জন্য যে কোন একটি ভাষাকে মাধ্যম করতে হবেই আর সেটাই হবে রাষ্ট্রের কমন ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা। কোন বিদেশী ভাষার পক্ষে এ-ভার বহন করা কখনই সম্ভব নয়। অথচ স্বাধীনতার ২৮ বছর পরেও এর কোন সুরাহা না হতে দেখে স্বভাবতই অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তিটাই হয়ত এখনও স্বচ্ছ হতে পারেনি। কারণ এটা স্বচ্ছ হলে এ-প্রশ্নে কোন জটিলতা যে থাকত না এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

'রাজ্য' ও 'রাষ্ট্র' এই সত্তা কিছুটা ভিন্ন সংজ্ঞায় ব্যক্ত হলেও যুক্তরাষ্ট্রে এরা পরস্পরের পরিপূরক এবং এটাই এর ভিত্তি। রাজ্যগুলি একে অপরের সঙ্গে সমস্বার্থ সূত্রে গ্রথিত বলেই একে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ভারতের রাজ্যগুলির দিকে তাকালে ঠিক এই চিত্র এর কোথায় আছে খুঁজে পাওয়া কিছুটা শক্ত। এর জন্য দায়ী কে সে-প্রশ্ন বৃথা। আজ কিছুটা অবান্তরও। কিন্তু দেশ তার অখণ্ডতায় বিশ্বাসী এবং দেশের সকল মানুষের স্থায়ী শান্তি আর সমৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য, এই যদি মৌল নীতি হয় তবে সেখানে রাষ্ট্র ভাষা কোন সমস্যাই হতে পারে না। এ নিয়ে কোন সমস্যা হয়ে থাকলে হয়েছে একদল বিশেষ মানুষের স্বার্থ সুরক্ষার প্রয়োজনে। দেশ ও দেশবাসী কারো পক্ষেই এটা মঙ্গলকর নয়। এর প্রতিকারে চাই গণচেতনা ও জাতির আত্মপ্রত্যয়। এটা সম্ভব হলে এদেশেও সর্বজন গ্রাহ্য একটি সার্বিক যোগাযোগের ভাষা বেছে নেওয়া কিছুমাত্র

শক্ত কাজ নয়। তখন বরং দেখা যাবে হিন্দী শেখাই সকলের পক্ষে সহজ। কারণ মৌখিক আদান-প্রদানে এ-ভাষা ভারতে অদ্বিতীয়। বহু ভাষাভাষী একটি সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে সকলের কমন ভাষা তথা রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজনও কেবল ওইটুকুই।

সমাজতন্ত্রে পরগাছা

সততা, সদিচ্ছা ও সম্প্রীতি, এই তিনটি হোল সমাজতান্ত্রিক সমাজের মৌল উপাদান। এর উৎপত্তির মূলে থাকে সমতা। আর এই সমতা আসে সর্বস্তরের সকল মানুষের কর্তৃত্ব ও অংশের সমতা থেকে। সম্পদ এবং রাষ্ট্রিক. দায়িত্বই এখানে প্রধান। কিন্তু মানব সমাজে কোথাও এ-সমতা নেই। এর মূলে আছে শ্রেণীস্বার্থ এবং সমাজের উপর এই স্বার্থভোগী শ্রেণীর আধিপত্য। রাজনীতি এর পত্তন না করলেও স্থায়িত্ব দিয়েছে এবং আপোষহীন দ্বন্দ্বে সমগ্র সামাজিক মানুষকে জড়িয়েছে। মানুষের যুক্তির শক্তিও দুর্বল করেছে। রাজনীতিমুক্ত সমাজ ভিন্ন সকল মানুষ সঠিক যুক্তিবাদী হবে এ অসম্ভব। আবার সকল মানুষ যুক্তিবাদী না হওয়া অবধি সততা, সদিচ্ছা ও সম্প্রীতি সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত আর স্থায়ী হবে এও সম্ভব নয়। সুতরাং 'রাজনীতিই মানুষের শুভবুদ্ধি বিকাশের অন্তরায় এবং অধিক মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রধান শত্রু' বলে যাঁরা মত প্রকাশ করেন তাঁদের মানসিক উৎকর্ষতাকে শ্রদ্ধা না করার যুক্তি আছে বলা শক্ত।

রাজনীতি আজ সর্বগ্রাসী। সমাজের সব কিছুর গতিই এর পদতলে লুণ্ঠিত। এটা অস্বীকার করলে বরং একটু বেশী মূল্য দিয়েই পরে স্বীকার করতে হয়। স্বীকার করিয়ে নেয়। কিন্তু সমাজ দেহে আরও অনেক বিষয় আছে যার প্রভাব সকলকে স্পর্শ করলেও সহজে তার সঠিক চরিত্র ধরা দিতে চায় না। এর কারণ, কোন কোনটির গায়ে থাকে ন্যায়ের প্রলেপ, আবার কোনটি বা ন্যায়েরই রক্ষক। এই শেষ পরিচয়ের একটিই বোধহয় বর্তমান সমাজের আইন ব্যবসা।

সাধারণ মানুষ আইন জানে না। সকলের পক্ষে এ-চেষ্টাও সম্ভব নয়। অথচ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় জীবনের কোন না কোন একসময় বিচারালয়ের দ্বারস্থ প্রায় সকলকেই হতে হয় আর তখন আশ্রয় নিতে হয় একজন আইন ব্যবসায়ীর। আইন ব্যবসায়ীদের কাজ মামলায় জড়িয়ে পড়া বা পড়তে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বক্তব্য বিষয় সংশ্লিষ্ট বিচারকের সামনে তুলে ধরা। ব্যবস্থা এমনই যে খরিদ্দার নিজে একজন আইন বিশেষজ্ঞ হলেও কোন আইন ব্যবসায়ীর সাহায্য ব্যতীত কার্যোদ্ধার হওয়া শক্ত। পরিচিত সংজ্ঞায় ব্যক্ত উন্নত অনুন্নত কোন সমাজই এর ব্যতিক্রম নয়। আর গল্পে বর্ণিত সেই গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারটি যেমন আপসোস করেছিলেন দেশে রোগব্যাধির অভাব দেখে, তেমনি যিনি যে-ব্যবসাই করুন খরিদ্দারের অভাব ঘটলে আপসোস তাঁর হবেই। এটা দোষের নয়। এমন কী আইন ব্যবসার বেলায়ও নয়। খরিদ্দারের প্রাচুর্য কামনা ব্যবসার মৌল অধিকার। অবশ্য সমাজদেহে পরস্পর বিরোধ, চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম, দাঙ্গা প্রভৃতির অভাব ঘটলে তবেই ত আইন ব্যবসার মন্দা আসবে? কিন্তু তার সুযোগ কোথায়? কাজেই সমাজে বিকার-গ্রস্ততা যেমন আছে, তেমনিই বলা চলে, অসুস্থ সমাজই হোল আইন ব্যবসার উপযুক্ত স্থান।

অসুস্থতার জন্য অবশ্যই ওই ব্যবসায়ীরা দায়ী নন। দায়ী অভাব ও অশিক্ষা, দায়ী সমাজব্যবস্থা। শ্রেণীস্বার্থপুষ্ট সমাজে বৃহত্তর মানুষের অভাব ও অশিক্ষার সঙ্গে অসুস্থতাও নিয়ত লড়তে থাকে। আপাত দৃষ্টিতে এর হদিস সব সময় পাওয়া যায় না। আর পূর্বের তুলনায় মানুষ আজ বহু দিক থেকে ঐশ্বর্যশালীও। শিক্ষায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, মানসিক চেতনায় সব দিকেই তারা এগিয়েছে। কিন্তু সামাজিক অসুস্থতা তাতে কমেনি, বরং বেড়েছে ও বাড়ছে। কেন? বাড়ছে হয়ত প্রাচুর্যের তুলনায় অভাব বোধটা আরও বেশী বেড়েছে এবং শিক্ষা মনুষ্যত্বের প্রসার না ঘটিয়ে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির বিকাশ ঘটাতেই বেশী সাহায্য করছে। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সব ন্যায়তন্ত্রের গল্প ফেঁদে সমাজের একদল অতিবুদ্ধিমান 'গণ' কোটি

কোটি 'গণ'র টুটি চেপে রেখে সমাজে যে-ভারসাম্যের ব্যবধান ঘটিয়েছেন সম্ভবত তারই অনিবার্য পরিণতি এই অসুস্থতা। সমাজ অসুস্থ তাই কোনটা ঠিক আর কোনটা নয় তার পরিমাপ করাও কঠিন। মামলার সংখ্যা, শ্রী ও স্থায়িত্ব প্রসারে এই অসুস্থতার অবদান কতটা, কিংবা এই ব্যবসার অগ্রগতির সঙ্গে এর কোন সংযোগ আছে কিনা সে-প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কিন্তু সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ভিন্ন এই পাপ থেকে দুর্বল শ্রেণীর মুক্তির যে কোন আশা নেই এ-কথা হলপ করেই বলা চলে। সমাজদেহে এ এক বড় আকারের ক্ষত। অনেকের মতে শুধু 'ক্ষত' বলে একে ছোট করা বৃথা, আদতে এটা একটি কঠিন ব্যাধি এবং আইন ব্যবসার সঙ্গে এ-ব্যাধির উৎপত্তিগত সম্বন্ধ নাই থাক, কিন্তু আইন ব্যবসা এই ব্যাধিকে উপলক্ষ করেই সমাজে জেঁকে বসেছে।

তবে প্রশ্ন এ নয়। প্রশ্ন হোল, প্রকৃত একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজে এ-ব্যাধির অবস্থিতি সম্ভব কিনা এবং সেই সঙ্গে এই আইন ব্যবসাটিও সেখানে থাকতে পারে কিনা? যুক্তি মেনে নিলে অবশ্য এখানে 'না' ভিন্ন অন্য কোন উত্তর গ্রহণযোগ্য হয়না। কারণ কোন দ্বন্দ্ব অথবা অন্যায় প্রবৃত্তির প্রকাশ থাকলে সেটা আর ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ হয়না। সমাজ ন্যায়নিষ্ঠ হলে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রয়োজনই সেখানে থাকেনা। দ্বন্দ্ব এড়াবার উপকরণ আর শক্তিই হোল সঠিক অর্থে ব্যক্ত একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের একমাত্র উপাদান। এখানে অসতর্ক বা দুর্বল মুহূর্তে কোন বিভেদ দেখা দিলেও সামাজিক নিয়মে পরস্পরের শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়েই তার নিরসন করা যায়। যুক্তিযুক্তও সেটাই।

তবে এ হোল শেষের কথা। সম্পূর্ণতার চিত্র। এর পূর্বের কোন অন্যায় যদি স্বভাবসিদ্ধ বা পরিকল্পিত হয় তবে তার বিচার হবে অন্যভাবে এবং তার পথও খুব সরল। এ-অপরাধের সংজ্ঞা মাত্র একটি—'সমাজদ্রোহ'। চোর, ডাকাত, খুনী, ঘুষখোর, ভেজালদার, কালোবাজারী, লম্পট, রাষ্ট্রদ্রোহী এবং অপরের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বিঘ্নসৃষ্টিকারী প্রত্যেকের ওই একই

পরিচয়-'ওরা সমাজদ্রোহী।' রাজনৈতিক অপরাধ বলে এ-সমাজে আলাদা কোন 'অপরাধ সংজ্ঞা' হয়না। কারণ দেশের সর্বস্তরের সকল মানুষের সক্রিয় কর্তৃত্বনির্ভর সমাজে মতভেদ কিছু ঘটলেও সেটা অপরাধের অর্থাৎ, সংঘাতের রাস্তায় না নেমে যুক্তি দ্বারাই মীমাংসা হতে পারে।

এর পর বাকী থাকে যে 'সমাজদ্রোহ', তার বিচার হবে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে এক বা একাধিক বিচারক কর্তৃক সরাসরি প্রশ্নে অভিযোগকারী, অপরাধী এবং তাদের সাক্ষীদের বক্তব্য শুনে তার সত্যাসত্য যাচাই করে। অপরাধী সাব্যস্ত হলে তার পরিণতি হবে দু'টি। যথা সংশোধন ও পুনরোদ্ধার। অপ্রত্যক্ষ বা অনিচ্ছাকৃত অপরাধের সাজা হবে কোন সংশোধনাগারে রাখা অপরাধীর মানসিক পরিবর্তনকাল অবধি। পরিমিত শ্রমে এরা এদের ব্যয় নির্বাহ করবে। আর প্রত্যক্ষ, পরিকল্পিত এবং ইচ্ছাকৃত অপরাধের শাস্তি হবে ক্ষতিপূরণের ভিতর দিয়ে। ব্যক্তি বিশেষের হোক, অথবা রাষ্ট্রেরই হোক, অপরাধী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের আর্থিক মূল্যের প্রতিটি পয়সা প্রথমে তার সম্পত্তি থেকে এবং অবশিষ্টাংশ তার শ্রম থেকে উশুল করে ক্ষতিগ্রস্তকে দিতে হবে। এ-ক্ষেত্রে আংশিক উশুল যুক্তিযুক্ত হবে না, সবটাই উশুল হওয়া চাই। এই উভয়বিধ শাস্তির জন্য বর্তমান কারাগারগুলিকেই সংশোধনাগার ও শ্রম আদায় কেন্দ্রে রূপান্তর করা চলে।

এ একটা সম্ভাব্য দিক। পরিবর্তিত সমাজ হয়ত আরও ন্যায়গ্রাহ্য সমাধান সূত্র পাবে। সমাজে অপরাধ প্রবণতার একটি বড় কারণ আর্থিক লাভ। কাজেই এ-সম্ভাবনা না থাকলে এবং উপরন্তু ক্ষতিটাই অবশ্যম্ভাবী দেখলে স্বভাবতই এ-অপরাধ হ্রাস পাবে। লোভী ও ধনী ব্যক্তিরা সব থেকে বেশী ভয় করেন আর্থিক ক্ষতিকে। দরিদ্র ব্যক্তিদের অপরাধের মূলে থাকে প্রধানত অভাবের তাড়না, যা সহজেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে সাহায্য করে। এর গোড়াকার কথা সামাজিক অবিচার। এবং একটু সতর্ক হয়ে সন্ধান করলে জানা যাবে, অভাবটা সহ্যসীমা অতিক্রম না করা অবধি এদের

অধিকাংশেরই ন্যায়বোধ লুপ্ত হয়না। কাজেই শুধু অর্থমূল্যে সমাজের নৈতিক ক্ষতি পূর্ণ হবে এ-ধারণা ভুল। এর জন্য চাই ওই শ্রমশিবির। ঘুষখোর, ভেজালদার, কালোবাজারী এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের জন্য অন্তত শ্রমশিবির অপরিহার্য হওয়াই সংগত।

তবে এও পরের কথা। অনাগত ভবিষ্যতের আশ্বাস। কিন্তু যতদিন না সমাজ এই স্তরে উন্নীত হচ্ছে এবং সমাজতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হয়ে মানুষকে একটি সুস্থ সাবলীল ন্যায়নিষ্ঠ পরিবেশের সন্ধান দিচ্ছে ততদিন মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে বর্তমান বিচার ব্যবস্থার অবশ্যই কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটান যায় এবং যেকথা পূর্বেই বলেছি তেমন একটি আইনগত ব্যবস্থায় আমরা প্রত্যেকেই বিবাদের বিষয়সহ সরাসরি বিচারকের সামনে উপস্থিত হতে পারি। হই আমরা যতই অশিক্ষিত বা আইনে অজ্ঞ, কিন্তু নিজের প্রার্থিত বিষয় সম্পর্কে কেউই অজ্ঞ নয়। মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতাও কম বেশী সকলেরই আছে। যেখানে বিচারক অন্য ভাষাভাষী কেবল সেখানেই একজন দোভাষীর প্রয়োজন ঘটবে।

এখানে নিজের বক্তব্য বিষয় যত পরিষ্কাব ব্যক্ত হবে এবং তার ভিতরকার সত্য স্পষ্ট হবে, অন্যের পক্ষে তা প্রায়ই সম্ভব নয়। অন্য দিকে প্রতিপক্ষও যদি এই একই পথ গ্রহণে বাধ্য থাকেন তবে বিচারকের পক্ষেও বিরোধটির প্রকৃতি জানা এবং প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন অনেক বেশী সহজ হবে। অবশ্য সরাসরি প্রশ্ন করে উভয় পক্ষের বক্তব্য জানতে হলে বিচারকের পরিশ্রম বেশ কিছুটা বাড়বে। কিন্তু এতে যে কোন মামলাই হোক তার নিষ্পত্তি যেমন সহজ হবে, সত্য নিরূপণ নির্ভুল হবে, সময় ও অর্থ অপচয়ও বহুল পরিমাণে সীমিত হবে। আর সবচেয়ে বেশী হবে বিবাদের সংখ্যা ও প্রবৃত্তি হ্রাস এবং অক্ষম ও অর্থহীনদের প্রতি সুবিচার। বিচারক অবশ্যই নিরলস সত্যসন্ধানী ও সহৃদয় আইনজ্ঞ হবেন। জেরা করে উভয় পক্ষের ভিতর থেকে প্রকৃত সত্য বের করতে পারদর্শীও হবেন। প্রয়োজন বোধে একাধিক বিচাবক থাকলে অথবা কয়েকজন জুরীর সাহায্যে নিলে কাজটা আরও সহজ ও সুষ্ঠু হতে পারে।

শ্রেণী বিশেষের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থায় মানব সমাজের এক বৃহত্তর অংশই নিয়ত মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে। মেকী প্রগতি আর অনাবশ্যক অন্যায়ের দাপটে বেশীর ভাগ মানুষের শুভবুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে গেছে। আর পরমুখাপেক্ষীতা, পরনির্ভরতা ও পর প্রভাবে মানুষ অশালীন ও অবিবেচকও হয়েছে। কাজেই এর পরিবর্তন ঘটাতে হলে চাই সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে চাই বিচার-ব্যবস্থারও পরিবর্তন। এটা সম্ভব হলে শুধু আইন ব্যবসা কেন, এমন আরও বহু ব্যবসা ও ব্যবস্থার সন্ধান মানুষ পাবে, যাকে এতকাল সভ্যতার গর্বিত অবদান হিসেবেই মেনে চলা হয়েছে। অন্যায় ও অকল্যাণের প্রতিষেধক ভাবাও হয়েছে অথচ এর আদৌ কোন প্রয়োজন ত ছিল না, বরং এর কোন কোনটি মানুষকে সঠিক পথে চলতে বাধাই দিয়েছে। অনেক 'সেবক সমাজ' 'কল্যাণ সমিতি' 'মিশন' প্রভৃতি এরই অন্তর্গত। একটি প্রকৃত ন্যায়নিষ্ঠ বা সমাজতান্ত্রিক সমাজে এর প্রায় প্রত্যেকটিই এক একটি পরগাছা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

দেশরক্ষায় সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভূমিকা

দেশের নিরাপত্তা মানব সমাজে এক বৃহত্তর সমস্যা। এই নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে দেশবাসীর ধন, প্রাণ, সম্ভ্রম সব কিছুই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ-সমস্যা আজকের নয় এবং বিশেষ একটি দেশের গণ্ডীতেও আবদ্ধ নয়; সর্বকালে সকল দেশেই এ প্রায় সমভাবে বিদ্যমান। বহিঃশত্রুর আক্রমণ আশংকায় মানব জাতি চিরকালই কম-বেশী শংকিত।

অবশ্য দেশের নিরাপত্তা কেবল যে বহিঃশত্রুর আক্রমণেই বিঘ্নিত হয় তা নয়, ভিতর থেকেও এ-শত্রুর আবির্ভাব ঘটতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত এদের চেনা যায় না, কাজও হাসিল করে হয় নীরবে, নয়ত বন্ধুবেশে। বহিঃশত্রুর তুলনায় এরা দুর্বল বা কম ক্ষতিকর কিনা সেটা তর্কের বিষয়। তবে বাইরের শত্রুর সঙ্গে এদের চরিত্রগত প্রভেদ কিছু থাকলেও দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার দিক থেকে উভয়ের গুরুত্ব আলাদা করা শক্ত। কাজেই প্রতিরোধ শক্তি ও সজাগ থাকার প্রয়োজন উভয় ক্ষেত্রেই আছে। আর সাম্রাজ্য বিস্তার অথবা

সামরিক শক্তির দাপটে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের মতলব না থাকলে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই নিরিখেই গড়ে ওঠে। কোথাও ব্যতিক্রম থাকলে তার আসল রূপ ফুটে উঠতে দেরী হয় না। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই থাক, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের প্রতিটি মানুষের সম্ভ্রম ও স্বার্থের একটা নিবিড় সম্বন্ধ যে থাকেই তার নৈতিক মূল্যটাই এর শক্তি ও পবিত্রতার উৎস। সাধারণ মানুষ একে সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে আর রাষ্ট্রকর্তারা সেই সমীহ ও শ্রদ্ধাকে পুঁজি করে তাঁদের প্রয়োজন মত কাজে লাগান। বিদেশী আক্রমণকারীদের অনেকেও যে বিজিত দেশবাসীর কাছে 'বীর' আখ্যায় পরিচিত হতে পেরেছেন তার মূলেও ছিল ওই গণসমীহ ও গণশ্রদ্ধার পুঁজি।

'আলেকজান্দার সাম্রাজ্য বিস্তার করতে ভারতে আসেন নি, এসেছিলেন সৌখিন দিগ্বিজয়ে জগতে একটা কীর্তি রাখার স্বপ্ন নিয়ে।' এমন কীর্তির স্বপ্ন যে ওই একটিই তা বলা যায় না। কিন্তু ওই একটি ক্ষেত্রেই লক্ষ লক্ষ নিরীহ অসহায় মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, আহত হয়েছিল আরও অনেক বেশী এবং কোটি কোটি টাকার ধন সম্পত্তির সঙ্গে লুণ্ঠিত হয়েছিল এদেশের এক বিপুল সংখ্যক নারীর নারীত্ব। বীরত্বের কীর্তি কী তাঁর এটাই?

নেপোলিয়নের বীরত্বের মহিমা এদিক থেকে ভিন্ন নিশ্চয়ই কারণ তাঁর বীরত্বের মূল অংশটা নিয়োজিত ছিল স্বদেশ রক্ষায়। যদিও এর বাকী অংশের বলিও নেহাত কম নয়। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ 'বীর' অনেকটা এমন কীর্তিই রেখে গেছেন। চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং, নাদির শা প্রভৃতিরা সম্ভবত এদিক থেকে আরও মস্ত বড় বীর। আর ঠিক এই পর্যায়ে না পড়লেও এই সংজ্ঞা-নির্ণীত বীরত্বের মহিমা এমন কি আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের যুগে তাকালেও দেখা যাবে। সেখানেও এমন কিছু দুর্ধর্ষ বীরের কীর্তিকথা চোখে পড়বে যাঁরা বীরত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রকে কেবল নিজ রাজ্য বা পার্শ্ববর্তী একটি সামন্ত রাজ্যে সীমিত রেখেই খ্যাত হয়ে পড়েছেন। অতএব এই বীরেদের কথা থাক। কারণ বীরত্বের যে-সংজ্ঞা সেদিন ছিল আজ তা নেই। অন্তত কোন চেতনাশীল মানুষের কাছে নেই। তাছাড়া এও বোধহয় খুব স্পষ্ট

করেই বলা চলে, যেখান থেকে যেভাবেই এই বীরত্ব কাহিনী যার ফেটে পড়ুক, লক্ষ লক্ষ মানুষের টাটকা রক্তে ভেজা মাটিতেই তার জন্ম হয়েছে। বেশীর ভাগ নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষের বুকের রক্তে এই বীরত্ব কেনা হয়েছে। আর এই বীরত্বের নেশায়, পররাজ্য লুণ্ঠন বা অধিকারের প্রেরণায় কিংবা ক্ষমতা বা অর্থ লালসায় দিশেহারা হয়ে কিছু মানুষ যে-বিভীষিকার পত্তন সেদিন করেছিলেন জের তার আজও মেটেনি। শেষ হয়নি শুধু বিভীষিকা নয়, তার স্বষ্টিকর্তা মানুষগুলোও। বরং পরিবর্তিত রূপ নিয়ে এঁদেরই প্রেতাত্মারা সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষমতা আর মানব রক্তের সন্ধানে আরও বেশী তৎপর হয়ে উঠেছে।

সম্রাট অশোক যে অত্যন্ত আহত চিত্তেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর পরবর্তী জীবন চরিতেই এর সমর্থন মেলে। নিজের নৃশংসতার চরম গ্লানিই তাঁকে মানব জীবনের পরম সত্যের সন্ধান দিয়েছিল এতেও সন্দেহ নেই। বাকী জীবন তিনি এই সত্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটাতে চেয়েছেন। এর পর প্রায় দুই হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সমাজ-ব্যবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে। সর্বোপরি অত্যন্ত কঠিন মূল্যে অর্জিত তাঁর মর্মস্পর্শী বাণীগুলি আজও জীবন্ত। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই গেছে,—মানুষ কি তাদের পাশব প্রবৃত্তি কিছুমাত্রও দমন করতে পেরেছে? কিংবা কোন সমাজ ওই আলেকজান্দারীয় বীরত্বের স্তুতিকে 'অমানবীয়' ভাবতে শিখিয়েছে? নাহলে সেটা মানব জাতির দুর্ভাগ্য কিনা জানিনে, কিন্তু এই সব বীরত্ব স্তুতির সঙ্গে শ্রেণীগত স্বার্থের যে একটা আত্মীক সম্বন্ধ রয়েছে সেটা জানি। এবং এও জানি, সেদিনের মানুষ বলতে পারেনি আর আজকের মানুষও হয়ত কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু আগামী দিনের চেতনাদীপ্ত মানুষ ওই তথাকথিত বীরদের স্তুতিগানে কিছুতেই আর মুখর হবেন না। তাঁরা বলবেন 'ওঁরা খুনী, ডাকাত, লুটেরা।' বলবেন, 'মানব রক্তসন্ধানী এক শ্রেণীর হিংস্র পশু।' তাঁরা খুব স্পষ্ট করেই বলবেন, 'স্বদেশ ও বিদেশ এবং স্বপক্ষ ও বিপক্ষের লক্ষ লক্ষ অসহায় নিরপরাধ মানুষকে যারা অকাল ও নির্মম মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করেছে·

তারা কিছুতেই মানুষ নামধারী জীব নয়। এঁদের মানুষ বলে পরিচয় দিলে সমগ্র মানব জাতিকেই অপমান করা হয়।' কিন্তু এখানেই কী এঁরা থেমে থাকবেন? মনে হয় না। এর পর এও হয়ত বলবেন, 'আর এদের যাঁরা বীর আখ্যা দিয়ে গেছেন তাঁরাও মানব জাতির প্রকৃত বন্ধু নয়। যে-সকল ঐতিহাসিক এদের বীরের মর্যাদা দিয়ে গেছেন তাঁরা অত্যাচারিতদের কেউ ছিলেন না, ছিলেন অত্যাচারিদেরই সগোত্র বা পরম সুহৃদ।'

মনে হয় না একজন দৃঢ়চেতা সত্যদর্শী মানুষের পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব। কারণ কোন খুনে ডাকাত সর্দারের সঙ্গে ওই তথাকথিত 'বীর'দের যে পার্থক্য সে শুধু সামাজিক পরিবেশঘটিত ধারণা, আর্থিক সংগতি এবং সাকরেদ অর্থাৎ প্রতিরক্ষার নামে সহ অভিযাত্রী সংগ্রহের কৌশলেই সীমাবদ্ধ। অধিকন্তু কোন কোন সাধারণ ডাকাতের ভিতর যে-মানবতা ও ন্যায়বোধের পরিচয় পাওয়া যায় এদের অনেকের সেটুকুও ছিল না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এর নৈতিক মূল্য। ডাকাতদের পরিচয় আর এঁদের পরিচয়ে যে-প্রভেদ টানা হয়েছে মানব জাতির বড় ক্ষতি হয়েছে সেখানেই।

দেশের শত্রু ভিতর বাহির সব দিকেই আছে। চিরকালই থাকে। যদিও ভিতরের শত্রুর সংজ্ঞা সকলের কাছে সমান নয়। যেমন স্বাধীনতার পূর্বে বিদেশী বৃটীশ শাসকরা এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বা 'দেশের শত্রু' বলে চিহ্নিত করতেন এবং এঁরাই আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যভাগে এঁদের সহযোগী হিসেবে এদেশেরই কমিউনিস্টদের বলেছিলেন 'দেশভক্ত'। ইতিহাসে এ-অসংগতির অভাব নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদকারীরা চিরকালই শাসকদের চোখে অপ্রিয় বা 'দেশের শত্রু' হয়ে থাকেন। যদিও চেতনাশীল মানুষের মানুষের কাছে এর ভিতরকার রহস্য অজানা থাকে না। তাঁরা আরও জানেন, ভিতরের শত্রু তারাই, যারা ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে বহিঃ-শত্রুর সাহায্যকারী অথবা দেশের সরল বিশ্বাসী মানুষদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাতে চায়।

দেশের সাধারণ মানুষই সমগ্র শক্তির উৎস। আক্রমণে অথবা

তা প্রতিরোধে এঁরাই বুকের রক্ত ঢেলে দিতে এগিয়ে যায় বা যেতে বাধ্য হয়। সুতরাং এ-প্রসঙ্গের মূল জ্ঞাতব্য হোল প্রতিরক্ষা কাজে নিযুক্ত এই সকল মানুষের সম্বন্ধ কী কী বিষয়ে জড়িত? শুধুমাত্র নিরাপত্তা রক্ষায় এ-সম্বন্ধ নিবদ্ধ থাকলে এ-প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু অধিকাংশ দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এমন সব বিষয় জড়িত থাকে, যাকে দেশের সার্বিক মানুষের স্বার্থের অনুকূল ভাবতে অনেকেরই দ্বিধা জাগে। অন্তত স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জাগে না। অথচ একটি জনগণতান্ত্রিক সমাজে এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আকর্ষণ হোল সব থেকে মূল্যবান বিষয়।

একথা ঠিক যে, তন্ত্র যেটাই থাক রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব যাঁদের দখলে থাকে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং পরিচালনার দায়িত্ব থাকে কেবল তাঁদেরই উপর। অন্যের এখানে নাক গলাবার অবকাশ নেই। পরিচিত সমাজে এটা রীতি এবং প্রশ্নাতীত ব্যবস্থা। দলতন্ত্রের পূর্বে রাজা বাদশাহদের হাতেই এ-ক্ষমতা ছিল এবং তাঁরা তাঁদের রুচি ও সংগতি মত সৈন্যদল গঠন করে প্রয়োজন ক্ষেত্রে তাদের নিয়োগ করতেন। এর উদ্দেশ্যও অবশ্যই তাই। কিন্তু ইতিহাস থেকে জানা কষ্ট নয়,—এঁদের এই প্রয়োজন ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষায় যতটা নিবদ্ধ থেকেছে, দেশবাসীর স্বার্থের প্রতি ততটা প্রসারিত হয়নি। শক্তিশালী সৈন্যদল এঁদের পররাজ্য গ্রাসেই কেবল উদ্বুদ্ধ করেনি, লুণ্ঠন আর অকারণ নরহত্যায়ও অনেক সময় ইন্ধন দিয়েছে। আর যে-সৈন্যদল কর্তৃক এ-কাজ সংঘটিত হয়েছে তারা শুধু মেরেছে ও মরেছে। এটা এঁদের প্রতিবাদমুক্ত কর্তব্য যদিওবা কিন্তু এই নিয়োগকর্তারা এর সুযোগ নিয়েছেন বা নিতে পেরেছেন হয়ত কিছুটা নির্মম ভাবেই।

কিন্তু এর পরের ইতিহাস? এবং এই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও কী তাঁর বেশী কিছু পরিবর্তন হয়েছে? হয়নি যে তার প্রমাণ বোধহয় ভিয়েৎনাম, তিব্বত, হাঙ্গারী, বাংলাদেশ এবং আরও অনেক। যদিও সেই সাবেক যুগের তুলনায় প্রতিরক্ষার নামে নিযুক্ত কর্মীদের আর্থিক প্রাপ্তিটা কিছু বেড়েছে। আহত ও নিহত কর্মীর পারিবারিক

নিরাপত্তা কাঠামো পালটেছে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিদায়ী উচ্চ-মহলকে খুশী রাখার ব্যবস্থাও কিছু হয়েছে। কিন্তু এর যেটা মৌল বিষয়, সেই 'মারা' ও 'মরার' প্রশ্নে ব্যক্তি সত্তাকে স্বীকার করে নেবার মত পরিবেশ আজও বোধহয় কোথাও গড়ে ওঠেনি। এখানে রাষ্ট্র-কর্তাদের সব মর্জিই প্রশ্নাতীত ও সর্বেসর্বার ভূমিকায় নিবদ্ধ। সাবেককালের রাজা বাদশাহদের আমলে বেশীর ভাগ মানুষ এমন অবস্থায় বাস করত, যাদের অনেককে শুধুমাত্র খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের তাগিদেই সৈন্যবাহিনীতে আশ্রয় খুঁজতে হোত। উপরন্তু ছিল জোর জুলুম। কারো কারো আবার অতিরিক্ত লোভ ছিল লুঠের অংশে। অনেক বিদেশী আক্রমণকারী লুঠ করা অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে নারী জাতিকেও যুক্ত করে নিত। এই সেদিনও বাংলা দেশে পাকিস্থান বাহিনী যা করেছে। অবশ্য এই শ্রেণীর বাহিনীকে 'দেশ রক্ষী' বললে অসত্যই প্রকাশ পাবে এবং এর পবিত্রতাও ক্ষুণ্ণ হবে। প্রকৃত পক্ষে কোন সভ্য দেশের প্রতিরক্ষা কর্মীর পক্ষে এমন নৈতিক অধোগতি সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই তাঁরা দেশ-বিদেশের সকল চেতনাশীল মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। অপরিচিত একজন সৈনিককে মানুষ যতটা বিশ্বাস করতে পারে অন্যকে তা যে পারে না'তার মূলেও থাকে এই চারিত্রিক নিষ্ঠা। তবে এর সঙ্গে মূল প্রশ্নের কোন সম্বন্ধ নেই।

বলা হয়ে থাকে, 'কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা কেবল আত্মরক্ষামূলক, আর এই কারণেই এর সব অঙ্গই যোজিত হয় সর্ব-সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায়।' এখানে আরও বলা হয়, 'পৃথিবীর সকল অংশে কমিউনিস্ট কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেলে প্রতিরক্ষার এই প্রয়োজনই আর থাকবে না। অর্থাৎ সেদিন সৈন্য, সমরাস্ত্র সবই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। জনস্বার্থবিরোধী শক্তিগুলি বহু অংশে সক্রিয় বলেই আজকের এই ব্যবস্থা।' কিন্তু এ-বক্তব্য যে সঠিক নয় এবং এ-ধারণাও ঠিক নয়, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির পরস্পর সংঘাত আর সংঘর্ষই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এর পর কেবল 'আত্মরক্ষামূলক' কিংবা 'জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতাই এর ভিত্তি' এ-বক্তব্যও অসার হয়ে হয়ে পড়ে।

আসলে বক্তব্য ও ব্যবস্থায় অসঙ্গতি ঠিক যে কোথায় এবং কার সঙ্গে কার প্রভেদ কতটুকু, সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝে উঠা প্রায় অসম্ভব। বরং ব্যবস্থা যার যাই থাক, নীরবে তারা সমর্থন করে এবং কিছু বলার সুযোগ পেলে আরও শক্তিধর হওয়ার পক্ষেই মত প্রকাশ করে। কিন্তু কী ভাবে শক্তির সমাবেশ হলে শুধু দেশ নয়, এ দ্বারা সমগ্র দেশবাসীর সকল স্বার্থই সুরক্ষিত হবে সে-ধারণা স্পষ্ট প্রকাশ পায় না বলে বহু ক্ষেত্রে সমর্থন শাসকশ্রেণীকে স্বেচ্ছাচারী হতেই প্ররোচিত করে। পর রাজ্য গ্রাস বা লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যার সাহস এরই ফল। এর গোড়াকার কারণ অবশ্য সমাজের বৃহত্তর অংশের দারিদ্র্য ও পরনির্ভরতা। কিন্তু প্রতিবাদহীন ঔদ্ধত্যের নৈতিক প্রভাব সমাজের এক বৃহত্তর সংখ্যক মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ে ও আত্মস্থ হতেও ত পরাঙ্মুখ করে। সাবলীল চেতনা বিকাশে এর গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সমাজে যত অন্যায়, অবিচার ও অব্যবস্থা স্থায়ী হতে পেরেছে তার মূলে আছে জনাকয়েক মানুষের ঔদ্ধত্যের কাছে বাকী সকল মানুষের নতি স্বীকার। আর যে-সমাজের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটেছে তার কোথাও এর পরিবর্তনের পথও উন্মুক্ত নেই। নেই অর্থে, যে-পরিবর্তন সঠিক, তাকে চিনে নেবার শক্তি অধিকাংশের ভিতর না জাগে সেটাই এ-সমাজের মৌল সাধনা। ফলে বেশীর ভাগ মানুষের ভিতর এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল হতে পেরেছে যে, সর্বসাধারণের মতামত নির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শুধু দেশের নিরাপত্তার পরিপন্থী হবে তাই নয়, এতে সমগ্র সমাজ এবং শাসন ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়বে। কল্পনা লালিত এই সম্ভাব্য পরিণতিটা বিশ্বের যেকোন শান্তিকামী মানুষের কাছে অবশ্যই ভীতিকর। কাজেই এর পরিবর্তনের প্রশ্নও স্তব্ধ হতে বাধ্য।

অথচ বিষয়টিকে ঠিক যুক্তিগ্রাহ্য স্তরে উন্নীত করলে স্পষ্টই দেখা যাবে, আশংকার কিছুমাত্র হেতু এতে নেই। আর সঠিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ হলে আশংকাটা হবে নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। কারণ প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজের সার্থকতাই এই যে, জনগণকে অক্ষম, অবিবেচক বা অবিশ্বাস করার মত আর একটি পক্ষ সেখানে

থাকে না। থাকতে পারেই না। ফলে জনগণ অতি সহজেই আত্মসচেতন, কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। কোনটা ঠিক আর কোনটা নয় এবং দেশের স্বার্থে সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত কী, এই বোধশক্তি যাঁদের থাকে তাঁদের উপর প্রতিরক্ষা কেন, যেকোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ন্যস্ত থাকলেও দেশের কিছুমাত্র ক্ষতির আশংকা থাকা সম্ভব নয়। অবিশ্বাসের স্থান খাঁটি সমাজতন্ত্রে নেই। বিশ্বাসই এর ভিত্তি। আর অবিশ্বাস না থাকলে সম্ভবত কোন অন্যায়ই সেখানে স্থায়ী হতে পারে না। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা,—প্রতিরক্ষায় সমগ্র উদ্যোগটাই হয় যদি কেবল আত্মরক্ষামূলক, আক্রমণাত্মক চিন্তার ঠাঁই যদি সেখানে না থাকে এবং ভীতিকর পরিবেশের সাহায্যে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার প্রয়োজনও না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে অন্তত স্বদেশবাসীকে অবিশ্বাস করার কোন যুক্তিই থাকে না। বিশ্বাসের পরিবেশ থেকেই বরং সকল অধিবাসী আত্মরক্ষার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারে এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বর্তমানের সঙ্গে এর প্রভেদ কোথায়, একটু আলোচনা করলেই হয়ত স্পষ্ট হবে। কিন্তু তার পূর্বে আর একবার স্মরণ করা ভাল যে, সমাজের মূল ব্যাধি হলো, পরস্পর অধিকারের সংঘাত ও ক্ষমতার কাড়াকাড়ি। অবিশ্বাসের প্রধান হেতুও এই। কোন সমাজ এই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারলে তার পক্ষে কোন ব্যবস্থাপনাই আর সমস্যা হতে পারে না।

যেমন ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথাই ধরা যাক। বর্তমানে এর শক্তির পরিমাপ করতে না পারলেও এ-শক্তি যে দেশবাসীর যথেষ্ট আস্থা এবং শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে এতে কারো সন্দেহ নেই। প্রতিরক্ষা শক্তির সঠিক পরিমাপ ক্ষমতা সাধারণ মানুষের কখনই থাকে না। সে-প্রয়োজনও কেউ বোধ করে না। সর্বকালে সব দেশে এটাই রীতি। এ-কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু ৫৫ কোটি মানুষের একটি দেশ স্বাধীনতার ২৮ বছর পরেও যে অপরের রক্তচক্ষু স্তব্ধ করার শক্তি সবটা পায়নি তার জন্য ব্যথা একটু সে-দেশবাসীর আছে বই কী? অপরের হুমকি চিরতরে স্তব্ধ হয়েছে, এটাই তারা

কায়মনে কামনা করে। অথচ বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এটা এতই ব্যয়সাধ্য যে সে-ভার বহন করার সামর্থ এই দরিদ্র দেশবাসীর নেই। এর ভিতর ৭০ ভাগ মানুষের অবশিষ্ট আছে কেবল পৈতৃক প্রাণটা। নতুন কোন চাপ এলে কেবল সেটাই তারা দিতে পারবে। কাজেই প্রয়োজন সামর্থের অভাবেই যদি গুরুত্ব হারিয়ে থাকে তবে তা কিছুমাত্র দোষের নয়। কিন্তু এর পাশে সমাজতান্ত্রিক ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে যদি ঠিক ওই চেতনা দ্বারাই চিত্রিত করা যায় তবে দেখা যাবে, সেখানে অতিরিক্ত কেন, আজকের আর্থিক চাপই বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং পরনির্ভরতার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও আর নেই। উপরন্তু এ হবে স্বল্পব্যয়ী ; দ্রুত গতিশীল ও সম্পূর্ণ স্বনির্ভর। হবে শান্ত অথচ দুর্ধর্ষ। এর শক্তি হবে চির অপরাজেয় কিন্তু অপরের পরিপূর্ণ আশংকামুক্ত।

কিন্তু এটা হবে কী করে ?

ধরা যাক ভারতের লোক সংখ্যা ৫৫ কোটি এবং এর ভিতর ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের সম্পূর্ণ সুস্থ ও সক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা হবে অন্তত ১০ কোটি। এই ১০ কোটি মানুষের সকলেই উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে প্রতিরক্ষার অংশীদার হবেন। এঁদের শিক্ষা সুরু হবে স্কুল ও কলেজ থেকে এবং বয়স্কদের অন্যত্র। এর জন্য প্রতিটি রাজ্যে থাকবে একাধিক শিক্ষাকেন্দ্র। থাকবে প্রতি রাজ্যে একটি ডিগ্রি কলেজ এবং সমগ্র দেশে একটি বা দুটি সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিটি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং সাধারণ কলেজে এর জন্য অন্তত একজন করে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবেন। এঁরা সপ্তাহে অন্তত দু'দিন করে প্রতিটি ছাত্রকে এই শিক্ষা দেবেন। স্কুল ও সাধারণ কলেজের সামরিক শিক্ষার্থীরা তাঁদের বছরের দুটি দীর্ঘ ছুটির কিছু অংশ নিকটবর্তী সামরিক কলেজ অথবা সামরিক ট্রেনিং কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবেন। এর পর উপযুক্ত শিক্ষার্থীরা আরও উন্নত শিক্ষার জন্য যাবেন সামরিক কলেজে এবং সব শেষে সম্ভাবনাময় ছাত্ররা সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। সামরিক শিক্ষার সব ব্যয়-ভার বহন করবেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং এর প্রতিটি

বিষয়ই হবে বাধ্যতামূলক বা অবশ্য পালনীয়। এ গেল প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়,—উপযুক্ত শিক্ষা শেষেও ৪০ বছর বয়স অবধি বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়ে নিকটবর্তী সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রের সাহায্যে তালিম অক্ষুণ্ণ রেখে শরীর, মন ও সংগ্রাম শক্তিকে এঁরা এমনভাবে প্রস্তুত রাখবেন অর্থাৎ, একজন নিষ্ঠাবান সৈনিক যেভাবে তাঁর সমরশক্তি ও চেতনাকে তাজা রাখেন ঠিক সেইভাবেই তৈরী রাখতে বাধ্য থাকবেন, যেন প্রয়োজনের ২৪ ঘণ্টার ভিতরই সকলে দুর্ধর্ষ যোদ্ধার মত সমরক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। প্রয়োজনের গুরুত্ব ও পরিবারের লোক সংখ্যা; সমর ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার ক্রমিক মাধ্যম হবে এই দু'টি বিষয়। স্বাভাবিক সময়ে এঁদের কেউ হবেন ডাক্তার, ইনজিনীয়ার, শিক্ষক, শ্রমিক, কেরানী, চাষী কিংবা কেউ দায়িত্বশীল উপদেষ্টা, কিন্তু দেশ আক্রান্ত হলে সকলেই হবেন দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ সুশৃঙ্খল সৈনিক। তখন কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ভারতের সুশিক্ষিত সৈন্য সংখ্যা হবে ১০ কোটি। এঁদের কেউই ভাড়া করা নয়, মাইনের বন্ধনে বন্দী নয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মাহুতি দিয়ে শহীদ হওয়ার প্ররোচনায়ও কেউ উদ্বুদ্ধ নয়, সকলের একটিই মাত্র পরিচয়, তাঁরা 'দেশরক্ষী'। লক্ষ্য ও গতির উৎস, পরিবার-পরিজন ও দেশকে রক্ষা করা এবং দেশের গৌরব বৃদ্ধি করা। অতএব এর বেগ অবশ্যই হবে দুর্বার। হবে অপ্রতিরোধ্য। সমগ্র দেশবাসীর সমর্থন ও সহযোগিতাও হবে অকৃপণ আর স্বতঃস্ফূর্ত। জন-চেতনা কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত থাকলে এটা হতে বাধ্য।

অন্যদিকে ঠিক এমনিই হবে সমাজতান্ত্রিক ভারতের যুদ্ধাস্ত্র। যাঁরা আজ যুগোপযোগী শক্তিসঞ্চয় থেকে অপরের আশ্বাসের আশ্রয়কে বেশী নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত ভাবছেন, তাঁদের সঙ্গে ওই আশ্বাসদাতা বন্ধুরাও দেখতে পাবেন, এমন কোন অস্ত্র আবিষ্কার হয়নি বা হওয়া সম্ভব নয়, যার নির্মাণ কৌশল ভারতের অজানা এবং প্রয়োজন বোধে নির্মাণ করেনি। বস্তুত সেদিনের ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমন একটি স্তরে উন্নীত হবে যার রুদ্র অথচ ক্ষমাশীল মূর্তির সামনে প্রতিটি

সংগ্রামশীল আর সংগ্রামলিপ্সু শক্তিই স্তব্ধ হয়ে যাবে। শ্রদ্ধায় মাথা নত করে প্রতিটি জাতি হিংসা ও বিভেদ জয়ের পাঠ নেবে। আর সেদিন সত্য সত্যই 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

অবশ্য যতদিন না পৃথিবীর সকল দেশই প্রকৃত সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠছে কিংবা শোষণশীল ও আক্রমণশীল শক্তির বিলুপ্তি ঘটছে অর্থাৎ, বিবাদের মূল উৎস ব্যক্তি ও দল শাসনের অবসান হয়ে সর্বসাধারণের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা আসছে, ততদিন সীমান্ত রক্ষার্থে কিছু সংখ্যক সৈন্য সর্বক্ষণের জন্য সক্রিয় থাকবেই। এটা মধ্যবর্তী ব্যবস্থা এবং এখানেও মূল ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের সকলেই পর্যায়ক্রমে এ-দায়িত্ব বহন করবেন। এতে কোন একজন দেশবাসীকেই জীবনের মোট ছ'মাসের বেশী এ-কর্তব্যে নিয়োগ থাকতে হবে না। এই সময় অন্তে এঁরা সাবেক কাজেই ফিরে যাবেন এবং এই সময়ও এঁরা মূল কর্ম-ক্ষেত্রের সম পরিমাণ আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগই পাবেন। অতিরিক্ত পাবেন সামরিক ভাতা এবং পরিবারের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এ-কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে, পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে রাজতন্ত্র, দলতন্ত্র এবং অন্য যেকোন শ্রেণীতন্ত্রের স্থলে প্রকৃত জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেলে প্রতিরক্ষার এই প্রয়োজনই সকল দেশের শেষ হয়ে যাবে।

রাজনীতি ও বিশ্বশান্তি

বিশ্বশান্তির বুলি বোধহয় একদল বিশ্বমানুষ ফ্যাশান হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। নেতা, উটকো নেতা, হবু নেতারা ত আছেনই, এমন কী গাঁয়ের ঐ হারু চৌকিদার অবধি আজ বিশ্বশান্তির কারবারী। ধনতন্ত্রের অছিরা বিশ্বশান্তির পুজারী, এক দলতন্ত্রী কমিউনিস্টরা এই সাধনায় ধ্যানস্থ এবং সাম্রাজ্যবাদী বা অভিভাবকবাদী শক্তিগুলি —যারা আজও পররাজ্য গ্রাস করে আছে বা নানা ছলে সেই ফিকির খুঁজছে তারাও বিশ্বশান্তির দাবীদার। সুতরাং এত সব শান্তিবাদীর চাপে পড়ে বিশ্বেরই নাভিশ্বাস উঠেছে কিনা জানা নেই, কিন্তু

পৃথিবীব্যাপী সাধারণ মানুষ যে ত্রাহি ত্রাহি রব তুলেছে এটা স্পষ্টই শুনা যাচ্ছে।

শাসকশ্রেণী চিরকালই অমিত শক্তিধর, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্ববিদ্যা বিশারদ এবং জনগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। যিনিই ওই তক্তে বসুন বা বসতে চান প্রায় সকলেরই ব্যক্ত ভাবখানা এই। তবে গণমতের তোয়াক্কা বোধ হয় কেউই করেন না। বিপাকে পড়লে তখন একটু ভান করেন মাত্র। অর্থাৎ তন্ত্র যাঁর যাই থাক 'জনগণ যে চিরকালই অজ্ঞ' এতে সন্দেহ কারো জাগ না। সুতরাং এই তথাকথিত অজ্ঞ মানুষগুলির অন্তিমকাল উপস্থিত হলে তখন সেটা যে তাদের নীরবেই মেনে নিতে হবে এবং সমগ্র শাসককুলকেও 'মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী' ভাবতে হবে এতেই বা সন্দেহের আছে কী? পৃথিবীর প্রায় ৪শ' কোটি মানুষকে যাঁরা খুশীমত চালনা করতে পারেন, দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হতে পারেন তাঁদের সকল জ্ঞানের মূল উৎস ত এই শক্তিতেই নিহিত রয়েছে।

কিন্তু মুস্কিল হোল 'জনমত' ও 'বিশ্বশান্তি' এই দুটি বিষয়ের ভিতর আত্মীক সম্বন্ধ এত নিবিড় এবং প্রথমটির প্রভাব ও গুরুত্ব এতই বেশী যে একে বাদ দিলে দ্বিতীয়টি হবে কেবল তামাসা। হতে বাধ্য। আর বিশ্বের শান্তিও যদি শুধুমাত্র যুদ্ধ, যুদ্ধাস্ত্রের প্রতিযোগীতা কিংবা কুটনৈতিক মতবিরোধ থেকেই ব্যাহত হোত, অর্থাৎ, যে-প্রয়োজনে এসব সংঘটিত হয় তা অন্যভাবেও চরিতার্থ হওয়ার পথ পেত তবে তামাম রাষ্ট্রকর্তারা এইসব ত্যাগ করতে ক্ষণমাত্রও দ্বিধা করতেন না। আসলে অশান্তির মূলে এগুলি নয়। এ হচ্ছে মূল হেতুকে সুরক্ষিত রাখার কয়েকটি সহজ উপায় মাত্র। হয়ত বা অন্যের তুলনায় বেশী কার্যকর এই অবধি। কিন্তু আদত বিষয় হোল মানসিক শান্তি। আর সার্বিক মানুষের মানসিক শান্তি হোল বিশ্বশান্তির মৌল উপাদান। এ-শান্তি ব্যাহত হয় বঞ্চনা ও ভীতি থেকে। বঞ্চনার প্রয়োজনে ভীতির সৃষ্টি এবং যুদ্ধ, যুদ্ধাস্ত্র বা হুমকি এরই পরিণতি। সহজ কথায়, একদল ধূর্ত মানুষ বাকী সমগ্র মানুষকে ঠকাতে চায় ও তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায় আর তারই জুতসই অবলম্বন হোল

বিশ্বজোড়া এই ভীতিকর অশান্তির পরিবেশ। পৃথিবীর অন্তত ৩/৪ অংশ মানুষ এর শিকার এবং যতদিন বাকী ওই ১/৪ মানুষের হাতে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব থাকবে ততদিন বিশ্বশান্তি দূরে থাক, মানুষের স্বাভাবিক প্রাপ্য শান্তিটুকুও সুদূর পরাহত।

অবশ্য পৃথিবীর প্রায় সকল অংশে নিয়ত অশান্তি, সংঘাত ও প্ররোচনা আছে বলেই যে পৃথিবী-ধ্বংসকর একটি সংগ্রামে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়বেন এমন মনে করার হেতু নেই। কারণ ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যাবে, সভ্যতার সূচনা থেকে যে বা যাঁরাই রাষ্ট্রকর্তৃত্বে থাকুন,—যুদ্ধ বাধাবার ক্ষমতাও কেবল এঁদেরই থাকে,—তাঁদের মুখ্য লক্ষ্য থাকে সর্বাধিক ক্ষমতা ও সম্মান ভোগ করা। কারো কারো অবশ্য সম্পদটাও লক্ষ্য হয়। সর্বসাধারণের আনুগত্য আর রাষ্ট্রযন্ত্রকে সর্বেসর্বার ভূমিকায় রাখতে চান এঁরা এরই জন্য। এর বাইরের আর সবটাই প্রায় গৌণ। কাজেই পৃথিবী ধ্বংস হলে এঁদের এই মূল উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হবে সে-সম্বন্ধে এঁরা অন্যের তুলনায় অনেক বেশী সতর্ক। বস্তুত ধ্বংস নয়, এঁরা চান শুধু ধ্বংসের বিভীষিকা। পৃথিবীব্যাপী সাধারণ মানুষের মনে এই বিভীষিকা জাগিয়ে রেখে এবং এর জন্য ভিতর বাইরে ছোটখাটো সংঘর্ষ বাধিয়ে এঁরা চান উদ্দেশ্যকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে। এটাই চিরকালের ইতিহাস।

আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধভীতি আছে বলেই যুদ্ধাস্ত্রের ফলাও ব্যবসা চলেছে। শিল্পসমৃদ্ধ বিশেষ কয়েকটি দেশ এ-ব্যবসায়ে ফেঁপে উঠছে এবং অনুন্নত দেশগুলির আশংকা, পরনির্ভরতা আর তার সাধারণ মানুষের দুর্গতির মাত্রা বাড়ছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা অন্তর্হিত হলে ওই অস্ত্র-ব্যবসায়ী দেশগুলির ক্ষতি হবে অপরিসীম। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সেখানে বেকার হবেন, জাতীয় আয় বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং দুর্বল ও অস্ত্রক্রেতা রাষ্ট্রগুলির উপর প্রভাব প্রয়োগের সুযোগ সীমিত হয়ে এক সময় স্বদেশবাসীর চোখেই এই রাষ্ট্রব্যবস্থার ভাবমূর্তিটা ম্লান হয়ে পড়বে। তবে এই সব সমৃদ্ধ রাষ্ট্রই যে আবার দুর্বল রাষ্ট্রকর্তাদের ভরসাস্থল, তাঁদের

শক্তির একটি প্রধান উৎস, কাজেই এঁদের কারোই দুশ্চিন্তার হেতু নেই। বরং 'যুদ্ধভীতি বা সামাজিক অশান্তি যে একটি স্থায়ী বিষয়, কোনদিক থেকেই এর পরিসমাপ্তি সম্ভব নয়' এই প্রশান্তি আছে বলেই যত্রতত্র এঁদের বিশ্বশান্তির বুলিটা উচ্চগ্রামে উঠে থাকে। আর মুখে এঁরা যে যাই বলুন পরিবর্তনের শক্তি অন্যত্র সক্রিয় হয়ে পরিবর্তনকে অনিবার্য করে না তুললে এঁদের বর্তমান সক্রিয়তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটবে এমন ধারণার আদৌ কোন মূল্য নেই।

আজ সারা পৃথিবীব্যাপীই চলেছে মানুষে মানুষে তীব্র স্বার্থের সংঘাত। এ-সংঘাত পূর্বেও ছিল কিন্তু আজকের মত এতটা ব্যাপক আর ন্যায়হীন নয়। কাজেই কেবল বুলি নয়, শান্তির জন্য চাই পরস্পর স্বার্থের সমন্বয়। রাষ্ট্রের গণ্ডীতেই হোক, কিংবা বিশ্বরাষ্ট্রেই হোক, সার্বিক মানুষের ভিতর একটি স্বার্থের সমন্বয় ভিন্ন প্রকৃত কোন শান্তি দেখা দিতে পারেনা। আর সার্বিক মানুষের ভিতর এই স্বার্থের সমন্বয় ঘটতে পারে একমাত্র রাজনীতিমুক্ত সমাজেই। কারণ রাজনীতি শ্রেণীস্বার্থের সমর্থক শুধু নয়, শ্রেণী স্বার্থের অছি। কোন তন্ত্রের প্রভাবে এর আপাত তারতম্য যদিও বা কিছু ঘটে, কিন্তু মূল অবস্থার পরিবর্তন কিছু হয় না। হওয়া সম্ভবই নয়। আর বঞ্চনা ও শোষণ থাকলে সেখানে সংঘাত এবং অশান্তি থাকবেই। নীতিকথা, আশ্বাস বা দমন-পীড়ন এর একটি থেকেও ওর আত্মপ্রকাশ রুদ্ধ হয়না। কাজেই শান্তির মূল সূত্রই হোল রাষ্ট্রের উপর শ্রেণী বিশেষের স্থলে সমগ্র অধিবাসীর সক্রিয় কর্তৃত্ব।

একটি দেশ তার সার্বিক মানুষের স্থায়ী শান্তির পথ পেলে তা বিশ্বদেশে ছড়িয়ে পড়বেই। তার সূত্রও সকলে জানতে চাইবে এবং জানবে। তখন বিশ্বের সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে একটি বিশ্ব করপোরেশন গঠিত হওয়া এবং বিশ্বের তাবৎ মানুষকে স্বার্থের সমন্বয়ে আবদ্ধ করে পরস্পরের নিকটবর্তী, সহযোগী ও শুভানুধ্যায়ী করা কিছুমাত্র শক্ত হবে না। রাষ্ট্রিক সম্পদ কোথাও ন্যায্য অংশে বিভক্ত নয় এবং রাষ্ট্রকর্তৃত্বে থেকে একদল মানুষ আরও কিছু মানুষের যোগাযোগে অধিক সংখ্যক মানুষকে নিয়ত ঠকাচ্ছে

বলেই প্রতিটি রাষ্ট্রে ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অশান্তি লেগে আছে। কিন্তু রাষ্ট্রে শ্রেণী কর্তৃত্বের স্থানে সার্বিক কর্তৃত্ব থাকলে অনিবার্য ভাবে উৎপাদন ও বণ্টন কর্তৃত্বও তাদের থাকবে। আর এই ভাবে সকল রাষ্ট্রমানুষের হাতে এই ক্ষমতা এলে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ আরও বেশী স্বস্তি ও ভোগের তাগিদেই একে অপরের সহযাত্রী ও শুভানুধ্যায়ী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে তার অবদান ও প্রাপ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকলে একটি সুখী একান্নবর্তী পরিবারে যে-শান্তি স্বভাবতই বিরাজ করে পরিবর্তিত এই সামাজিক পরিবেশে ঠিক ততটা নাও যদি হয় তবু দুটি সৎ ও সহৃদয় প্রতিবেশীর ভিতর যে-হৃদ্যতা ও সহযোগিতা থাকে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের ভিতর তেমন সম্বন্ধ না গড়ে উঠাব কিছুমাত্র হেতু নেই। বর্তমানে বিবাদলিপ্ত বিশ্বে মানুষের চেতনায় একটি সঠিক পথের সন্ধান দিতে আজ ওইটুকুই কী যথেষ্ট নয় ?

সমাজতন্ত্রের সারথি

মানব সমাজে সমস্যার অন্ত নেই। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন দিক থেকেই এ-সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। এর ভিতর কিছু থাকে প্রকৃতিদত্ত আবার কিছু মানুষেরই সৃষ্টি। মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যাও এক নয়, বিভিন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সৃষ্টি। তবে এটা বাহ্য। আসলে একদল বিশেষ মানুষই এ-সমস্যার উদ্যোক্তা। কেবল তাই নয়, এঁরা প্রকৃতিদত্ত সমস্যাকেও নানাভাবে কাজে লাগিয়ে থাকেন। কাজে লাগাবার পরিবেশ সৃষ্টি করেন এবং সমর্থকও সৃষ্টি করেন অত্যন্ত দক্ষতায়।

এই সমস্যাসৃষ্টিকারীরা যদিও কয়েকটি ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, কিন্তু লক্ষ্য প্রায় এক ও অভিন্ন। একে অপরের পরিপূরক ও পরিপোষক। এর ভিতর প্রধান পক্ষ কারা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব কেউ নস্যাৎ করতে পারেন না। ক্ষমতালিপ্সুরা হন এখানে এই দায়িত্বহীনতার সমর্থক।

আর অন্য যাঁরা পক্ষ হন তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষকে যথাযথ মূল্য দিয়ে সঙ্গে আসেন নিজেদের প্রাপ্য বাড়াবার লোভে। তবে সংঘাত এখানেও আছে, কিন্তু তার গোত্র স্বতন্ত্র; সাধারণ মানুষের সমস্যার সঙ্গে মিল খুব সামান্যই। বরং এঁদের সংঘাত থেকে যে-সমস্যা সৃষ্ট হয় তারও ভার এসে পড়ে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। সুদূর অতীত থেকে বইছে এই ধারা। এমন কী আজকের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রও প্রায় মিশে পড়েছে এই ধারায়। সমাজের বহু পরিবর্তন বহুবার হয়েছে, পূর্বোক্ত ওই শ্রেণীগুলির অনেক উত্থান-পতন হয়েছে এবং একের স্থান অন্যে দখল করেছেন, কিন্তু 'জনগণ' অর্থে যে প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ তারা অনেকটা একই স্থানে অবস্থান করছে। অথবা হয়ত বলা চলে, 'রাইফেলই শক্তির উৎস' এবং 'বন্দুকের নল থেকেই রাষ্ট্রক্ষমতা বেরিয়ে আসে'—অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তা মাও-সে-তুং এর রাষ্ট্র-দর্শনকে কোথাও কেউ অসার প্রতিপন্ন করতে পারেন নি। বরং প্রায় প্রত্যেকের চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে, যিনি যতবড় সমাজবিপ্লবীই হোন, রাষ্ট্রক্ষমতা আর রাষ্ট্রের বড়কর্তার আসনটাই তাঁর শেষ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে অন্য কিছুর গুরুত্ব যদিও বা স্বীকার করতে হয়, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছে বন্দুকের নলকেই মনে হয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর একটি কারণ বোধহয় অন্য কিছুকে ওই গুরুত্ব দিতে চাইলে তাঁর আর এখানে থাকা চলে না। অর্থাৎ সত্য নিরূপণে তথ্যের যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে তবে এ-ধারণাটাই বড় হয়ে ওঠে যে, শ্রেণী বিশেষ রচিত নেতৃত্বের সর্বাধিক প্রগতিশীল আর উদার চরিত্রেও থাকে যে কর্তৃত্বপ্রিয়তা বা অভিভাবকসুলভ প্রবৃত্তি, একটি পরিপূর্ণ স্বাধীন চেতনাকে তা কখনই সহ্য করতে পারে না।

দ্বিধা ত আছেই এবং বহু যুক্তি ও তথ্য উপস্থিত থাকলেও কিছু মানুষের মনে এটা থাকবেও। এঁরা প্রশ্ন তুলবেন, 'রাজতন্ত্র বা ব্যক্তি-তন্ত্রের পরিবেশ না হয় আত্মকেন্দ্রী এবং শাসনযন্ত্রের ভিতর দিয়ে এর রেশ অন্য সব তন্ত্রে পড়েছে তাই আজকের কোন নের্তৃত্বের পক্ষে হয়ত এ-প্রভাব কাটানো কিছুটা শক্ত, কিন্তু আগামী দিনে এমন নের্তৃত্বের উদ্ভব কি সম্ভব নয়, যার দ্যুতি দেবে এই পরিবেশকে মুছে, লক্ষ্য

থাকবে একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ বা সমাজতন্ত্রের দ্বারোদ্ঘাটন অবধি সীমিত এবং জনগণকে তথায় অভিষিক্ত করে নিজেও যাবেন তাদের সঙ্গে মিশে ?'

এ-প্রশ্নের গুরুত্ব কিছু আছে। আর অন্য কোন বিষয় হলে বলতেই হোত, অনাগত ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা নিশ্চয় করে বলা চলে না, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বোধ হয় তা চলে। কারণ রাজনীতিক ভিন্ন অন্য কারো এখানে নেতৃত্ব দেবার সুযোগ নেই। অন্য কেউ এলেও তাঁর গণ্ডী থাকে নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ। বহুকাল পূর্বেই সমাজে এটা এসেছে। কিন্তু রাজনীতির নিজস্ব একটা গতি আছে এবং এ-গতি কোন রাজনীতিককে রাষ্ট্রক্ষমতার লক্ষ্য অবধি পৌঁছে দিলেও জনগণের উপর কোন ক্ষমতা অর্পণ অথবা সমাজের সকল মানুষকে সমমূল্যে গ্রহণ করার শক্তির যোগান দিতে পারে না। একে এক অর্থে মোহও বলা চলে। তবে রাজনীতিতে এটা অপ্রতিরোধ্য। রাজনীতির প্রথম পাঠ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং পরে সমাজ ও জনগণের কল্যাণ। কাজেই প্রথম লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিবন্ধক শক্তিকে পরাস্ত করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি লক্ষ্যমাত্রা জনগণের উপর কর্তৃত্ব অর্পণ করায় নিবদ্ধ থাকলেও এই জনগণের কাল্পনিক অমঙ্গল আশংকায় কিংবা দেশের নিরাপত্তার স্বকল্পিত প্রয়োজনে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার যুক্তি হবে অপরিবর্তনীয়। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ শক্তিকে স্তব্ধ রাখতে হবে। আর সব শেষে প্রশাসনযন্ত্রকে যেকোন মূল্যেই বশে আনতে হবে। যদিও এর একমাত্র তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হবে 'দেশ ও জনগণের কল্যাণ।' অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত প্রয়োজন আড়ালে রাখতে অপ্রয়োজনেও সামাজিক প্রয়োজন ফাঁপিয়ে তুলতে হবে এবং এ-প্রয়োজন একসময় আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও পরিণতি লাভ করবে। এখন অবধি বিশ্বের কোথাও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটার লক্ষণ প্রকাশ পায়নি।

বলা হচ্ছে, 'আজকের মানুষ অনেক বেশী সচেতন, কোনটা যুক্তি-গ্রাহ্য আর কোনটা নয়, তা তারা বোঝেন।' হয়ত এর কিছুটা সত্য। কিন্তু বুঝবার শক্তি ত রাজনীতিকদেরই বেশী। চালাক মানুষ ভিন্ন

সফল রাজনীতিক হতে পারেন না। কাজেই জনগণের বুঝবার শক্তি বাড়লে ধরে নিতে হবে রাজনীতিকরা আরও বেশী সতর্ক হতে পেরেছেন। তাঁদের কলাকৌশল বেশী নিশ্ছিদ্র হয়েছে। বস্তুত সমাজে পরস্পর ব্যবধান, বৈষম্য এমন কী তার বিরূপ প্রভাব সবই সহ্যকর ও যুক্তিসিদ্ধ হয়েছে রাজনীতির উৎকর্ষতারই কৃপায়। উৎকর্ষতায় এ প্রায় চরম পর্যায়ে না পৌঁছিলে কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রা কয়েকজনের 'গণতান্ত্রিক অধিকার' সংজ্ঞায় অচল হতে পারত না। রাজনীতিকরা আরও বেশী সতর্ক হতে পেরেছেন বলেই পূর্বের নীতিশাস্ত্র ও মানবিক অধিকারের চরিত্র এভাবে পালটে যেতে পেরেছে। এসব ক্ষেত্রে গণঅধিকারের যে-স্তুতি সে বোধহয় আশান্বিত আত্মসমর্পণেরই আমন্ত্রণ। এর সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ত তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক অর্থাৎ, কমিউনিস্ট শাসন। সার্বিক রাষ্ট্র-মানুষ তাঁদের অধিকার অর্জনের আশ্বাসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শুরুতে সন্দেহাতীত আস্থা ও আনুগত্য ছিল। আর নেতারা গণমনে এমন একটি ধারণার উন্মেষ ঘটাতে পেরেছিলেন যে, তাদের ওই অধিকার অর্জন-কার্যটা সহজ ও ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনেই প্রতিবাদী ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি এবং মতকে স্তব্ধ রাখা অপরিহার্য। অথচ পরবর্তী ঘটনার ব্যক্ত অংশে আর সব কিছুর সাক্ষাৎ মিললেও ওই গণঅধিকার বস্তুটিই রয়েছে অধিকাংশের চোখে অদৃশ্য।

এরপর স্বভাবতই প্রশ্ন থাকছে, 'তা হলে একটি ন্যায়নিষ্ঠ বা সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে পৌঁছিবার পথ কী? এত আস্‌মান থেকে পড়বে না।' তা ঠিক। তবে এও ঠিক যে, কঠোর নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের দুর্জয় সঙ্কল্প যদিও এর শেষ কথা কিন্তু সর্বশেষ কথা হোল, প্রয়োজন-বোধটা প্রত্যেকের অন্তর থেকে জাগা চাই এবং এই জাগ্রত চেতনা সম্পূর্ণভাবে অপরের উপর নির্ভরতামুক্ত থাকা চাই। অন্যথায় যে-সকল স্বার্থসন্ধানী শক্তি লোলুপ দৃষ্টিতে সতত ওত পেতে থাকে গণমনের প্রতিটি অভিযোগ এবং তাদের দুর্বলতা, উদারতা ও ভাব-প্রবণতাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে সেই শক্তি এই ভাবান্তরকেও হাতিয়ার করবে। অর্থাৎ আত্মত্যাগ বা আত্মপীড়নের গুরুত্ব যতই থাক,

আত্মনির্ভরতার চেতনা অপরের কর্তৃত্ব অস্বীকারের শক্তি অবধি না পৌঁছিলে একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের দিকে জনগণ এক কদমও এগোতে পারবে না। নেতৃত্ব এখানে অবশ্যই স্বতন্ত্র বিষয়।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৭০ থেকে ৮০ ভাগ হোল সাধারণ মানুষ এবং এরাই বঞ্চিত, শোষিত ও নির্যাতিত। কিন্তু এরাই আবার উদার, সংবেদনশীল, ধর্মভীরু ও ভাবপ্রবণ। এদের নির্যাস ধনীর মূলধন, এদের শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ ও রক্ষার হাতিয়ার এবং এদের রক্তমাংসই বাকী ২০ থেকে ৩০ ভাগ মানুষের সকল সুখ, শান্তি ও প্রতিপত্তির উৎস। এই শেষের লোকগুলির প্রত্যেকের বর্ণ ও পরিচয় আলাদা, কিন্তু গোত্র এক। অর্থাৎ এঁরা শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সুদখোর মহাজন, জমিদার, সরকারী কর্তাব্যক্তি কিংবা রাজনীতির ব্যাপারী, যে-পরিচয়েই সমাজে বিচরণ করুন, ওই ৭০-৮০ ভাগ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ওদেরই শ্রম-রসে পুষ্ট। আর এর ভিতর প্রধান শরিক যে রাজনীতির ব্যাপারীরা একথা ক্ষমতাহীন রাজনীতিকরাই সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে থাকেন। জনশক্তি ও জনচেতনার উপর এঁদেরই প্রভাব অধিক। কাজেই সামাজিক সব অন্যায়ের দায়িত্বও মূলত এঁদের। রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে কোন রাজনীতিকই এ-দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। সুতরাং অতীতের ইতিহাস থেকে যদি কিছুমাত্র শিক্ষণীয় উপকরণ বর্তমানের কাজে লাগাতে হয় তবে এ-যুক্তি মেনে না নিয়ে উপায় থাকে না যে, যাঁদের প্রয়োজন অথবা অবহেলায় সমাজের প্রায় সকল অন্যায়, অবিচার ও অশান্তির জন্ম, বিকাশ এবং স্থিতি, তাঁদের কর্তৃত্বচ্যুতি যেমন একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তেমনিই একাজে বিন্দুমাত্র সফল হতে হলেও এঁদের প্রগলভ প্রভাব এড়ানো হবে অপরিহার্য। এ অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং এ-শক্তি আছে কেবল ছাত্র, যুবক ও কিছুটা মা-বোনেদের। এঁদেরই হতে হবে সমাজতন্ত্রের সারথি। শোষিত ও বঞ্চিত মানুষদের শক্তি ও প্রেরণার উৎস। কবি, শিল্পী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি গুণীজনেরা যোগাবেন প্রেরণা এবং দেখাবেন সঠিক পথের নিশানা। প্রস্তাবটায় অভিনবত্ব কিছু নেই। নেই তার কারণ এঁরা চিরকালই

সামাজিক আন্দোলনের অগ্রদূত। যদিও স্পষ্টই দেখা গেছে, ছাত্র, যুবসমাজ অথবা স্ত্রীজাতি যখনই কোন আন্দোলনে নেমেছেন, তার পিছনে থেকেছেন কোন রাজনীতিক বা তাঁদেরই কোন দল। সক্রিয় নেতৃত্বে না থাকলেও পরোক্ষে তাঁরাই করেছেন উদ্বুদ্ধ, কোথাও বা প্ররোচিত। আর শেষ অবধি সব আন্দোলনই হাতিয়ার হয়েছে তাঁদের। এর ব্যতিক্রম থাকলে সে-আন্দোলনের গোত্র স্বতন্ত্র। কিন্তু এখানে প্রকৃতই যা বলতে চাওয়া হয়েছে সে হোল, সামগ্রীক অন্যায় প্রতিকারে সার্বিক মানুষের আত্মনিয়োগ যেমন অপরিহার্য, তেমনি এর সফল পরিণতির জন্য চাই রাজনীতি ও মোহমুক্ত চেতনা। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে অন্তত রাজনীতিকদের মোহ কাটিয়ে ওঠা শক্ত।

এ-বিষয়ে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের একটি উক্তি স্মর্তব্য। তিনি বলেছিলেন, 'ক্ষুদ্র রাজনীতি আমার বিচরণভূমি নয়। রাজনীতি কেবল ক্ষুদ্র হয়না, পরন্তু আপামর জনসাধারণকে নিয়ে যে-ব্যাপক ক্ষেত্র রয়েছে সেখানে এর কোন স্থান নেই।' যদিও এর পরেও বক্তা নিজে রাজনীতিমুক্ত হয়েছেন কিংবা জনগণকে অন্য একটি সঠিক পথের হদিস দিতে পেরেছেন সে-সংবাদ প্রকাশ পায়নি। বরং এর চেয়ে কিছুটা সবল যুক্তিই বহু পূর্ব থেকে বহুবার ব্যক্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে রাজনীতির প্রভাব বিদ্যমান এবং নিয়তই বাড়ছে তার প্রধান কারণ অন্য কোন অবলম্বন নির্ভরযোগ্য যুক্তি নিয়ে উপস্থিত হয়নি। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ত আছেই কিন্তু অবলম্বনহীন চেতনায় ভীতিটাই হয়ত প্রধান বাধা। এর আরও একটি দিক আছে এবং কিছুটা তা অনেকের কণ্ঠে ব্যক্তও হয়েছে, 'রাজনীতিমুক্ত গণ-জাগরণ যদি কোন দিন সফল পরিণতির রূপ নেয়ই তবে পেশাদার রাজনীতিক-রাই হয়ত সর্বশক্তি প্রয়োগে তাকে প্রতিরোধ করতে নামবেন। তখন দেখা যাবে কোন রাজনীতিক এবং দলই স্বতন্ত্র নয়। যেমন কোন বিশেষ একটি দলকে পরাজিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শের বহু দলও অনেক সময় একত্র হয়ে থাকেন।' সুতরাং সমাজতন্ত্রের সারথিদের শুরু থেকেই অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে এবং

মানসিক প্রস্তুতিটা এই স্তর অবধি নিয়ে যেতে হবে যে, তাদের শেষ সংগ্রাম করতে হবে সমগ্র রাজনীতিক ও রাজনীতির সঙ্গেই। কারণ বঞ্চিত, অবহেলিত ও নির্যাতিত মানুষের মূল শত্রু হোল রাজনীতি। রাজনীতিই ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ ও সার্বিক কল্যাণের অন্তরায়। এর একটি ছোট্ট উদাহরণ এখানে স্মরণ করা চলে।

দারিদ্র্য, কর্মহীনতা ও দুর্নীতির প্রতিকারে যে-সকল আদর্শবাদী তরুণ ও ছাত্র অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে একদিন কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার গঠনে যথার্থ সাহায্য করেছিলেন তাঁরাই কিন্তু শেষ অবধি দলীয় নেতাদের প্রভাবে মূল বিষয় ছেড়ে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। আবার যে-যুবক ও ছাত্রদল এই হানাহানি দমন করে রাজ্যটিকে এক অরাজক অবস্থা থেকে রক্ষা করলেন এবং নবগঠিত কংগ্রেসকে গদিতে বসালেন বহু রক্তদানে, তাঁরাও অবশেষে প্রায় একই পথের পথিক হয়ে পড়লেন। অর্থাৎ দেশ ও দেশবাসীর প্রয়োজনের তাগিদে যে-কল্যাণমুখী চেতনা এঁদের উভয়ের ভিতর জেগেছিল, ক্ষমতাবিলাসী রাজনীতির স্পর্শ পাওয়া মাত্র তার চরিত্রটাই পালটে গেল। এটাই নিয়ম। রাজনীতির তপ্ত স্পর্শে সব বৃহৎ চেতনারই কিছুটা সঙ্কোচন ঘটে এবং এক গণ্ডীবদ্ধ সংকীর্ণ চেতনায় রূপান্তরিত হয়। অন্তত আজ অবধি পৃথিবীর সর্বত্র তাই হয়েছে।

ছাত্র, যুবক ও স্ত্রীজাতিকে বলা হয়েছে সমাজতন্ত্রের সারথি হতে। কিন্তু কেন এঁরা এ-দায়িত্ব বইবেন? প্রশ্নটা সঙ্গত। তবে এর উত্তরও অত্যন্ত সহজ এবং বোধহয় সঠিকও—শক্তিধররাই শক্ত কাজের কাণ্ডারী, উপরন্তু প্রয়োজনটা এঁদেরই অধিক। আগামী দিনের ভাল-মন্দের প্রায় সব ফসলটাই ভোগ করবেন আজকের ছাত্র ও যুব সমাজ। সমাজদেহে অশান্তির আগুন থাকলে জ্বলে পুড়ে মরবেন এঁরাই। অথবা বঞ্চনার পরবর্তী লক্ষ্য যেমন এঁরা, প্রতিটি যুদ্ধ আর মারণাস্ত্রের শিকারও হবেন এঁরা। চিরকাল তাই হয়ে থাকে। এই ত মাত্র সেদিনের ঘটনা,—পশ্চিমবঙ্গে যে-খুনের প্রতিযোগিতা চলেছিল (এখনও হয়ত জের মেটেনি) তার প্রায় সব

কটি শিকারই ছিলেন হয় কোন ছাত্র, নয়ত যুবকদের ভিতর কেউ। অন্য দিকে প্রায় এমন একটি অবস্থাই রয়েছে স্ত্রীজাতির সামনে। কায়েমী শ্রেণীস্বার্থ-পুষ্ট সমাজে স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়তই ত পিষ্ট হচ্ছেন, কিন্তু পরিণত শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে আগামী দিনে আরও যে-বৃহত্তর দাবানল জ্বলে উঠার অবশ্যম্ভাবীতা রয়েছে তার আহুতি থেকে রক্ষা করতে কোন ভূমিকাই যদি এঁরা না নেন তবে সে-লজ্জা হবে অপরিসীম। অন্তত ভবিষ্যৎ পুত্র-কন্যারা এই নিষ্ক্রিয়তাকে 'ক্ষমার চোখে দেখবেন' এ-ধারণা ভুল। আজকের বাবা-খুড়ো-জেঠারা বাকী দিনগুলির জন্য চাইবেন আপোস। অন্যায় আর অবিচারের সঙ্গেও করতে চাইবেন সহাবস্থান। যেমন একদিন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখলের অনাবশ্যক হিংস্রতাকেও এঁরা প্রতিবাদহীন গা-সহা করে নিয়েছিলেন। যদিও এর অর্থ ঠিক এই নয় যে এঁরা সকলেই ভীরু বা আত্মসর্বস্ব। আসলে অভ্যস্ত সংস্কার আর বয়েসের ভারই এঁদের স্তব্ধ রাখে। রাখবেও হয়ত।

আমরা প্রায় সকলেই লক্ষ্য করেছি; যে-যুব সমাজের মাথায় সংসারের গুরুভার পড়েনি, ছাত্র সমাজ—যাঁদের সামনে এই কলুষ স্বার্থান্ধ সমাজের মৌল তত্ত্ব নগ্ন হয়নি এবং স্ত্রীজাতি—যাঁদের প্রধান লক্ষ্য ও কামনা একটি সুস্থ সাবলীল পরিবেশ আর স্বামী-পুত্র-কন্যার সুখ, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা—তাঁরা অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে চান না। বরং সব অন্যায়েরই প্রতিবাদ করেন এবং কায়মনে চান মানুষের কল্যাণ। সীমিত এঁদের স্বার্থচেতনা এবং উস্‌কানি না থাকলে নিষ্ঠায় ও সংকল্পে প্রায়ই থাকেন অটল। সুতরাং এ-ধারণা মোটেই অমূলক নয় যে, রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থাকলে এঁরাই একদিন গড়তে পারবেন সেই সমাজ,—যেখানে মানুষের অভিযোগ করার সকল হেতুই যাবে অন্তর্হিত হয়ে। একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ বা সঠিক সমাজতন্ত্র অর্থে কী বুঝায় এবং কী অথবা কারা এর অন্তরায় সেটা সঠিকভাবে জানতে পারলে অর্থাৎ, রামের স্থলে শ্যাম রাজা বা মন্ত্রী হলে সমাজের মৌল পরিবর্তন কী ও কতটা হয়, অথবা গণ আকাঙ্ক্ষিত কোন পরিবর্তন আদৌ সম্ভব কিনা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে কেবল

সেটুকু যাচাই করার শক্তি পেলে এই সমাজ গড়া এঁদের পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত হবে না। এর সঙ্গে দুঃসাহসের সম্বন্ধ হয়ত কিছুটা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাজ্ক্ষার দুঃসাহস।" কাজেই নিষ্ঠা যেমন চাই, দুঃসাহসও সেই সঙ্গে কিছুটা চাই বই কী?

এই সমাজগড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন এঁরা তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে নিজেদের মনোনীত ও দেশের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচিত করে। আর রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র এবং সর্বগ্রাসী একদলতন্ত্রে প্রশাসন যন্ত্র ও সৈন্যবাহিনীকে সত্যের সন্ধান দিয়ে তাঁদের সাহচর্যে সার্বিক মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তবে পূর্বেই বলেছি, এ-কাজ খুব সহজ নয়। এ-সম্ভাবনা সফল পরিণতির দিকে এগোলে পেশাদার রাজনীতিক মাত্রই যে প্রতিরোধে সক্রিয় হবেন এও বলেছি। এ-সক্রিয়তা শুধু গালভরা যুক্তি কিংবা 'গেল গেল' রবেই শেষ হবে মনে করার হেতু নেই। বরং সংঘাতের সম্ভাবনাটাই এক্ষেত্রে বেশী। অবশ্য দেশ এবং দেশবাসীর কল্যাণ যাঁদের মূলমন্ত্র এবং রাজনীতির দ্বারস্থও হয়েছেন এরই সফল পরিণতির আশায়; তাঁরা এ-গণচেতনার মূল্য দেবেন। সঙ্গীও হবেন।

এ-প্রসঙ্গের আরও একটা দিক আছে যার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং এর জন্য প্রথম থেকেই সতর্কতার প্রয়োজন। এ হোল, যা কিছুই ঘটুক তার প্রতিকারে কোথাও যেন চণ্ডরূপ কিছুমাত্র প্রশ্রয় না পায়। কারণ এটা হবে চূড়ান্ত অজ্ঞতারই পরিচয়। আর এ-অজ্ঞতা গর্বিত হতে পেলে সমগ্র শুভ চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ-ইতিহাসে আজও অন্য কিছু লেখা যায় নি। আর সমাজ বিপ্লবের উদ্দেশ্য হয় যদি সমগ্র সামাজিক মানুষের কল্যাণ, তবে মানব রক্তের বিনিময়ে তা কিছুতেই অর্জিত হতে পারে না। এই আশ্বাস বা যুক্তিযুক্ততা কিছু ধূর্ত মানুষের ফন্দী। দুর্বল আর ভাবপ্রবণ মানুষের সুলভ রক্তে এঁরা ক্ষমতার অধিকারী হতে চান। আত্মস্ফীতির পথ খোঁজেন। অনুন্নত সমাজে এ-রক্ত সস্তা তাই 'বিপ্লব' বুলিটা সেখানে বিকোয়ও

ভাল। যদিও এই ফন্দীবাজ ব্যক্তিরা নিজেদের রক্তকে কখনই সস্তা করেন না। অপরকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করে নিজেরা থাকেন নিরাপদ দূরত্বে। হাতের কাছেই এর কিছু প্রমাণ রয়েছে এই পশ্চিম বঙ্গে। এখানকার বহু বিপ্লবী নেতা,—যাঁরা নিয়তই জনগণকে প্রেরণা দেন বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেতে কিন্তু নিজেরা খোঁজেন কড়া পুলিশ প্রহরা। 'সার্বিক কল্যাণে গণরক্ত অপরিহার্য না ও যদি হয়, অযৌক্তিক নয়' এই যুক্তি শেষেও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ প্রিয়জনদের ওই 'গণ'দের সঙ্গী করেন না।

এতে নতুনত্ব নেই। এটা ইতিহাস। উত্তেজনাকর পরিবেশ আর প্রচারে ভাবপ্রবণ মানুষ এ-ইতিহাস ভুলে যায়। আরও ভুলে যায় যে, একদল দুর্বল মানুষের বক্ষরক্তে একদল শক্তিধর মানুষই লাভবান হতে পারেন, সমাজের সকলের বা এর স্থায়ী কল্যাণ কিছু হয় না। কাজেই দেশের মঙ্গল করার শক্তি যদি কিছু নাও থাকে অন্তত এই নরঘাতী প্ররোচনাকে ঘৃণা করতে না পারলে সে হবে তার মনুষ্যত্বেরই অবমাননা। আরও স্পষ্ট হোল, মানুষের কল্যাণের যুক্তিতে যাঁরা মানুষকেই খতম করার পরামর্শ দেন তাঁরা প্রকৃত অর্থে কেউই মানুষ নন। চেতনাশীল মানুষ এঁদের ঘৃণা না করে পারে না। সমগ্র মানুষ নিয়েই মানবসমাজ। সমাজবদ্ধতার প্রয়োজনও সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য। আর সুখ-দুঃখ মূল্যবোধটা সামাজিক প্রভাবে কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে প্রকাশ পেলেও ব্যথার অনুভূতি প্রায় সকলেরই সমান। অন্তত আপন প্রিয়জন বিয়োগ-ব্যথা থেকে অন্যের এ-ব্যথা যে কিছুমাত্র ন্যূন নয় এই হচ্ছে মানবীয় চেতনার সর্বনিম্ন লক্ষণ। কারো এ-চেতনা না থাকলে তাঁকে ঠিক আর মানুষের পর্যায়ে ফেলা যায়না। বাইরের দিকটা তাঁদের সমাজব্যবস্থার দৌলতে গুরুগম্ভীর মনে হতে পারে এবং কারো কারো আশ্বাস, আস্ফালন বা তত্ত্বকথায় প্রচুর নির্ভরতার খোরাক জুটতেও পারে, কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট করেই বলা যায়, মানুষকে সঠিক কিছু দেবার বস্তু তাঁদের ভিতর থাকে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এ-ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য, "বর্বরতা বলিষ্ঠতার মর্যাদা গ্রহণ করে আপন পতাকা আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে রক্তপঙ্কিল মৃত্যুর মধ্য

দিয়ে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগীর সাংঘাতিক আক্ষপকে যেন আমরা শক্তির পরিচয় বলে ভুল না করি।”

সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার সৈনিকদের অবশ্যই অস্ত্র হবে প্রীতি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। এই অস্ত্রেই এঁদের জয়ী হতে হবে। জয়ী এঁরা হবেনও। সকল মানুষের জন্য স্থায়ী কোন কল্যাণ অর্জনের এ ভিন্ন অস্ত্র নেই। ‘আছে’ বা ‘থাকতেও পারে’ এ-উক্তি ওই অজ্ঞতারই এক গর্বিত প্রকাশ অথবা কিছু দুষ্টলোকের ফন্দীঘটিত প্রলাপ। স্ত্রীজাতি, ছাত্র এবং বন্ধনমুক্ত যুব সমাজের সম্মিলিত শক্তি এক দুর্বার শক্তি। এঁরা এগিয়ে এসে ডাক দিলে প্রতিটি সাধারণ মানুষই সঙ্গী হবেন। এর কারণ এঁরা প্রকৃতই মুক্তি চান। চেয়েছেন চিরকালই, কিন্তু এ-বোধ স্পষ্ট হওয়ার অবকাশ ঘটেনি যে, তাঁরা আর যারই শিকার হোন হয়েছেন মূলতঃ রাজনীতির। অর্থাৎ ‘রাজা, রাজনৈতিক দল বা রাজনীতি ভিন্ন রাষ্ট্র অচল এবং মানুষের অগ্রগতিই অসম্ভব’ এই ধূর্ত প্রচারে তাঁরা বিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এ যে মিথ্যা, শ্রেণী বিশেষের প্রভুত্বের প্রয়োজনে এ-সব উক্তি রচিত এবং যত অবহেলা, অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস সবেরই মূলে থাকে ওই প্রভুত্ব, এই সত্য স্পষ্ট হলে কোন শক্তিই আর এঁদের নিবৃত্ত বা গতিরোধ করতে পারবে না।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের গণপ্রতিনিধি

সমাজতন্ত্র অর্থে বলা হয়েছে, একটি সমগ্র রাষ্ট্রমানুষের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজ। এই সমাজবাসীর স্বার্থ, দায়িত্ব ও অধিকারের পরিধি নিয়ে পূর্বে কিছু আলোচনা হয়েছে এবং সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র সহ সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর সকলের সম অংশ আর কর্তৃত্বের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে সকলে সব কাজ তো করতে পারেন না, কোটি কোটি অধিবাসীর পক্ষে সেটা অসম্ভব। কাজেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব পালনে ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ মানুষের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে এবং সেখানেও দৈনন্দিন সমস্যা নিরসনে একদল নির্বাচিত

প্রতিনিধির দায়িত্ব হবে অপরিহার্য। উৎপাদন, বণ্টন, রাষ্ট্রশাসন, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই গণনির্বাচিত একদল মানুষ কাজ করবেন সমগ্র দেশবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে। এঁরা কর্তা নয়, কেবল প্রতিনিধি। সুতরাং সার্বিক পরিকল্পনা কিংবা জনগণের মৌল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের পূর্বে গণঅভিমত গ্রহণ হবে এঁদের অবশ্য কর্তব্য। সমাজকে ন্যায়নিষ্ঠ হতে হলে গণঅভিমত আর গণসহযোগিতাই তার মৌল উপাদান। তবে প্রসঙ্গটির গোড়ার কথা হবে প্রতিনিধি নির্বাচন এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও অধিকারের পরিধি নিয়ে।

অবশ্য একটা চূড়ান্ত অভিমত এখুনিই ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, এর নিষ্পত্তি হবে আগামী দিনের অধিবাসী কর্তৃক। আমরা শুধু মধ্যবর্তী একটি রূপরেখা টানতে পারি এবং তাকেই গণদরবারে উপস্থিত করতে পারি। অর্থাৎ আমরা এই সম্ভাবনার যুক্তিযুক্ততা যাচাই করতে বলতে পারি যে, জনগণ তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন প্রতি ৪ কিংবা ৫ বছর অন্তর এবং এর সূচনা হবে প্রতিটি পূর্ববর্ণিত বণ্টনকেন্দ্র থেকে। বণ্টন ও সরবরাহ কেন্দ্রই হবে সমগ্র নির্বাচন কার্যের কেন্দ্রবিন্দু।

পরিচিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনব্যবস্থা মূলত দুটি অংশে বিভক্ত। এর একটি জনগণ কর্তৃক নির্বাচন এবং অন্যটি নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচন। এর গুণাগুণ নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। এমনকি বহু দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ব্যবস্থার মত এক্ষেত্রেও সরাসরি জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংগত কিনা তা নিয়েও তর্ক চলতে পারে। কিন্তু এ-তর্ক পরিবর্তিত সমাজেব অভিমতসাপেক্ষ মুলতবী থাকাই বোধ হয় সংগত। এখানে বরং পরিচিত ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে তাকে কতটা গণনির্ভর ও আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যের অনুকূল করা সম্ভব তারই সন্ধান করি এই যুক্তিতে যে, এর দোষত্রুটিগুলি যেমন পরিচিত, সংশোধন করতে চাইলে সেটাও হবে কিছুটা সহজ। অর্থাৎ পরিকল্পিত নির্বাচন কার্যটা হবে পরিচিত ব্যবস্থার মত দুটি অংশেই কিন্তু কয়েকটি নির্দিষ্ট স্তরে বিভক্ত হয়ে। যথা :—

প্রথম অংশ

(ক) যে-একহাজার পরিবার নিয়ে একটি বণ্টনকেন্দ্রের কথা বলা হয়েছে তার সকল সদস্যসহ প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হবেন সদস্যদের ভিতর থেকে ২০ জন সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি। যদিও বর্তমান কোম্পানী আইনে একমাত্র সদস্য ভিন্ন অন্য কারো ভোটাধিকার নেই। কিন্তু সঠিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এ-ব্যবস্থা অবশ্যই সংগতিহীন আর এই কারণেই আইন সংশোধন ও পূর্বকথিত ব্যবস্থা গ্রহণ হবে অপরিহার্য। নির্বাচনের নৈতিক মূল্যের সবটাই হোল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমগ্র মানুষের শুভেচ্ছা। কাজেই প্রত্যক্ষ সদস্য না হলেও স্বার্থ আছে এমন কাউকেই এখানে অপাঙক্তেয় ভাবা চলে না।

(খ) ২০টি বণ্টনকেন্দ্র নিয়ে যে একটি সরবরাহ কেন্দ্র গঠিত হবে তার সমুদয় সদস্য ও প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসীর ভোটে নির্বাচিত হবেন প্রতিটি বণ্টনকেন্দ্র থেকে ৫ জন সরবরাহকেন্দ্র প্রতিনিধি। এ ক্ষেত্রেও ওই আইনঘটিত সমস্যা এবং সমাধানও হবে ওই একই ভাবে।

বণ্টন ও সরবরাহ কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্যরা এই নির্দিষ্ট বছরগুলির জন্য এর পরিচালনাভার গ্রহণ করবেন। উপরন্তু স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থাগুলি, যথা—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পৌরপ্রতিষ্ঠান, খেলাধূলা প্রভৃতির পরিচালনাভারও থাকবে এঁদেরই উপর। তবে এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সক্রিয় ব্যক্তিদের ভিতর থেকে উপযুক্ত কয়েকজনকে এঁরা যথাযোগ্য মর্যাদায় সঙ্গী করে নিতে বাধ্য থাকবেন।

(গ) প্রতি দুটি সরবরাহকেন্দ্র অঞ্চলের সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীর ভোটে নির্বাচিত হবেন একজন রাজ্য তথা অঞ্চল প্রতিনিধি।

(ঘ) প্রতি ১০টি সরবরাহকেন্দ্র অঞ্চলের সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীর ভোটে নির্বাচিত হবেন একজন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি। এই সমগ্র নির্বাচন কার্য একই দিনে সম্পন্ন হবে এবং হবে বণ্টনকেন্দ্রকে ভিত্তি করে।

দ্বিতীয় অংশ

(ক) নির্বাচিত সমগ্র রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি কর্তৃক প্রতি সদস্য প্রতি এক ভোট ও তার সম মূল্যমানের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রপতি।

(খ) কেন্দ্রীয় সদস্যদের ভিতর থেকে তাঁদের দ্বারা এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে গঠিত হবে একটি সর্বাধিক যোগ্য মন্ত্রী পরিষদ। প্রতি রাজ্য তথা অঞ্চল থেকে সম মর্যাদায় একজন করে এই মন্ত্রী পরিষদে স্থান পাবেন এবং এঁদেরই ভিতর একজন হবেন প্রধান মন্ত্রী। সিকি, আধা বা তিন পো কোন মন্ত্রী থাকবেন না আর প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব, অধিকার ও মর্যাদা থাকবে সকলের উপর।

(গ) প্রতিটি রাজ্যে রাজ্য প্রতিনিধিদের ভিতর থেকে তাঁদের দ্বারা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ ও রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে গঠিত হবে একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার রাজ্য পরিষদ। এই পরিষদ পরিচিত হবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অঞ্চল বা রাজ্য প্রতিনিধি বলে। এখানেও একজন মুখ্য প্রতিনিধি থাকবেন। ইনি রাজ্য বা অঞ্চল মুখ্যমন্ত্রী বলে পরিচিত হবেন। কিন্তু ব্যবহারিক ও নৈতিক মূল্যে এই প্রতিনিধিদের সকলেরই মর্যাদা হবে সমান। সিকি, আধা, তিনপোর স্থান এখানেও নেই এবং এঁদের মোট সংখ্যা ৫ থেকে ৭ এর বেশী কিছুতেই হবেনা।

(ঘ) করপোরেশনের মূল সভাপতি এবং রাজ্য সভাপতিরা নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক। কেন্দ্রীয় গণপ্রতিনিধিরা মূল সভাপতি এবং অঞ্চল বা রাজ্য প্রতিনিধিরা রাজ্য সভাপতির নাম সুপারিশ করবেন। কিন্তু এই সব মনোনীত ব্যক্তিদের অতি অবশ্যই শিল্প, বাণিজ্য, পরিকল্পনা, অর্থনীতি ও ন্যায়ধর্মে দেশের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি বলে পরিচিত হতে হবে।

মূল সভাপতির উপদেষ্টা থাকবেন ৫ থেকে ৭ জন এবং রাজ্য সভাপতিদের ২ থেকে ৩ জন। এঁদের নির্বাচন করবেন মূল সভাপতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা এবং রাজ্য সভাপতির ক্ষেত্রে

মন্ত্রীসভার রাজ্য প্রতিনিধিরা। এসব উপদেষ্টাদেরও পূর্বোক্ত গুণাবলী হবে অপরিহার্য।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন একটি বণ্টন কেন্দ্রের সদস্য না হলে কোন নির্বাচনেই কেউ প্রার্থী হতে পারবেন না। তাঁর ভোটাধিকার থাকবেনা এবং তাকে এদেশের নাগরিক বলেও গণ্য করা হবে না। এ ভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্যপ্রতিনিধিদের অবশ্যই স্থানীয় অধিবাসী হতে হবে। এবং তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিটি বণ্টন ও সরবরাহ কেন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রেখে চলতে হবে। সমগ্র নির্বাচন কার্যে বণ্টন কেন্দ্রগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্য হবে অপচয়, অপব্যয় ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বন্ধ করা। ন্যূনতম এবং শেষ অবধি প্রায় বিনা ব্যয়ে সর্বাধিক উপযুক্ত জন প্রতিনিধি (দল প্রতিনিধি নয়) নির্বাচন করাও এর আর একটি উদ্দেশ্য। প্রতিনিধি বাছাই থেকে আনুষ্ঠানিক নির্বাচন অবধি সব দায়িত্ব স্থানীয় অধিবাসীদের যৌথ কর্তৃত্বে থাকলে এর আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যকে অবজ্ঞা করার সামর্থ কোন তরফেই জাগতে পারেনা। অবশ্য রাজনীতি এবং এর ব্যাপারীদের নস্যাৎ করার শক্তি দ্বিধাহীন সুদৃঢ় হলে এই প্রশ্নই তখন অবান্তর হবে। কারণ এই শক্তি সমগ্র সামাজিক মানুষকে সুস্থ, সবল ও ন্যায়নিষ্ঠ করবে তাই নয়, মানুষের সকল সমস্যা-গুলিকেও সরল আর সহজ সমাধানযোগ্য করে তুলবে।

আদত হচ্ছে সমগ্র সমাজব্যবস্থার সরলীকরণ। বিশেষ করে অর্থনীতি ও প্রশাসন যন্ত্র যত সরল হবে মানুষের জীবনযাত্রাও তত সহজ ও কল্যাণমুখী হবে। ঠক্‌বার ও ঠকাবার প্রয়োজন মুছে যেয়ে সেখানে যৌথ দায়িত্ব আর সার্বিক মানুষের অগ্রগতির চেতনা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। রাষ্ট্রযন্ত্র-সহ সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থাকে গুরুগম্ভীর করা হয়েছে একদল ধূর্ত মানুষের কর্তৃত্ব কায়েম রাখার প্রয়োজনে। রাষ্ট্রের সব রস নিংড়ে এবং সব শক্তিকে কুক্ষিগত করে এঁরা চিরকাল বাকী মানুষকে পদানত রাখতে চান। রাজতন্ত্রের পর দলতন্ত্র হয়ত এরই রকমফের কৌশল তাই নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিরাও অনেকে সহজেই কর্তা বা অভিভাবক হয়ে ওঠেন। বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায়

এর প্রতিকার সম্ভাবনা সীমিত। কাজেই সব বিষয় ও ব্যবস্থাকে সকল অধিবাসীর বোধগম্যের নাগালে আনতে হলে নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। এটা সম্পূর্ণ হলে সেখানে রাজ্যপাল, রাজ-প্রমুখ, রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতি পদগুলিও হবে অনাবশ্যক। সবশেষে নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিরা এই অধিকারকে তাঁদের পেশায় পরিণত করতে পারবেন তেমন সম্ভাবনা অবশ্যই প্রতিহত হবে। এটা যুক্তি-যুক্তও। কারণ প্রায়ই দেখা গেছে, জন প্রতিনিধিত্ব পেশা হওয়ার সুযোগ পেলে সেটা প্রায় আত্ম-প্রতিনিধিত্বের রূপ নিতেই প্ররোচিত হয়ে থাকে। আর 'রাষ্ট্রপরিচালনায় রাজনীতি অপরিহার্য', 'দলহীন গণতন্ত্র অবাস্তব কল্পনা এবং গণ-স্বার্থের পরিপন্থী', কিংবা বিরূপ মন্তব্য মাত্রই 'প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত' প্রভৃাত অভিমতগুলি বিভিন্ন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র-ধ্বজাধারী রাষ্ট্রের গণদের যে গেলাবার চেষ্টা চলে সে বোধহয় ওই পেশারই প্রয়োজনে। অথচ এও ত মনে হতে পারে, গণরাই যদি সর্বেসর্বা তবে সেখানে কয়েকজন মাত্র রাজনীতিক বা শ্রেণীবিশেষের নীতিগুলিই বা সর্বাত্মক হবে কোন যুক্তিতে আর চক্রান্তই বা করবে কার বিরুদ্ধে কে এবং কেন?'

'গণতন্ত্রে গণ-প্রতিনিধিরা কেবলমাত্র নিয়মরক্ষা বা শোভাবর্ধনের জন্য নির্বাচিত হন না' এ-বক্তব্য যেমন নির্বাচকমণ্ডলী শুনতে পান, তেমনি এও হয়ত অধিকাংশ 'গণ'রা আশা করেন না যে, তাঁদের নির্বাচিত ব্যক্তিরা কেবলমাত্র দলীয় নির্দেশকেই মান্য করে চলবেন আর জনগণের চোখে পরিচিত থাকবেন কর্তা রূপে। বিশেষ করে অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত কোটি কোটি মানুষের রক্তেভেজা অর্থে একদল শৌখিন বিশ্বচিন্তাবিদ বা বিশ্বরাজনীতিকের পত্তন হবে আর কয়েক বছর অন্তর অন্তর তাঁরা তাঁদের দখলী এলাকায় ফিরে এসে কিছু অর্থ ও আশ্বাস মূল্যে নতুন করে 'নির্বাচিত' এই পত্তনি নিয়ে আবার রাজধানীতে বসেই কর্তব্য শেষ করবেন এমন কামনা অন্তত ওই মানুষগুলি করতে পারে না। সাধারণ মানুষ চায় তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহচর্য ও সহযোগিতা। কাজেই পরিবর্তিত সমাজে গণ-প্রতিনিধিদের কর্তব্য হবে নিজ নিজ অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে

একত্রে তাদের কর্তব্য কাজে সাহায্য করা এবং তাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলি যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত করে তার সফল পরিণতি ঘটাতে সাহায্য করা। এ-কাজ কিন্তু জনগণের ভিতর থেকে তাদেরই একজন না হলে সম্ভব নয়। কারণ এই প্রয়োজনের গুরুত্বই অপরের বোধগম্য হবে না। যেমন দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের অনিচ্ছা বা বাধ্যতা-মূলক অনাহারের জ্বালা কিছুমাত্র পরিমাপ করতে পারেন না কোন ধনী ব্যক্তি কিংবা স্বেচ্ছাঅনশনকারী। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ক্ষুধার পীড়ন কিছুটা অনুভব করা যায় হয়ত, কিন্তু অভাবের দরুন না খেতে পাওয়ার যে-মানসিক দাহ সেটা তাতে বোধগম্য হয় না। সহজ কথায়, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের অংশীদার না হলে যিনি যা কিছুই করবেন বলুন, সেটা বেশী ক্ষেত্রে তামাসাতেই পরিণত হয়। কিন্তু এর চেয়েও বড় হল, সমাজ এমন একটি সংবিধান দ্বারা অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হবে, যার প্রতি সমগ্র দেশবাসীর থাকবে প্রশ্নাতীত আনুগত্য এবং সে-সংবিধানে এই চেতনাকে সক্রিয় রাখার শক্তিটাই প্রধান হবে যে, 'দেশ' অর্থে একটিই মাত্র অস্তিত্ব, কোন রাজ্য তথা অঞ্চল বিশেষের লাভ-ক্ষতি বা সমস্যার আলাদা গুরুত্ব নেই। অর্থাৎ সকলের সব লাভ-ক্ষতি ও সমস্যা একই দৃষ্টি থেকে একই অর্থে বিবেচিত ও মীমাংসা হবে এবং হবে দেশের সকল মানুষেরই সম্মতি ক্রমে। সামাজিক লাভ-ক্ষতি ও সমস্যার সঙ্গে তার ফলভোগের দায়িত্বটাও যদি প্রত্যক্ষভাবে দেশের সকল মানুষের সমান থাকে তবে সেখানে কল্যাণকর পরিণতি হবে অবশ্যম্ভাবী ও প্রশ্নাতীত।

জন প্রতিনিধি নির্বাচনে সম্ভাব্য যে-পদ্ধতি ব্যক্ত হোল, তার বণ্টন কেন্দ্রের ২০ জন সদস্য একটি কমিটি গঠন করে দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করবেন। এঁরা প্রতি ৬ মাস অন্তর সমুদয় সদস্য নিয়ে এই অঞ্চলের সামগ্রীক পরিস্থিতি তথা অঞ্চলবাসীর সার্বিক প্রয়োজন, উৎপাদন ও কর্মক্ষেত্রেব সম্ভাবতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে কীভাবে সব প্রশ্নের সহজ ও দ্রুত মোকাবিলা সম্ভব তার একটা নির্দিষ্ট ছক করবেন। এরূপ ২০টি বণ্টনকেন্দ্রের সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচিত মোট ২০০ জন সরবরাহকেন্দ্র

সদস্য অনধিক ৭ দিনের ভিতর আর একটি আলোচনা সভায় বসে এগুলি সবদিক থেকে পর্যালোচনা করে নিজেদের অভিমত সহ করপোরেশনের রাজ্য সভাপতির কাছে উপস্থিত করবেন। এই সভাপতি তাঁর সকল উপদেষ্টা সহ মন্ত্রীসভার রাজ্য প্রতিনিধি এবং নির্বাচিত অন্যান্য গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমগ্র বণ্টন ও সরবরাহ কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত এবং রাজ্যের অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে যে-নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসবেন তার সঙ্গে বণ্টন ও সরবরাহ কেন্দ্রের অভিমতগুলি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কাছে পাঠিয়ে তার পূর্ণ একটি অনুলিপি করপোরেশনের মূল সভাপতির কাছে পাঠাবেন। এ-দায়িত্ব যথাক্রমে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সভাপতির। রাজ্যসভা সমাপ্তির ৭ দিনের ভিতর এই পাঠাবার কাজ শেষ করতে হবে। এই সভা ডাকবেন মুখ্যমন্ত্রী এবং সমগ্র দেশব্যাপী প্রায় একই সময়ে এই সভার কাজগুলি সম্পন্ন করতে হবে। বণ্টন, সরবরাহ আর রাজ্যগুলির নেওয়া সিদ্ধান্তই হবে দেশের সার্বিক পরিকল্পনা ও বিধিবিধানের মৌল উপাদান। সব কটি রাজ্যের এই উপাদান হস্তগত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও নির্বাচিত কেন্দ্রীয় গণপ্রতি-নিধিরা করপোরেশনের সভাপতি ও তাঁর উপদেষ্টাদের সহযোগিতায় যে-ব্যাপক ও শেষ পর্যায়ের আলোচনা করবেন সেখানেই সব বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ৬ মাস অন্তর প্রতিটি স্তরে সভা বসবে। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সভা করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সকল স্তরেই থাকবে। এ-অধিকার যুক্তিযুক্ত সময়ের নোটিশ দিয়ে কার্যকর করবেন কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্য মুখ্য প্রতিনিধি আর বণ্টন ও সরবরাহ কেন্দ্রে তাঁদের কমিটি।

কেন্দ্রীয় সভার উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির এই দায়িত্ব নিয়ে কেউ বিতর্ক ঘটাতে চাইলে পরিবর্তিত সংবিধানের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু নির্বাচিত মন্ত্রীসভা ও সদস্যদের যৌথ দায়িত্ব যতদিন গুরুত্ব না হারাচ্ছে ততদিন রাষ্ট্রপতি সভার উদ্বোধন ও আনুষ্ঠানিক কর্তব্য শেষে ফিরে যাবেন এবং এর পর

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সভার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হবে। করপোরে-শনের সভাপতি ও তাঁর উপদেষ্টাদের উপস্থিতিটাও এখানে আবশ্যিক হবে প্রধানমন্ত্রীর অপরিহার্য আমন্ত্রণক্রমে। এ-আমন্ত্রণের হেতু, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে এঁদের নেতৃত্বে।

প্রচারিত অর্থে রাষ্ট্রকর্তা মাত্রই জনগণের প্রতিনিধি। রাজা মহারাজারাও বহুক্ষেত্রে নিজেকে 'গণপ্রতিনিধি' বলে থাকেন। তবে রাজতন্ত্রের পর রাষ্ট্রকর্তাদের আর কোন সংজ্ঞায় ব্যক্ত করা রীতি নয়। কিন্তু প্রতিনিধি হলেও কার্যত এঁরা সর্বেসর্বা। রাষ্ট্রশাসন ও সম্পদ বণ্টনে ত বটেই, বস্তুতঃ কোন বিষয়েই জনগণের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থাকে না। প্রকৃত গণরাষ্ট্র কিন্তু সম অংশে সকলের। অন্যত্র জনগণ একটি পক্ষ বা আলাদা অস্তিত্ব আর রাষ্ট্র গণরাষ্ট্র হলে তারা হবে সর্বে-সর্বা। এই দুয়ের ভিতর প্রভেদ প্রচুর। যদিও সেই প্রভেদটা ঠিক কোথায় ও কতখানি এবং কী তার বৈশিষ্ট্য এখনই তা সকলের কাছে স্পষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের জন্য কতটা দিতে হবে তার একটা আনুমানিক তত্ত্ব জানা গেলেও কার কতটা ন্যায্য প্রাপ্য তা কেউ জানে না। গণরাষ্ট্র বা সমাজতন্ত্র সঠিক চরিত্র না পাওয়া অবধি এটা সম্ভব নয়। কারণ একমাত্র সকলের সমবেত বিবেচনা থেকেই দেওয়া নেওয়ার সঠিক পরিমাপ হতে পারে। এ-অধিকার জনগণ কোথাও পায়নি। আর এ-অধিকার না থাকলে অন্য একটি পক্ষ সেখানে প্রবল হবে এবং কার্যত সর্বেসর্বাও হবে। কারণ এ-ক্ষেত্রে রাজারা হন 'সব সন্দেহের অতীত' এবং অন্যত্র 'বৃহত্তর প্রশ্নে জনগণ সঠিক সিদ্ধান্তের উপযোগী নয়' কিংবা 'গণতন্ত্রে জন প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন আগামী দিনের কর্মসূচী উপস্থিত করে প্রতিদ্বন্দ্বী দল এবং ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিযোগীতা-মূলক গণবিবেচনার পরে, কাজেই গণআকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় না এ-ধারণা ঠিক নয়' এই হচ্ছে ব্যক্ত সব যুক্তি। কিন্তু শুধু একটি মাত্র ভোট দেওয়া বা না দেওয়ার সঙ্গে সমগ্র গণ-জিজ্ঞাসার কতটা সম্বন্ধ থাকতে পারে কিংবা সমাজের যে-পরিবর্তন নিয়তই ঘটছে পরবর্তী ৪-৫ বছরের জন্য জনগণ সেখানে স্তব্ধ থাকবে আর কোটি

কোটি মানুষের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর মাত্র কয়েক ব্যক্তি দেবেন এবং ধরেই নিতে হবে তাঁদের কিছুমাত্র ভুল ত্রুটি হবেনা, এ সবই বোধ হয় কিছুটা ভুল সিদ্ধান্ত। অন্তত সমাজতন্ত্রে এ-ধারণা অচল থাকাই সঙ্গত। এখানে বরং সময় এবং সমগ্র পরিস্থিতির সঙ্গেই গণঅভিমতের একটা নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ অপরিহার্য হয়। বণ্টন কেন্দ্রের অভিমতের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের হেতুও এই যে, বছরে অন্তত দুবার দেশের সকল মানুষ তাঁদের পরিবারের কর্তা তথা মূল সদস্যের ভিতর দিয়ে প্রতিটি জিজ্ঞাসা, প্রতিটি অভিজ্ঞতা ও অভিমত প্রকাশ করতে পারবেন। সব কিছু কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মুখ্য দায়িত্ব অবশ্যই নির্বাচিত মন্ত্রীসভার। এ-কথা পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে, রাজ্যে রাজ্যে আলাদা কোন মন্ত্রীসভা থাকবে না—থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার একদল প্রতিনিধি। এর বিকল্প অন্য উন্নত কোন ব্যবস্থাও হয়ত হতে পারে। কিন্তু রাজ্যে রাজ্যে আলাদা মন্ত্রী-ঠাট সম্ভবত জাতির স্বার্থ ও সংহতির কিছুটা পরিপন্থিই হবে। এক্ষেত্রে রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার যে-ধারণা এবং সম্ভাবনাও আজ রয়েছে সেটা শ্রেণীশাসনের দান। কায়েমী স্বার্থ ও কিছু মানুষের কর্তৃত্ব-চ্যুতির আশংকা ভিন্ন বাকী প্রায় ৮০ ভাগ মানুষের এতে হারাবার কিছু নেই।

সমাজতন্ত্র খাঁটি হলে তার যাবতীয় দায়দায়িত্ব বর্তে সম অংশে দেশের সকলের উপর। উৎপাদন, বণ্টন, রাষ্ট্রশাসন কোন ক্ষেত্রেই আলাদা কর্তৃত্বের স্বীকৃতি থাকেনা। জনগণ সব ব্যবস্থার সঙ্গেই হয় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সম্ভবত পূর্ববর্ণিত করপোরেশনই হবে এর মাধ্যম। তবে করপোরেশনের প্রত্যক্ষ এক্তিয়ার বহির্ভূত কোন কোন বিষয়ও থাকবে যেমন দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, ডাক, তার, অর্থদপ্তরের অংশ বিশেষ এবং আইন ও বিচার বিভাগ প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে করপোরেশনের কোন ভূমিকা নেই। সেটা যুক্তিযুক্তও নয়। কাজেই এ সবের উপর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থাকবে মন্ত্রীসভার। এই সভা এবং তাঁদের রাজ্য প্রতিনিধিরা এ-দায়িত্ব যথাযথ পালন করবেন জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে। 'জনগণের প্রতিনিধি' এই মূল চরিত্রের কিছুমাত্র

ব্যতিক্রম প্রকাশ পেলে কিংবা কারো ভিতর অক্ষমতা দেখা দিয়ে সেটা প্রতিকারের অতীত হলে দেশবাসী তাঁর অপসারণ দাবী করতে পারবেন এবং তাঁর নির্বাচকমণ্ডলী যেকোন সময় তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে তৎস্থলে নতুন আর একজনকে নির্বাচন করতে পারবেন। এ-ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

সুস্থ সমাজ দেশের সংগতিকে অস্বীকার করতে পারে না। কাজেই অন্যের বেলায় যেমন, তেমনি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর কেন্দ্রীয় ও অঞ্চল সহযোগী মন্ত্রীরা দেশের সমুদয় মানুষের সংগতির পরিমাপেই যে মাইনে নেবেন এতে সন্দেহ নেই। অন্যান্য ভাতা ও সুযোগের মাপকাঠিও হবে এই। কেন্দ্র এবং অঞ্চলের অন্যান্য সদস্যরা আলোচনা সভা চলাকালীন ভাতা ও যাতায়াত খরচ পাবেন। এই দিনগুলি ভিন্ন এঁরা এঁদের নিজ নিজ কাজেই নিযুক্ত থাকবেন এবং এ-কাজ এঁদের জন প্রতিনিধিত্বের ফলে বিন্দুমাত্রও ব্যাহত হতে পারবে না। আলোচনা সভায় যোগদান এবং প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে এঁরা চাকরী ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ছুটি পাবেন। আর চাকরী না করলে ঐ সময়ের জন্য তাঁদের যুক্তিগ্রাহ্য উপার্জনের আনুপাতিক অংশ প্রাপ্য হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এঁদের মাইনের বন্ধনে আবদ্ধ করা চলবে না। আর্থিক বিচারে লোভনীয় কিছু থাকাও চলবে না।

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি কর্মক্ষম মানুষকে তাঁর যোগ্যতানুযায়ী পরিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র এবং তার সবটুকু ফল ভোগের নিশ্চয়তা দান একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের মৌল কর্তব্য। এর জন্য কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন, নির্মাণ কোন সম্ভাব্য সুযোগই অবহেলার নয়। ঠিক অবহেলা হয়ত কোন সমাজেই নেই। কিন্তু শুধুমাত্র সরকারী, শুধু বে-সরকারী অথবা এই উভয় উদ্যোগের উপর নির্ভর করে পৃথিবীর কোন একটি দেশই এমন অবস্থায় উন্নীত হতে পারেনি, যেখানে দেশের সমগ্র কর্মক্ষম মানুষ তাঁদের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে যোগ্যতানুযায়ী পূর্ণ কর্মশক্তি নিয়োগ করতে এবং তার সবটুকু ফল আদায় করতে পেরেছেন। কর্ম কিছুটা যদিও বা কোথাও সকলের জুটে থাকে এবং শক্তির অতিরিক্তও দিতে হয়ে থাকে কিন্তু স্বাধীন সত্তা কিংবা

-ন্যায্য কর্মফল কোথাও কারো জোটেনি। হয় কম দিয়ে কেউ বেশী নিচ্ছেন, নয়ত বেশী দিয়ে অনেক কম নিতে হচ্ছে। কিন্তু দৃষ্টিগোচর সর্বত্রই রয়েছে বহুকে বঞ্চিত করে একদল ধূর্ত মানুষের অধিক আত্ম-সাতের ঢালাও ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিরা হয় কোথাও এর সমর্থক, সাহায্যকারী, নয়ত প্রতিকারে অক্ষম। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে দেশের সকল মানুষের সক্রিয়তা ভিন্ন এর অন্য কোন প্রতিকার আছে এ-ধারণাই ভুল। আর এ-ভুল ভুল করেও কেউ সংশোধন না করেন বা করার শক্তি না জোটে তার জন্য সতত সক্রিয় রয়েছেন ওই সুযোগপুষ্ট ব্যক্তিরা।

নতুন সমগ্র অর্থকরী উদ্যোগ ত বটেই, যে-প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তাকেও যথা সত্বর এই করপোরেশনের আওতায় আনতে হবে। দেশের সকলেই সম সুযোগের অধিকারী। প্রত্যেকের প্রাপ্য ধার্য হবে তার মণীষা, প্রদত্ত কর্মশক্তি ও কিছুটা প্রয়োজনের বিচারে। মণীষা ও প্রদত্ত কর্মশক্তিই মানুষের প্রাপ্য-মূল্য ধার্যের শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি। কর্মবিমুখ মণীষা যেমন কোন মূল্যের দাবী করতে পারেনা, মণীষাহীন কর্মও বেশী মূল্যবান হয়না। তবে কর্মমাত্ররই কিছু মূল্য আছে এবং দেশের প্রত্যেকেই সাধ্যমত কাজ করতে বাধ্য থাকবেন ধরে নিয়ে অর্থাগমের নিম্নোক্ত সুযোগগুলি প্রতিটি পরিবারের জন্য অবশ্যই উন্মুক্ত রাখতে হবে। যথা—

(ক) কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন, নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের বেতন এবং এইসব ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যক্তিগত নিয়োগ করা মূলধনের লভ্যাংশ।

(খ) প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি এবং পরিবর্তিত পৌরসভা বা অনুরূপ কাজে নিযুক্ত কর্মী,—যাঁরা উৎপাদন তথা মুনাফা অর্জনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়,—তাঁদের বেতন ছাড়া পাবেন নিজেদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অথবা নগদ মূল্যে ক্রীত করপোরেশনের বিশেষ শেয়ারের লভ্যাংশ। এই শেয়ার শুধুমাত্র এই শ্রেণীর কর্মীদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে এবং নিজের ও স্ত্রীর মৃত্যুকাল অবধি এর ফল এঁরা ভোগ করবেন। এর পর এর বাজার মূল্য এঁদের ওয়ারিশদের ফেরত দেওয়া হবে।

(গ) কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, কুটির শিল্প প্রভৃতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শ্রমলব্ধ পণ্যের ন্যায্য মূল্য। এর বিক্রয়-যোগ্য অংশ অবশ্যই বিক্রয় করতে হবে স্থানীয় বণ্টন বা সরবরাহ কেন্দ্রকে। এতদ্ব্যতীত বণ্টন, সরবরাহ এবং মূল করপোরেশনের শেয়ার মূলধনের অর্জিত লভ্যাংশ প্রতিটি পরিবারই পাবেন।

সমাজতন্ত্রের একটি মৌল নীতি, আয়ের ক্ষেত্র ও তার পরিমাণের উপর ন্যায়গ্রাহ্য সমতা প্রতিষ্ঠা। আর এ-সমাজকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হলে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, ব্যক্তিগত প্রতিভা বিকাশের পরিবেশ ও প্রেরণা যেন কোন ছলেই কিছুমাত্র ব্যাহত না হয়। এই সুযোগ, এমন কি সম্ভাবনাও ব্যক্তির গতিকেই শুধু শ্লথ করে না, রাষ্ট্রের স্বাভাবিক গতিকেও অসাড় করে আনে। সুতরাং সমাজের সর্বত্র প্রতিভার স্বীকৃতির সঙ্গে সেই প্রতিভা বিকাশের স্বাধীনতা, অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ এবং তার যোগ্য মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। উন্নত-অনুন্নত, অগ্রসর-অনগ্রসর, এ-জাতীয় যে-কোন প্রশ্নই এ-ক্ষেত্রে অবান্তর। একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজে এই ধারণাই বাতুলতার নামান্তর। কারণ প্রকৃত প্রতিভা অন্যের যেমন পীড়নের হেতু হতে পারে না; জোর করে বা শ্রেণী স্বার্থে প্রতিভার আমদানি করতে চাইলে সেটা সার্বিক সমাজের কল্যাণকরও হয় না। উপরন্তু এই চেষ্টা অন্যের মর্মপীড়া ও সন্দেহেরই হেতু হয়। এর সঙ্গে অর্থ সংগতিরও কোন সম্পর্ক নেই। আসল কথা, শ্রেণী বিন্যাস করে সার্বিক সমাজের কিছুমাত্র কল্যাণ করা যায় না। শ্রেণী বিন্যাস করে একদিন যে পাপের পত্তন করা হয়েছে তার প্রতিকার করতে যেয়ে নতুন করে আর একবার সেই পথ ধরলে ওই পাপের ভারই আর একটু বাড়বে মাত্র। একদল স্বার্থ-সন্ধানী ব্যক্তির এই ফন্দীটা সেদিন সমাজগ্রাহ্য হতে পেরেছিল বাকী সমগ্র মানুষের দুর্বলতার সুযোগে। কিন্তু সামাজিক পাপ, সে যত বড়ই হোক, তার অবসানে সংকীর্ণতার স্থান নেই। এ-পথ স্বতন্ত্র এবং ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থে চেতনাকে আচ্ছন্ন না করলে এ-পথের হদিস পাওয়া কিছুমাত্র শক্ত নয়। প্রথম অবস্থায়,

এখানে অর্থ দপ্তরেরই হবে বড় ভূমিকা। কারো অতিরিক্ত সঞ্চয় না হয়, এই প্রবৃত্তি ব্যক্তিকেন্দ্রীক হওয়ার পথ না পায় এবং কেবল অর্থ সামর্থে কেউ সমাজের উপর কিছুমাত্র প্রভাব ফেলতে না পারে সে-ব্যবস্থা করবে অর্থ দপ্তর। অর্থ দপ্তরের পক্ষে এ-কাজ বর্তমান সমাজেও কঠিন নয়। 'আয়কর' নামে যে-অস্ত্রটি এখানে থাকে তা দিয়ে অন্যায় বা চাপসৃষ্টিজাত যেকোন আয়, এমন কি সংবিধানলব্ধ অতিরিক্ত আয়কেও যেকোন মুহূর্তে সমসাময়িক সমাজগ্রাহ্য স্তরে টেনে নামানো যায়। অর্থাৎ কোন শক্তি প্রয়োগ না করেও ক্ষুন্নিবৃত্তির সমস্যার সঙ্গে ফ্রিজ বা মটর গাড়ী কেনার সমস্যার সঙ্গতি ঘটানো যায়। কারো অসংগত বাড়তি আয় রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডারে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব অর্থদপ্তরের। অর্থদপ্তর রাষ্ট্রের সার্বিক আয়-ব্যয়, করপোরেশনের আয়-ব্যয় এবং করপোরেশনের মাধ্যমে সর্বসাধারণের আয়-ব্যয় ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে বার্ষিক যে বাজেট করবেন সেখানে এও স্থির হবে পরবর্তী বছরের জন্য জনগণ তাঁদের অর্জিত অর্থের কতটা ভোগ করবেন আর কত অংশ মূলধন খাতে বিনিয়োগ করবেন। বণ্টন ও সরবরাহকেন্দ্র সহ নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীর সম্মতিক্রমেই এই পরিমাণ স্থির করা হবে। রাষ্ট্রের অর্জিত সম্পদের বিনিয়োগযোগ্য অংশের সবটুকুই বিনিয়োগ দায়িত্ব থাকবে একমাত্র করপোরেশনের উপর। রাষ্ট্রের অন্যান্য দায়িত্ব পালনের ভার থাকবে মন্ত্রীসভার উপর।

তত্ত্ব ও তথ্য পরিক্রমা

পূর্বে বলা হয়নি, কিন্তু এইবার বলে রাখা সঙ্গত যে, এটা আদৌ সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস নয়। প্রথমতঃ সে-যোগ্যতা নেই, দ্বিতীয়, সেটা জানি বলেই বাসনাও জাগেনি। আর যেহেতু এটা সাহিত্য নয়, কাজেই দেশের সাহিত্যরস-সন্ধানী সুধীগণ এর বিষয়বস্তু কীভাবে নেবেন ও কী মূল্য দেবেন সেটা যেমন আমার কাছে অবান্তর চিন্তা, তেমনি এও বোধহয় বলে রাখা সঙ্গত যে, পেশাদার রাজনীতিকরা এ নিয়ে কতটা ছি ছি করবেন তার জন্যও নেই কোন দুশ্চিন্তা।

আমি আরও বলে রাখি; কোন রাজনীতিক বা তাঁদের কোন দলের প্রতি কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা আমার নেই। কোন রাজনীতিক অথবা দল বিশেষের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণও নেই। বরং আদত সত্য এটাই যে, রাজনীতি সংশ্লিষ্ট সকল প্রভাব পরিহার করাকেই আমি আমার ধর্ম বলে জেনেছি। জেনেছি, কারণ মানব ইতিহাসের একের পর এক অধ্যায় ঘেঁটে এই সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে যে, রাজনীতিমুক্ত সমাজ ব্যতীত সমাজের সকল বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত ও শৃঙ্খলিত মানুষের মুক্তি নেই। আমি বিশ্বাস করতে পেরেছি, রাজনীতি সমগ্র মানব জাতিরই সঠিক লক্ষ্যপথের অন্তরায় এবং কার্যত এটাই সার্বিক সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রধান প্রতি-বন্ধক। রাজনীতি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষকে অবিবেচক, অনুদার ও যুক্তিবিমুখ হতে প্ররোচিত করে এবং ন্যায়ের মুখোশ পরে এ বহুকে হৃদয়হীন ও অশালীন করতেও তৎপর হয়ে থাকে। আমি আরও দেখেছি, রাজনীতি অত্যন্ত কুটিল, কিন্তু এ আসে শান্তি, সমদর্শীতা ও ন্যায়ের ধ্বজা তুলে আর এরই আড়ালে থেকে বিশ্বের তাবৎ দুর্বল ও সরল মানুষের টুটি চেপে ধরে। আর সব শেষে বলতে পারি, তথা-কথিত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিরোধী সব বক্তব্যকেই যে সহজে নস্যাৎ করার শক্তি পান সে কেবল রাজনীতিনির্ভর সামাজিক পরিবেশেরই দৌলতে।

এই যে বক্তব্য, এ আমার অনুমানের পুঁজি থেকে নয়। শুধুমাত্র ইতিহাসের শিক্ষাও এ নয়। আর দীর্ঘকাল নানা স্তরের নানা দরের ও নানা দলের রাজনৈতিক দাদাদের বহু ক্রিয়াকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার ফলেই যে এ-সত্য এতটা স্পষ্ট হয়েছে তাও ঠিক নয়। বরং কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের অনুকরণে বলা চলে, মানুষের দরবারে শুধু মাথা খুঁড়েই যারা গেল, পেলনা কোন সুবিচার এবং যারা এই উদার পৃথিবীর কোলে থেকেও সারা জীবন কিছুই দেবার ও নেবার বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলনা তাদের জীবন চরিতের বহু অধ্যায় একেবারে কাছে থেকে দেখেছি বলেই সমগ্র রটনাকে উপেক্ষা করে ঘটনার উৎসবিন্দুতে পৌঁছা সম্ভব হয়েছে। 'অসত্য' এই পোশাকী শব্দ মিথ্যার কুৎসিত

মূর্তি অস্পষ্ট করতে পারেনি, তাই কোন সত্যই মিথ্যা হয়ে যায়নি। যদিও জানি অনভ্যস্ত কানে এ সবই নীরস ও বেসুরো ঠেকবে। 'বাড়াবাড়ি' বা 'বেয়াদপী' বলতেও অনেকের আটকাবে না। কিন্তু তবু বলছি, সাধ্যমত সত্যের ডাকে যে সাড়া দিতে পেরেছি সেই ত আমার বড় সান্ত্বনা। ভাষা কিংবা ছন্দ আমার কাছে কোন সমস্যাই হয়নি। বরং এই সঙ্কোচ এসে উদ্দেশ্যকে যে পঙ্গু করতে পারেনি এবং চালাকীর আসল রূপটা সহজেই ধরা দিয়েছে সেই আনন্দই থাক আমার প্রাপ্য হয়ে। কিন্তু এর চেয়েও বড় বিষয়—আমার দিক থেকে একে হয়ত কৈফিয়তও বলা চলে—যে-কথা আজ অথবা আর একদিন একজনকে বলতেই হোত এবং বলতেও হোত সমগ্র মানব জাতির মুক্তির তাগিদেই, তারই কিছুটা আমি অত্যন্ত সরল ও সহজ করে বলবার চেষ্টা করেছি। অথবা আর একটু স্পষ্ট করেও হয়ত বলতে পারি, বিজ্ঞ ব্যক্তির বক্তব্য ত বিজ্ঞদের জন্যই কিন্তু আমার মত যারা অজ্ঞ, বিজ্ঞ উক্তির অর্থ বোঝেনা, আমার সব কথা রইলো তাদেরই কাছে।

অভাব ও অক্ষমতার ব্যথা আমি জানি এবং দেখেছি, ক্ষমতা বা প্রলোভন তাড়নায় মানুষ কত সহজে পশুকেও লজ্জা দিতে পারে। সমাজের বহু বিবর্তন ঘটেছে, মানবজাতি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বহুদূর এগিয়েছে আর সভ্যতার অহঙ্কারও কারো কারো অভ্রভেদী হয়েছে। কিন্তু যে-প্রবৃত্তিগুলি সর্বাধিক ঘৃণ্য বলে সকলের স্বীকৃতি পেয়েছে তারই বশ্যতায় আরও যে অধিক মানুষ সঙ্কোচমুক্ত হয়েছে তাও দেখেছি। দেখেছি, সভ্যতার ধ্বজা যত ঊর্ধ্বে তোলা হচ্ছে কিংবা প্রগতির আস্ফালন যত মুখর হচ্ছে, প্রত্যেকের ঘরের তালা তত মজবুত করার প্রয়োজন বাড়ছে। চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে সব প্রস্তুতকারক হিমসিম খাচ্ছেন। অথচ এ-ধারণাই বহুজনের বদ্ধমূল ছিল এবং আজও তার অপরিহার্যতায় এঁরা বিশ্বাসী যে, মানুষ যত সভ্য হবে সমাজও তত ন্যায়নিষ্ঠ হবে। আর সমাজ যত ন্যায়নিষ্ঠ হবে, ঘরের তালা তত হালকা হবে, এর প্রয়োজন সীমিত হবে। কিন্তু এর চিহ্নই কি কেউ কোথাও দেখেছেন? বরং শঠতা, ছলনা আর প্রতারণার প্রতাপ যে ওই তালার মতই মজবুত হচ্ছে তাই বোধহয়

সকলে দেখেছেন, দেখছেন। কোন কিছুতেই আর যেন সমাজের লজ্জা পাবার প্রয়োজন নেই। আর এই যে সমাজ ব্যবস্থা, অধিকাংশ মানুষের অনিশ্চিত ও অসহায় অবস্থা এবং নির্লজ্জ মিথ্যাকেও 'অসত্য' এই লেংটি পরিয়ে হালকা করার ধোকাবাজি, আমি নিঃদ্বিধায় বলতে পারি, পৃথিবীর সমগ্র সাধারণ মানুষ সমবেত শক্তিতে প্রাণপণ চেষ্টা করলেও এর পত্তন করতে পারতো না। এ-শক্তি যাঁদের আছে তাঁরা এক অতি চেতনাশীল মানুষ এবং এটা কেবল তাঁদেরই কুশলী অধ্যবসায়ের ফসল। যদিও এভাবে চিন্তা করতে কেউ আমরা অভ্যস্ত নই। সংস্কার আছে, কাজেই সঙ্কোচ এসে বাধা দেয় শালীনতার প্রশ্ন তুলে। চূড়ান্ত অবিচারেও বিচার শক্তি কেবল ওই ঐতিহ্যই আঁকড়ে থাকে, গণ্ডীর বাইরে কিছুতেই যেতে চায় না; এমনিই সতর্ক এ-চেতনা। এও এক ধরনের সংস্কার যা ওঁদেরই একটি অংশের সাধনার ফল। এর দাস আমরা প্রায় সকলেই। নইলে 'চীন-রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা স্থায়সিদ্ধ' না 'বৃটেন-আমেরিকার যুক্তিগ্রাহ্য' কেবল এরই মীমাংসা থেকে আমরা সকল সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে চাই কী করে? কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন আর মতবাদের টান না হয় কিছু মানুষের আছে, কিন্তু বাকী সকলের অভিমতটাই কী ভিন্ন?

আদত কথা বোধ হয় অসত্যকে সহ্য করার শক্তি সমাজে বেড়েছে তাই অযুক্তির সঙ্গে বহু কুযুক্তিও সহজ হয়ে উঠেছে। কোনটা ঠিক আর কোনটা নয়, এই বোধটুকু কার্যকর অবস্থায় থাকলে অন্তত এও ত মনে হতে পারতো, ওঁদের যে ভালটুকু অপরকে আকৃষ্ট করছে তা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য হলে তথাকার সকল মানুষই খুশী হতেন এবং এই না হওয়ার ব্যক্ত হেতুগুলিই কী স্থায়সিদ্ধ? অথচ এ-প্রশ্ন কেউ আমরা করিনে এবং মনের এই জড়তা যে একদল কুশলী মানুষের ধূর্ত চেষ্টার ফল তাও আমরা স্বীকার করিনে। যদিও একটুখানি সতর্ক হলেই দেখা যেত, নিয়ত লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষে অথবা খোলাখুলিই রাজনৈতিক মতাদর্শে আবিষ্ট করে এঁরাই আমাদের সত্য সন্ধানের ও সঠিক পথ গ্রহণের শক্তিকে স্তব্ধ রাখতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চলেছেন। এ এক আশ্চর্য শক্তি। শুধু সাধারণ মানুষ নয়,

শিক্ষিত এবং জ্ঞানী-গুণী বলে পরিচিত ব্যক্তিরাও অনেকে এর প্রভাবে আচ্ছন্ন। সত্য দ্বারে এসে করাঘাত করে কিন্তু চেতনা জাগাতে পারেনা। যদিও রাজনীতির সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ যে চিরকালই কিছুটা দ্বন্দ্বমুলক এ-তত্ত্ব বহুজনেই জ্ঞাত আছেন এবং বিশ্বের উঁচুদরের কয়েকজন রাজনীতিকও এ-কথা জানিয়েছেন। রাজনীতির সংজ্ঞা ব্যাখ্যায় চার্চিল যা বলেছিলেন সম্ভবতঃ তার মোদ্দা কথা—'আজ করবো বলে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে কাল তা না করেও জনচেতনাকে আস্থাশীল রাখার কৌশলই হোল রাজনীতি।' বাংলার এক কৃতি সন্তান প্রমথ চৌধুরী ত আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, 'রাজনীতি হচ্ছে সেই রাজ যার মধ্যে কোন নীতি নেই।' তবে রাজনীতির গুরুত্ব এতে হ্রাস পেয়েছে, কিংবা রাজনীতির উপর আস্থা হারাতে কেউ এ-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নয়। কিন্তু এ-ইতিহাসে এই তথ্যটাই একটু বেশী উজ্জ্বল যে, রাজনীতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্বন্ধ যেমন তাদের লাভ-ক্ষতিতেই শুধু নিবদ্ধ, তেমনি এর লাভের দিকটা থাকে প্রধানত রাজনীতিকদের অধিকারে আর ক্ষতি যতটা তার প্রায় সবটাই পড়ে সাধারণ মানুষের ভাগে।

খুব স্পষ্ট না হলেও অনুন্নত দেশ মাত্রই কোন না কোন উন্নত দেশকেই অনুসরণ করে চলে। 'সাঁতার শিখতে অপরের সাহায্য অপরিহার্য' কিংবা 'গুরু ভিন্ন শিক্ষালাভ হয়না' এই মানসিকতা এখানেও এসে জয়ী হয়। এটা স্বাভাবিক। এক সতর্ক স্বার্থ চেতনা থেকে এ-ধরনের চেতনা প্রভাবিত হয়, প্রসার লাভ করে, কাজেই গুণমুগ্ধ স্তাবক জুটতেও দেরী হয় না। নতুবা এ-প্রশ্ন অবশ্যই দেখা দিত, যাকে 'আদর্শ' বলে গণ্য করার তাগিদ, আসলে তার যোগ্যতা কতটুকু? উন্নতির কাল, ভৌগলিক অবস্থিতি, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতি বাদ দিয়ে কেবল অনুসৃত পন্থাটিই বিচারের মাপকাঠি হলে তার গতিবেগ ও সর্বজনগ্রাহ্য সমদর্শীতার প্রকাশটাই ত হবে মূল অংশ। অর্থাৎ আদর্শ হওয়ার মত পর্যাপ্ত বস্তু এতে আছে কিনা এবং থাকলে প্রকৃতই বস্তুটি কী? সেটা অবশ্যই স্পষ্ট হওয়া দরকার। আরও দরকার, এটা সবক্ষেত্রেই উপযোগী কিনা?

বর্তমান সমাজের তথাকথিত বিচারকগণ হয়ত বলবেন, বহু সমস্যা অন্তর্হিত হওয়ার শক্তি ওতে আছে এবং হয়েওছে অনেক। বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মানুষের মৌল চাহিদার অনেকটাই ত মিটেছে। কাজেই ওই স্তর অবধি পৌঁছিবার কৌশলটা রপ্ত করে তবেই ত পরবর্তী চিন্তা।'—যুক্তি হিসেবে এ-অভিমত গৌণ নয়। আর চাহিদার তুলনায় যাদের পুঁজিটাই নগণ্য তারা এ-যুক্তি অবজ্ঞা করবে কোন অধিকারে? কিন্তু এ যদি আদর্শ হতে চায় তখন? সঠিক রাস্তার সন্ধান মেলেনি তাই যেকোন একটি হলেই হোল, এই কি সার কথা? তাও বোধ হয় নয়। বরং দৃষ্টিটা যে বিশেষ একটি দিকেই নিবদ্ধ তাইত মনে হয়। কিন্তু তাই যদি হয় তবে ওই পথটা নিরাপদ কিনা, সকলেই চলতে পারবে কিনা এবং আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অবধি এ-পথ প্রসারিত কিনা কিছুই কি জানবার নেই? কিংবা জানবার নেই কি, যে-সমস্যাগুলি স্থায়ী শান্তি ও সার্বিক মানুষের সমৃদ্ধির অন্তরায় অর্থাৎ মানব প্রগতির সুফলটুকু সীমিত ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখার যে প্রবণতা ও কৌশল সমগ্র অনুন্নত সমাজে বিদ্যমান, কল্পিত ওই আদর্শ পথে তাকে পরিহার করে চলবার সুযোগ আছে তো?

অনেকে হয়ত বলবেন, 'যেটুকু ওঁরা পেরেছেন বা যতটা এগিয়েছেন তার মূল্যই কি কম?'—এটা কিন্তু যুক্তি নয়, কেবল তর্ক। আদর্শ বিচারে এই মূল্যবোধটা গুরুত্বপূর্ণও নয়। কম-বেশী মূল্য থেকে একের শ্রেষ্ঠত্ব আর অন্যের দীনতা কিছুটা প্রমাণ করা চলে, কিন্তু কারো অনন্যতা প্রমাণ হয় না। সামরিক শক্তিটাও এক্ষেত্রে বড় বিষয় নয়। সবশেষে রাষ্ট্র ও জনগণ কিংবা জনগণ ও প্রশাসন দু'টি ভিন্ন অস্তিত্ব নয় এও প্রমাণ হয়নি। সুতরাং যুক্তি নয়, কেবল প্রশাসন প্রচারিত তথ্য—যার উদ্ভব মূলত শাসকদেরই প্রয়োজনে, যদি ওই সকল বক্তা আর অন্য আশাবাদীদের অনুপ্রেরণার হেতু হয় তবে যা আমরা স্থানীয় প্রশাসন মারফত শুনি এবং যা নিয়ত প্রত্যক্ষ করি অর্থাৎ, কোন কোন বিষয়ে কত বিরাট পরিকল্পনা হোল বা তার জন্য মোট কত হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হোল এবং এর ফলে

দেশ কতটা এগোবে, কত লোকের কর্মসংস্থান হবে ও দারিদ্র্য কতটা ঘুচবে সেই সব তত্ত্বের পাশে সর্বশেষ পরিণতিটা উপস্থিত করি তবে আত্মস্থাপিত ওই আদর্শের সঠিক মূল্যটাও সহজেই ধরা পড়ে। এখানে এটা আরও স্বচ্ছ হবে এই কারণে যে, ভারত তথাকথিত সমাজতন্ত্রের পথ ধরতে চাইলেও এর প্রচারযন্ত্র আজও ঠিক ততটা প্রগতিশীল হতে পারেনি যেখানে সমগ্র সামাজিক সত্য কেবলমাত্র প্রশাসনের এক্তিয়ারেই আবদ্ধ হয়ে থাকে।

এ-প্রসঙ্গের আরও একটি দিক আছে। যে-তথ্যসন্ধানী কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে কেবল চৌরঙ্গী-ডালহৌসি অঞ্চলই দেখলেন, বেলেঘাটা, বাগমারী বা কাশীপুরের বস্তিগুলি দেখলেন না, তিনি কি এর সামগ্রিক রূপটি উদ্‌ঘাটন করতে পারেন? আসল কথা, সমস্যা আছে কি নেই কিংবা থাকলে কী ও কতটা তার গভীরতা তা বুঝবার ও বলবার যোগ্যতা আছে কেবলমাত্র ভুক্তভোগী তাবৎ জনগণের। বলবার অধিকারটাও মূলত তাদেরই। এই অধিকার রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেলে তাকে বলা যায় গণতান্ত্রিক অধিকার আর প্রতিকারে দেশের সকল মানুষের কর্তৃত্ব বর্তালে তবেই সেটা হতে পারে সঠিক গণতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের এটা প্রথম ধাপ। কিন্তু মুক্তকণ্ঠে কিছু বলবার সুযোগই যদি না থাকে তবে বুঝতে হবে গলদ একটা কিছু সেখানে আছেই। আর যাকে 'আদর্শ সমাজ' বা 'গণরাষ্ট্র' বলা হয় অথচ একে দেখবার সুযোগটাও কারো অবাধ নয় তার গলদটা বোধহয় আরও একটু বেশী। অনেকের ধারণা, 'এর মূল্যটাই হয়ত ঠিক ততখানি নয় যা বাইরের রংচং বা ঘোষকের কণ্ঠে ব্যক্ত হয়ে থাকে।' এঁদের আরও ধারণা, 'ব্যক্তিগত জীবনেই হোক বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই হোক সঠিক বন্ধু চিনে নেওয়া খুবই শক্ত। কিন্তু তবু এ-বোধ প্রায় সকলেরই থাকে যে, যুক্তিযুক্ত বিষয়ের উপর সঠিক মন্তব্য সহ্য করার শক্তি যাঁর নেই তিনি কখনই প্রকৃত বন্ধু নন এবং এমন বন্ধুত্ব স্থায়ীও হয় না।

লক্ষ্য করার বিষয়, পৃথিবীর তাবৎ ধনতন্ত্রীদের মত কমিউনিস্ট শাসকরাও চান তাঁদের সমাজ ব্যবস্থাই অন্যে অনুসরণ করুক। আর এঁরা এমন দাবীও করেন, যার অর্থ হয়, সমগ্র দেশবাসীর শান্তি

সমৃদ্ধি ও স্বাধীন সত্তার বিকাশ ঘটাতে তাঁদের প্রদর্শীত পথটাই সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে এর সূত্রগুলি বা সেই উৎকৃষ্ট পদ্ধতিটা পৃথিবীর সকল মানুষকে অবাধে দেখার সুযোগ না দিয়ে কেবল প্রচারের উপর এত নির্ভরতা কেন? যা শুনলেই লোকে আকৃষ্ট হয় তা দেখতে পেলে নিশ্চয়ই তারা অভিভূত হবে। অনুকরণ করতেও তৎপর হবে। তখন কোন যুক্তিই আর তাদের নিবৃত্ত করতে পারবে না। অথচ বিস্ময় এখানেই, পৃথিবীর কোন একজন দর্শক কোন কমিউনিস্ট দেশে অবাধে চলাফেরা করে সব কিছু দেখবার ও জানবার সুযোগ পেয়েছেন এ-সংবাদ আজও কেউ দেননি। 'সমস্যা নেই' 'উৎকৃষ্ট-পদ্ধতি' অন্যকে অনুসরণ করার আহ্বান, তবু এত লুকোচুরী কেন? তবে কী ওই পদ্ধতিটা এমনই এক বস্তু যাকে বাইরে বের করাই চলে না। বের করলে অপরে শিউরে উঠতে পারে? কই বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি অকমিউনিস্ট দেশে ত এ-গোপনীয়তা নেই।

বিবেচ্য এখানে আরও আছে। মনমাতানো কমিউনিস্ট প্রচারের মাপকাঠি দিয়েই এর পরিমাপ করতে হবে। গত ৫০ বছর ধরে দুনিয়ার কম্‌রেডরা তামাম শোষিত ও দুঃখী মানুষের বেদনায় কাতরাচ্ছেন আর অনবরত কমিউনিস্ট সমাজের সুখ ঐশ্বর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ফিরিস্তি দিচ্ছেন, কিন্তু কই এই ৫০ বছরের ভিতর অন্য দেশের কোন নির্যাতিত মানুষ ত ওই স্বর্গরাজ্যে আশ্রয় নেয়নি! দল বেঁধে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হতেও কেউ যায়নি। বরং ওই স্বর্গরাজ্য ছেড়েই বহু ব্যক্তি সরে গেছেন, যাচ্ছেন। প্রাণ ভয়ে অন্যত্র রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন। কমিউনিস্ট প্রভাবিত একমাত্র পূর্ব-জার্মানী থেকেই কয়েক লক্ষ মানুষ পৈতৃক ভিটামাটি ছেড়ে বুর্জোয়া পশ্চিম জার্মানীতে আশ্রয় নিয়েছেন, কমিউনিস্ট অধিকৃত তিব্বত থেকে হাজার হাজার মানুষ ভারতে সরে এসেছেন। কাজেই এত সব মানুষ ওই স্বর্গরাজ্যের মহিমাটা বোঝেন নি এই যদি সত্য হয় তবে বুঝতে হবে, ইন্দ্র তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বানপ্রস্থে গেছেন এবং রাজ্যপাটে বসেছেন এমন কেউ, যাকে নপুংসক না হলে মোটে চেনাই

যায় না। অপরের সমালোচনায় 'মুখোশ' শব্দ প্রয়োগ করেন না এমন কমিউনিস্ট খুব কমই আছেন। মুখোশ খোলা এঁদের পেশা নাও যদি হয় অবশ্যই একটি পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু স্বয়ং স্ট্যালিন-কন্যা এ কি করলেন? আমেরিকায় সাহায্যপ্রাপ্তা এই মহিলা অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো কণ্ঠে বললেন, 'আদর্শ সমাজ বলতে যা বুঝায় তা পৃথিবীর কোথাও নেই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত বেঁচে থাকা যায় আর কমিউনিস্ট সমাজে মানুষের ভাগ্যে শুধুই নিরাশা। বিনা-অনুমতিতে একজন স্বদেশবাসীরও একস্থান থেকে অন্যত্র যাওয়া অসম্ভব। জীবিকা এবং বাসস্থান বদল করাও সমভাবে অসম্ভব। আমেরিকায় অন্তত সে-অসুবিধে নেই।'

অনেকেই বলে থাকেন, "'বিজ্ঞানে, কারিগরি বিদ্যায়, খেলাধুলায় এবং আরও বহু ক্ষেত্রে যাঁদের এতটা উন্নতি ঘটেছে তাঁদের ব্যবস্থাপনাকে তারিফ করতেই হবে।' তারিফ অবশ্য প্রায় সকলেই করেও থাকেন। এ ক্ষেত্রে উগ্র বা অবিবেচক ব্যক্তিদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, মণীষায় দক্ষ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা না করার মত বিকারগ্রস্ত মানুষ খুব কমই আছে। কিন্তু এ-অগ্রগতি 'বিশেষ একটি সমাজ ব্যবস্থায়ই সীমাবদ্ধ' অথবা 'অকমিউনিস্ট সমাজে এ-অগ্রগতি অসম্ভব' এ-যুক্তির সত্যতা কোথায়? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকাল—মাঝের এই কয়েকটি বছরের ভিতর জার্মানীর যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছিল ইতিহাসে তার নজির নেই। যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের আজকের অগ্রগতিও লক্ষ্যণীয়। এ ভিন্ন গত ৫০ বছরে আমেরিকা সহ কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশের জনগণ যে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের নাগাল পেয়েছেন কোন কমিউনিস্ট সমাজের জনগণ তা হয়ত কল্পনা করতেও পারেন না। সুতরাং 'কমিউনিস্ট শাসন ব্যতীত মানুষের সমৃদ্ধ জীবন অসম্ভব' এ-জাতীয় উক্তি কিংবা এই মানসিকতা সম্ভবতঃ অসুস্থ চেতনারই প্রকাশ।

কিন্তু শোষণশীল সমাজের সংজ্ঞা কি? সম্ভবতঃ একের শ্রমলব্ধ ফল অপরে ভোগ বা আত্মসাৎ করাই শোষণ আর বহুর শ্রম ফলে

মুষ্টিমেয় মানুষ যেখানে স্ফীত হওয়ার সুযোগ পায় তাকে বলা চলে শোষণশীল সমাজ। কিন্তু তাই যদি হয় তবে দেশের সমগ্র মানুষের শ্রমফল যেখানে প্রশাসনের নিরঙ্কুশ এক্তিয়াববদ্ধ হয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারী, কলকারখানার ম্যানেজার ও রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে দলীয় চাঁইদের ভোগের পাত্র পূর্ণ হতে থাকে এবং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া রোধ করতে হয় দমনক্রিয়ায় বা কিছু বাহ্যিক আড়ম্বরের সাহায্যে তার সংজ্ঞা কী হবে?

এর উত্তর কিন্তু কেউ দেন না। সঠিক উত্তর বোধ হয় সম্ভবও নয়। যদিও উত্তরটা সহজ। কিন্তু তত্ত্বকথা ও তর্কের দাপট এমনই যে ওই সরল প্রশ্নের সহজ উত্তরটাও আমরা ভুলে যাই। ভুলে যাই যে, বৃহৎ বৃহৎ শহর, অতি বৃহৎ কলকারখানা আর বিরাট আকারের সামরিক শক্তির বিচারে যদি কোন দেশের জনজীবনের সব তথ্য জ্ঞাত হওয়া যেত, সমাজের সকল মানুষের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের পরিমাপ হোত, তবে এমন বহু দেশের সাক্ষাৎ আমরা পেয়ে যেতাম যেখানে এসবের কিছুমাত্র অভাব নেই, অথচ বেশীর ভাগ মানুষ কী এর সার্থকতা সেই তত্ত্বটাই জানে না। কাজেই বাইরের আড়ম্বর হয়ত জনগণের সঠিক অবস্থার মাপকাঠি নয়। নয় যেহেতু এমন দেশও আছে যার সামরিক শক্তি আদৌ গণ্যযোগ্য নয় এবং উল্লেখ করার মত নয় তার বৃহৎ কোন শহর বা কলকারখানা, কিন্তু তথাকার গণজীবনে যে-শান্তি ও সচ্ছলতা দীর্ঘকাল বিরাজ করছে বহু উন্নত দেশবাসী এখনও তার নাগাল পায়নি।

এই বাহ্যিক শ্রীর প্রাবল্য প্রায় সব দেশেই আছে। শ্রেণী-শাসিত বা শ্রেণীসমৃদ্ধ সমাজে এও একপ্রকার ব্যাধি। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বা অপরিহার্য অবলম্বনও বলা চলে। এই ভারতেই বিভিন্ন দিকে তাকালে এ-দেশবাসীও এটা দেখতে পাবেন। যেমন সুদূর পল্লীবাসীর কেউ জীবনে প্রথম কলকাতা এসে নিশ্চয়ই কিছুটা অভিভূত হবেন। আর এখানকার নব-নির্মিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক বা শিপিং করপোরেশনের বাড়ীর দিকে তাকালে বিস্মিত হয়ে ভাববেন, ভারত কতই না উন্নত হয়েছে। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাঁর

সংবিৎ যখন ফিরে আসবে, নিজের ও আশপাশের গ্রামগুলির চিত্র মনে পড়বে, চোখের উপর ভেসে উঠবে পরিজনসহ ওই গ্রামবাসীদের নগ্নগাত্র ও অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার পাণ্ডুর মুখগুলি তখনই তার সন্দেহ জাগবে ;—একি ভারতের কোন সম্পত্তি না অন্য কোন রাষ্ট্রের ?

ঠিক এই সন্দেহই প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন এক তথাকথিত ভিখারির কণ্ঠে। 'তথাকথিত' অর্থে একে ঠিক ভিখারি বলতে আমার এই অ-বিজ্ঞ বিবেকে বেধেছে। অনেকে বলেন 'এঁরা হলেন শ্রেণীতন্ত্রের ঐতিহ্যবাহী বর্তমানের দলীয় গণতন্ত্রেব এক অবশ্যম্ভাবী ফসল।' এটা ঠিক কিনা বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলতে পারেন। তবে আমার চোখে ইনি একজন দারিদ্র-তাড়িত অস্থিচর্মসার মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ। একা নয়, সঙ্গে জীবনসঙ্গিনী স্ত্রীও। রাস্তার অপর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে লোকটি আগাগোড়া শ্বেত-পাথরে মোড়া একটি বহুতল বাড়ীকে দেখছিলেন। দেখছিলেন, দামী দামী পোশাকে আবৃত কিছু নধরকান্তি ব্যক্তিব আনাগোনা। আর দেখা ত নয়, যেন অন্তর দিয়ে অনুভব কবা। বহুক্ষণ ট্রামের জন্য অপেক্ষা কবে কবে একসময় কৌতুহল বসেই লোকটির পাশে যেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার উপস্থিতিতে সংবিৎ ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'বাড়ীটি আমেবিকার এবং তাদের কোন অফিস কিনা।' আমাব উত্তবে যখন জানলেন, না, বাড়ীটি ভাবতের এবং ভারত সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি অফিস, তখন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুটা স্বগতভাবেই বললেন, 'তাইত ভাবি, গাঁয়েব মানুষ এত নিঃস্ব হয় কী করে ?'

এ তো একজন ভিখারির কথা নয়। কৌতুহল আরও কিছুটা বাড়লো এবং একে একে সব ইতিহাসই তাঁর জানলাম। জানলাম ছিল তাঁব সবই,—বসত বাড়ী, চাষের জমি, মায় গ্রাম্য পাঠশালাব মাস্টারী অবধি। কিন্তু বয়েসের অজুহাত, পুত্র-কন্যাব অভাব, অজন্মার অনাহার আর সামাজিক অবিচার মিলে একে একে গেছে সবই, অবশেষে আজন্ম সাথী গাঁয়ের মায়া কাটিয়ে শহরে এসেছেন ভিক্ষায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে। কথা শেষে পাশের গঙ্গা দেখিয়ে তাঁর শেষ মন্তব্য,

'গরিবীর 'ঈ' যে কেন অনড় সে ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের হঠে যাবার শেষ স্থান ত ওখানেই, কি বলেন বাবু?'

কি আর বলব। পকেটে দেবার মত সামান্যই কিছু ছিল, তাই ওঁর হাতে গুঁজে দিয়ে সরে পড়লাম। কিন্তু সে দিনটি ত বটেই, আজও ওঁর ওই একটি মন্তব্য কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি—'তাই ত ভাবি গাঁয়ের মানুষ এত নিঃস্ব হয় কী করে?' তবে উনি গাঁয়ের মানুষ তাই গাঁয়ের চিত্রই দেখেছেন। কিন্তু শহরে থাকলে এমন বহু মানুষের সন্ধান উনি এখানেও পাবেন। যদিও শহর ও গাঁয়ের দারিদ্রে প্রভেদ কিছু থাকেই।

কিন্তু শহর ও গ্রাম নিয়ে যে-বৃহত্তর সমাজ গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে সঠিক পরিচয় ঘটলে এ-তত্ত্ব মোটেই অস্পষ্ট থাকে না যে, বহুকে বঞ্চিত করে বৃহৎ কিছু গড়ে তোলা কিংবা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের বিজ্ঞ বা শ্রেষ্ঠ করার চেষ্টায় কৃতকার্য হওয়া আদৌ কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। আর এ-প্রসঙ্গের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল, যে দেশের ষাটভাগ মানুষ অনাহারক্লিষ্ট, প্রায় দশভাগ হয় ফুটপাত, নয়ত গাছতলাবাসী, প্রায় পাঁচভাগ ভিক্ষাজীবী এবং কর্মহীনের সংখ্যা প্রায় তিরিশভাগ, তার কোন কর্তা-ব্যক্তির যদি এ-ধারণা জন্মে থাকে যে 'মার্বেলমণ্ডিত বৃহৎ প্রাসাদ, অতি মূল্যবান আসবাবপত্র, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর এবং শৌখিন মটর গাড়ী ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বাড়েনা' তবে ওই পূর্বোক্ত মানুষগুলি সংগত কারণেই বলবে, 'সেই ব্যাক্ত এ-দেশের আদৌ মঙ্গলাকাঙ্খী নয়। দেশবাসীর আপনজনও কেউ নয়।'

ঠিক এই প্রসঙ্গেই মনে পড়বে গান্ধীজীকে। দেশবিদেশের সকল গুণী-মানী ব্যক্তিদের সঙ্গেই তিনি দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন এবং দেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন হাঁটু অবধি নগ্ন একখানি মোটা ছ'হাত ধুতি পরে আর গায়ে ততোধিক মোটা একখানি চাদর জড়িয়ে। লণ্ডনের ঐতিহাসিক গোলটেবিল বৈঠক এবং রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকারেও তাঁর মূল পোশাক ছিল ওই। অথচ কেউই কি বলতে পারেন, ভারতবাসীর মাথা এতে নত হয়েছিল?

কিংবা আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার পরিবেশ কিছুমাত্র গুরুত্ব হারিয়েছিল? বরং প্রতিটি ভারতবাসীত বটেই, চেতনাশীল সকল বিশ্ববাসীই বলবেন, ওই পোশাক সেদিন এ-দেশের মর্যাদাই কেবল বাড়ায় নাই, সেই সঙ্গে এদেশবাসীর মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তিও দিয়েছিল। ওই পোশাক আলোচ্য বিষয় ও পরিবেশকে যতটা গুরুত্ব দিতে পেরেছিল সম্ভবত পৃথিবীর সর্বাধিক মূল্যবান পোশাকে আবৃত হয়ে থাকলেও তা পারত না। এর সঙ্গে দেশের সংগতির প্রশ্ন জড়িত আর তাই বোধহয় প্রথম দিকেই গান্ধীজী বলেছিলেন, 'আমি এমন এক ভারতের জন্য কাজ করবো, যেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিটিও অনুভব করবে যে. এটা তারই দেশ এবং এদেশের গঠন কার্যে তার মতামতের মূল্য আছে।'

সাম্প্রতিক একটি সংবাদে প্রকাশ, ৭০ কোটি মানুষের যে-বৃহত্তর দেশ চীন তার মটর গাড়ীর মোট সংখ্যা নাকি এদেশের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরার প্রায় সমান। কিন্তু এতে চীন তার গুরুত্ব হারিয়েছে অথবা চলার শক্তি কিছুমাত্র হ্রাস পেয়েছে এমন কথা তার অতিবড় শত্রুও কেউ বলেনি। আসলে বোধ হয় অগ্রাধিকার বোধের অভাব থাকলে কিংবা ভিতরে আসল বস্তুর ঘাটতি পড়লে বাইরের আড়ম্বরই হয় সম্বল। বাংলায় 'ফতো বাবু'র গল্প আছে না? এও বোধ হয় তাই। কিন্তু দেশের সঙ্গতির সঙ্গে সমতা না থাকলে সে-বস্তু শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবিবেচক হতে প্রলুব্ধ করে তাই নয়, দেশের গতি-পথও কিছু রুদ্ধ করে।

রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও রক্ষার কত কৌশলী তথ্যই যে ইতিহাসে আছে তার অন্ত নেই। জনগণের কল্যাণে কে কোথায় কি কি করেছেন সেসব তথ্যও সেখানে আছে। কিন্তু সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক যে-তত্ত্বটা কোন কৌশলগত নয়, কেবলই আদর্শগত, তারও একটি অধ্যায়ে আছে কিন্তু এক বিরাট নৌবিদ্রোহের ইতিহাস এবং যার সমাপ্তি ঘটেছিল ওই আদর্শের প্রভাবে নয়, অগণিত তাজা মানুষের টাটকা রক্তে। কোন বুর্জোয়া ব্যবস্থার সমর্থক এঁরা ছিলেন না, এঁদের দাবী ছিল মাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যক্তি সত্তার স্বীকৃতিলাভ। কোথায়

ও কবে এ-বিদ্রোহ ঘটেছিল ইতিহাস খুললেই দেখা যাবে। সাম্প্রতিক কালে আর একটি ইতিহাস তুলে ধরেছেন একজন নোবল প্রাইজ জয়ী সাহিত্যিক। ইনি এঁর একখানি বিখ্যাত বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, 'সেখানে বন্দী শিবির গড়ে উঠেছিল ১৯১৮ সালেই এবং অতিবিখ্যাত সেই রাষ্ট্রনেতার সম্মতিক্রমে। সর্বাধিক ২০ কোটি মানুষের এই দেশে ১৯১৮ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ এই সব বন্দী শিবিরে শ্রমদাস হয়েছেন। লেখক দেশব্যাপী ছড়ানো এই শিবিরগুলির যে-পরিচয় দিয়েছেন মানবীয় চেতনায় সে বোধহয় এক বিভৎস বিস্ময়। তিনি একে মিষ্টি করে বলেছেন 'সফলতম প্রিজন ইনডাস্ট্রি।' সুতরাং সমস্যা আছে কি নেই সেটা যেমন, তেমনি তা সমাধানের সূত্র কি তাও বোধহয় এই সব ইতিহাস থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়।

বুভুক্ষা, বঞ্চনা আর অবিচার, সম্ভবত এই থেকেই মানুষের বিচারশক্তি দ্রুত লোপ পেয়ে থাকে। ইন্ধন পেলে মাৎসর্য রিপুও এখানে বাসা বাঁধতে পারে। শ্রেণীস্বার্থপুষ্ট সমাজে এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই থাকে। কিন্তু এই মনোরাজ্যই হোল ক্ষমতালোভী মানুষের লীলাভূমি। অনুন্নত দেশগুলিতে বিভিন্ন শক্তিগোষ্ঠীর যে-তৎপরতা তার মূলেও আছে এই বিচারশক্তিহীন চেতনা। বিশেষ করে মার্ক্স তত্ত্ব চাঙ্গা রাখতে এর চেয়ে বড় অবলম্বন আর নেই। আর এ-বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ হয় কার্ল মার্ক্সের নিজেরই একটি ব্যর্থ মন্তব্যে। তিনি বলেছিলেন, 'ধনতান্ত্রিক উন্নত দেশেই প্রথমে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা পাবে।' অথচ আদৌ তা হয়নি এবং হয়নিই নয়, এই তত্ত্ব সেখানে নিজের প্রভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তিই পায়নি। কিন্তু কেন?

এর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বোধহয়, বিচারশক্তি লোপ পাওয়ার মত বুভুক্ষা, বঞ্চনা বা অবিচার তথায় নেই। বিভ্রান্ত হবার মত অশিক্ষা আর কুশিক্ষাও নেই। অবশ্য এগুলি যে আদৌ নেই তা নয়, কিংবা ন্যায্য পাওনা থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে না তাও নয়, কিন্তু তবুও যে তাঁরা ওই তত্ত্বের ফাঁদে পা দেননি তার একমাত্র কারণ

বোধহয় অবিচার আর অনাচারের সঙ্গে ব্যক্তি সত্তাকে স্তাবক করার যে-কৌশলটা ওতে মিশ্রিত হয়েছে সেটা চিনে নেবার শক্তি তাঁদের লোপ পায়নি। ঘটনাটা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সম্ভবত এই বাস্তব অবস্থাটা কিঞ্চিৎ হালকা করার তাগিদে কিছু তত্ত্ববাগীশ বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'সরকারী আমলাদের একমাত্র বিশ্বাসভাজন না ভেবে সকল শ্রেণীর জনগণকে বিশ্বাসের অংশীদার করলে তবেই সেখানে গড়ে উঠবে এক স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির সুদৃঢ় বনিয়াদ।'

এখানেই বিষয়টির সব সত্তা কেন্দ্রীভূত। আর কিছুটা দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, মনীষী মার্ক্স ভুলও করেছিলেন সম্ভবত এখানেই। কারণ যে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস ও প্রতিহিংসার দহন থেকে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর জন্ম, তার অস্তিত্বের তাগিদেই যে চিরকাল এ-চেতনাকে সযত্নে লালন করতে হবে এই সত্যটির রূঢ়তাকে তিনি আমল দেননি। তাঁর মনে পড়েনি, সকল মানুষকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতে এবং তাদের সুনিশ্চিত কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে যে মানসিক চেতনা ও নৈতিক উৎকর্ষতার প্রয়োজন, হিংসায় কৃতকার্য কোন মানুষের ভিতর তা কখনই ফিরে আসে না। হিংসা হোল অসুস্থ মনের এক দাম্ভিক প্রকাশ। পরস্পর যুক্তি বিনিময়ে বিবাদ মীমাংসার শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেললে তবেই এ-শক্তির উদয় হয়। এই অবস্থায় অরণ্যচারী অন্যান্য জীবের সঙ্গে এইসব মানুষের প্রভেদও বিশেষ থাকে না। মার্ক্স এ-তত্ত্ব জানতেন না তা হয়ত নয়, কিন্তু সেদিনকার সামাজিক পরিবেশ থেকে দ্রুত মুক্তির চিন্তা তাঁকে অত্যন্ত প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাই হয়ত এই সহজ সত্যটি তখন কিছুমাত্র গুরুত্ব পায়নি। না হলে এ তো কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে, হিংসা প্রশ্রয় পেলে তা স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়ে চলে এবং এ-অবস্থায় মানুষের পরমত সহিষ্ণুতা ও যুক্তি মেনে নেবার শক্তি হ্রাস পেতে পেতে এক সময় আত্মম্ভরিতাই সমগ্র চিত্তকে গ্রাস করে ফেলে। কাজেই মনীষী মার্ক্সের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকলে এ-কথা না বলার যুক্তি থাকে না যে, এ-সম্বন্ধে তাঁর আরও কিছুটা সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। কারণ 'বিপ্লব' বা 'মুক্তির পথ' অর্থে কারো চেতনায় কেবল

হিংস্র পথটাই গুরুত্ব পেলে সে-চেতনায় হিংসা-পরিহার-শক্তি প্রায়ই ফেরে না। প্রতিহিংসার আশঙ্কায় অন্তত রাষ্ট্র কর্তৃত্বে এ-প্রবৃত্তি চিরকালই টিকে থাকে। আর শেষ অবধি এটাই হয় নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। হয়েওছে বোধহয় তাই। অন্য দিকে মার্ক্সের জীবদ্দশায় যেসব শ্রমিক-বিপ্লব ঘটেছে তারও প্রায় সবটাই ব্যর্থ হয়েছে কিছু অতি বিপ্লবী ও মধ্যবিত্ত সুযোগ সন্ধানী শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতায়। এঁরা উভয়েই হয়ত এটাই প্রমাণ করে দিয়েছেন, অনাহারক্লিষ্ট বা নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণীকে উত্তেজিত করা, বিভ্রান্ত করা, রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করা যেমন যায়, তেমনি পরিশেষে হয়ত বা চারটির স্থলে মাত্র পাঁচটি রুটি প্রাপ্তির আশ্বাস পেলে তাঁদের নিবৃত্তও করা যায়। এর পর এই আদর্শটা অবশ্যই কিন্তু গাঢ় হয়েছে। কিন্তু রিক্ত বা নিপীড়িত মানুষের ওই মানসিকতার বড় কোন পরিবর্তন ঘটেছে তার প্রমাণ নেই। কার্ল মার্ক্স বেঁচে থেকে নিজে এর পরিবর্তন চাইলেও বোধহয় আজ তা হোত না। হয় তাঁকে মানবীয় ধ্যান-ধারণার সব মৌলিকতা বিসর্জন দিয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে আপোস করতে হোত, অথবা নিজেরই শিকার হয়ে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিতে হোত। তবে অনেকের বিশ্বাস, 'এই শেষ পরিণতিই ছিল বিশ্বমানুষের শান্তি সন্ধানী মার্ক্সের ভাগ্যে অবধারিত।'

আত্মরক্ষার তাগিদে মানুষ আদিকাল থেকেই সংঘবদ্ধ হতে চেয়েছে। বুদ্ধি বিকাশের সাথে এই প্রবৃত্তি আরও সক্রিয় হয়েছে, ব্যাপ্তি ঘটেছে। প্রয়োজনেই এটা হয়েছে। আর এই সুযোগে এসেছে নেতা, দলপতি ও একদল বিশেষ বিশেষ মানুষের আধিপত্য। বঞ্চনাকারী বা শোষক শ্রেণীর জন্মও হয় এখান থেকে, এই থেকে। এর পর প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে এবং এসেছে ঐশ্বরিক শক্তির ধারণা। অক্ষমতার গ্লানি থেকেও এ-ধারণা জন্ম নিতে পারে। অন্তত অসংখ্য দেব-দেবী, জিন-পরি, ভূত-প্রেত প্রভৃতির সঙ্গে মানসিক দুর্বলতার সম্বন্ধ থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। অথবা এও হতে পারে, কোন এক অতি ধূর্ত চেতনারই ফসল এঁরা। মানুষ যেভাবে এঁদের গ্রহণ করেছে তাতে অন্যের

উদ্দেশ্যজাত প্রভাব 'আদৌ নেই' বলা শক্ত। কারণ এখানেও দেখা গেছে, একদল বিশেষ মানুষ তাঁদের বিজ্ঞতার পশরা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন মধ্যস্ত হয়ে এবং নানাভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ওই সকল দেব-দেবী, জিন-পরি বা ভূত-প্রেতের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ সংযোগের কথা। অক্ষম ও সরলবিশ্বাসী মানুষ অকপটে এসব বিশ্বাস করে ওই লোকগুলিকে দিয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ। সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণ হবে, কেবল সংগঠন শক্তি বা রাষ্ট্র-শক্তির প্রভাবে নয়, ঐশ্বরিক শক্তি পুঁজি করেও একদল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমাজের উপর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব করার পথ করে নিয়েছেন এবং এর জন্য প্রয়োজন হয়েছে শুধু বাকী মানুষের অজ্ঞতা আর অসহায়তা।

হাঁ! ঠিক তাই। সমাজে এত যে চালাকী, এত অবিচার, অনাচার এবং প্রায় ৮০ ভাগ মানুষের এত যে দৈন্যদশা, এ কেবল এদের অজ্ঞতারই ফল। নইলে এ-প্রশ্ন অবশ্যই দেখা দিত ; সমাজে অন্যায়, অবিচার, ঘুষ, জোচ্চুরী ও ফাঁকি ছিল না কবে? কিংবা প্রশ্ন জাগত, ধর্ম প্রচারকদের কথা দূরে থাক, এর যাঁরা উদ্ভাবক তাঁরাই কি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু বা অন্যের অত্যাচার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন? 'আত্মার মৃত্যু নেই' এবং 'পূর্ব জন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফল ভোগ মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি' এ তো প্রায় সকল ধর্মতত্ত্বেই একটি প্রধান ভাষ্য। অর্থাৎ আজ যাঁরা সমাজে সুখ-ঐশ্বর্য ভোগ করছেন সেটা যেমন তাঁদের 'পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল', আবার যারা দারিদ্র্যক্লিষ্ট, নিপীড়িত, অনাহারে মরছে তাদেরও সেটা 'পূর্বকৃত দুষ্কৃতির ফল' ঐশ্বরিক তত্ত্ববেত্তারা সুরুতেই বোধ হয় এটা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। এই তত্ত্বজ্ঞরা এদেশে মুনি ঋষি পরিচয়ে খ্যাত। ব্রাহ্মণ্য তত্ত্ব এঁদেরই অবদান এবং কালে শ্রেণী ও জাতিভেদ প্রথা এই তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ। এতে মানব জাতির বিকাশ শক্তি কতটা জেগেছে সে-তথ্য আমার অজ্ঞাত। কিন্তু একটি প্রশ্ন? সেদিন সারা পৃথিবীতে লোক ত ছিল মাত্র কয়েক কোটি। আর আজ এ-সংখ্যা প্রায় ৪০০কোটি। এখন বৃদ্ধির হারই বছরে প্রায় ৫ কোটি। কাজেই

নতুন যাঁরা জন্মেছে ও জন্মাচ্ছে তাদের পূর্ব জন্মটা ছিল কোথায় ? অথচ দেখা যাচ্ছে এদের কেউ জন্ম নিচ্ছে সোনার চামচ মুখে নিয়ে রাজা, বাদশাহ, মন্ত্রী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ধনী ব্যক্তির ঘরে, আবার কেউ ভূমিষ্ঠ হচ্ছে দীন দরিদ্র, অভুক্ত ব্যক্তির কুঁড়ে ঘরে অথবা রাস্তার আস্তাকুঁড়ে। তবে কী এই শেষোক্তরা কীট-পতঙ্গের অভিশপ্ত আত্মা থেকে মানবাত্মায় রূপান্তর হয়ে এসেছে প্রায়শ্চিত্ত করতে আর পূর্বোক্তরা ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে পূর্বাহ্ণেই সৃষ্টি হয়ে এতকাল হিম ঘরে অপেক্ষা করছিল ? কারণ এত মানবাত্মা ত সেদিন ছিল না যে পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করতে আজ তারা হাজির হবে ! কিন্তু এর চেয়েও বড় প্রশ্ন, এতে ঈশ্বরের স্বার্থ কি ? আর ঈশ্বর যদি কেবল মানবেতর আত্মারই সৃষ্টি করেন এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে মানবাত্মায় রূপান্তরিত হতে হয় অর্থাৎ, ঈশ্বরের সরাসরি মানুষ সৃষ্টির দায়িত্বই না থাকে তবে ধরে নিতে হবে, মানুষের ভাল-মন্দের কোন দায়িত্ব গ্রহণের এক্তিয়ারও তাঁর নেই। আসলে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে প্রকৃতির হাতে তার পরবর্তী দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং প্রকৃতিই ভিন্ন ভিন্ন জীব সৃষ্টি করে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব তাদেরই উপর ন্যস্ত করেছেন', এই অবধি কল্পনা করতে এবং মেনে নিতেও যুক্তির সাহায্য মেলে। কিন্তু জীবের ভাল-মন্দের দায়িত্বও ঈশ্বর তাঁর নিজের হাতে রেখে ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়েছেন, এ-চিন্তায় যুক্তির সাহায্য মেলে না। এটা বোধ হয় সত্যও নয়। বিশেষ করে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের বেলায় ত নয়ই। কারণ এতে তাঁর সৃষ্টি শক্তির অসম্পূর্ণতাই প্রকাশ পায়।

মানুষের কল্পনার কোন লাগাম নেই। এক রামভক্ত হনুমান পৃথিবীর চৌদ্দ লক্ষ গুণ বড় জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড সূর্য্যকেও বগলদাবা করে রেখেছিল। কাজেই যে-ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় আপন প্রিয় পুত্রকে আছড়ে মারছে, ডাস্টবিন থেকে পচা উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাচ্ছে এবং তাও না পেয়ে রাস্তায় পড়ে মরছে, তার জন্য এ-জন্ম না হোক পূর্ব জন্মের কুকর্মফল খাড়া করা কিংবা যে-ব্যক্তি আর একজনের বুকের উপর দিয়ে মটর হাঁকিয়ে যাচ্ছে এবং অর্থের জোরে এর প্রতিকারের

আইনকেও ফাঁকি দিতে পারছে, তার জন্য পূর্ব জন্মের সুকৃতি আমদানি করা এমন কী শক্ত? এই সকল ত্রিকালজ্ঞ গবেষকদের উদ্ভাবনী শক্তির অবশ্যই তারিফ করতে হবে। এবং মানুষের নৈতিক উৎকর্ষতার তাগিদে কোন কোন অসংগতিকেও বা উপেক্ষা করা চলে। কিন্তু কেবলমাত্র বংশ পরিচয়েই উচ্চাসনের মৌরসী বন্দোবস্তটা?

মনে হয় এই প্রশ্নেই একটা সন্দেহ এঁদের মনেও বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল এবং কোন যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর না পেয়ে ওই 'পূর্ব ও পর জন্মের' একটা অদৃশ্য পরিণতির সম্বন্ধ খাড়া করা হয়েছিল। এই পূর্ব ও পর জন্মের তত্ত্ব আমদানি করতে না পারলে শুধুমাত্র ঐশ্বরিক বা ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে উচ্চাসনের মৌরসী অধিকারটা পাকা করা যেত না। এঁরা বুদ্ধিমান ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সকলের সব অভিসম্পাত মাথায় নিয়ে খুব স্পষ্ট করেই বলতে পারি, এর চেয়ে বড় ক্ষতিও আর কিছু থেকে মানব জাতির হয়নি। সত্যকে চিনে নেবার শক্তি যেটুকুও বা রক্ষা পাচ্ছিল এই চেতনার চাপে তা একেবারেই ভোঁতা হয়ে গেছে।

একটি সংবাদ বহুবার বহু স্থান থেকে প্রচার করা হয়েছে; —'চীন-রাশিয়া প্রভৃতি কমিউনিস্ট দেশগুলিতে বহু মন্দির, মসজিদ, গির্জা, বিহার ভেঙ্গে ফেলে বা রূপান্তর ঘটিয়ে তথায় স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল বা গ্রন্থাগার নির্মাণ করা হয়েছে।' এ-সংবাদের সত্য কতখানি জানা নেই, কিন্তু এর যুক্তিযুক্ততা নিয়ে দেশী-বিদেশী বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যে দুশ্চিন্তায় মুহ্যমান হয়েছেন এ-তথ্য জানা গেছে। যদিও এর অতি বড় সমালোচকও এমন সংবাদ দিতে পারেন নি যে, 'এই কাজের ফলেই সেখানে ঈশ্বরের অভিসম্পাতে কারো মুণ্ডু খসে পড়েছে বা মাথায় বজ্রপাত হয়েছে।'

অবশ্য আমাদের এই পুণ্যভূমির কথা স্বতন্ত্র। এখানে দেব-দেবীর সংখ্যাই নাকি তেত্রিশ কোটি। আর এঁরা যখন আবির্ভাব হন তখন এদেশে জনসংখ্যাই ছিল মাত্র কয়েক কোটি। কাজেই ভক্তির প্রবল বন্যা ব্যতীত এত সব দেব-দেবী যে আসতে পারতেন না তা সহজেই বুঝা যায়। এই ভক্তদের কেউ কেউ এককালে মা কালীকে তুষ্ট

করতে ষোড়শ উপাচার সাজাতেন ডাকাতিতে বের হওয়ার পূর্বে। অনেকে পরকালের জন্য নরবলি দিতেন এবং আজ হয়ত এঁদেরই অনেকে জয়-সীয়ারাম বা অন্য কোন মন্ত্র জপে খাদ্য, ওষুধ প্রভৃতিতে 'ভেজাল' নামক বিষ মিশাচ্ছেন। ইদানিং রাস্তাঘাট-গাছতলায় নেমে দেবতারা ধূপ-ধূনা ও ছোট কল্কের ধুনচির গন্ধে তুষ্ট হয়ে যে-সব বরপুত্র সৃষ্টি করছেন তাদের কথা আর নাইবা তুললাম। কিন্তু একটি প্রশ্ন কি এর পরে জাগে না ;—এত যে জপ-তপ-ধ্যান, হাজার হাজার বছরের এত যে সাধনা, বিপুল অর্থ ব্যয়ে এত যে ভোগ-অর্চনা-মাতামাতি, রাস্তাঘাটের এই বরপুত্ররাই কি তার সমষ্টিগত ফসল? অন্তত সেই আদি থেকেই প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ যা দেখেছে, যা পেয়েছে তার সঙ্গে আর কিছুই কি মেলে? অথচ এমনই এদের চেতনা যে, মিল-অমিলের এই প্রশ্নটাই যেন অবান্তর হয়ে গেছে। অর্থাৎ সমাজে বঞ্চিত যারা, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, শোষিত বা নিপীড়িত যাবা তাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আছে আর তার জন্য চেষ্টাও তারা করছে, কিন্তু সর্দার, রাজা বা রাজনৈতিক দলের বিবর্তনের ধাঁধাঁয় অথবা তত্ত্ব ও তন্ত্রের মায়া প্রভাবে একদল চতুব মানুষ যেমন চিরকালই তাঁদের কর্তৃত্ব-অক্ষুন্ন রেখেছেন আর সমাজের বৃহত্তর অংশের রস নিংড়ে সেই রসে বাকী চতুরদের তুষ্ট করে এই কর্তৃত্বের সমর্থক গড়েছেন জেনেও ওই রসদাতাদের চৈতন্যোদয় হয়নি, তেমনি যে-ধর্মীয় অনুশাসন কেবল এই শ্রেণী কর্তৃত্ব আর বৃহত্তর অংশের রস বের করার ব্যবস্থাকেই রক্ষা করছে তাকেও যুক্তির দরবারে উপস্থিত করা হয়নি। 'ললাট', 'অদৃষ্ট', 'কর্মফল', 'ভাগ্যলিপি' এসব এরই পরিণতি এবং বঞ্চিত ও বঞ্চনাকারীদের নির্বিরোধ সহাবস্থানের মূলেও আছে এই। ন্যায় যুক্তিতে অবশ্য আছে, 'খালি পেটে নৈতিক তত্ত্বের মূল্যায়ন সম্ভব নয় এবং দীর্ঘকাল এ-অবস্থায় ন্যায়নিষ্ঠ থাকাও অসম্ভব, ন্যায়নিষ্ঠার জন্য অবশ্যই পেটে কিছু পড়া চাই।' কিন্তু কতটুকু মূল্য এর এ-সমাজে? বড় জোর আরও কিছু যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ হয়ত বলবেন, 'সমাজ যতদিন না মানুষের পেটের ক্ষুধা মেটাতে পারছে ততদিন এর একটি দাবীও সে করতে পারে না'। এইত? না। পূর্বোক্ত বুদ্ধিমান

ব্যক্তিরা সেকথা মানতে রাজী নয়। ইতিহাস সহজে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মানব সমাজের বহু ইতিহাসের পটভূমিকায় যেসব তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে তার ভিতর প্রচুর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্যও যে আছে এও বোধহয় অস্বীকার করা যায় না। আর সম্ভবত এই অতিরঞ্জিত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্যগুলিই সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের আত্মনির্ভরতার পথে বড় বাধা হয়েছে। অপরকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রও প্রস্তুত করে দিয়েছে।

আমি পূর্বেই বলেছি, রাজনীতি হোল ব্যক্তি ও কিছুটা শ্রেণী-কেন্দ্রীক এক সংকীর্ণ চেতনার পরিণতি যা সার্বিক মানুষকে কখনই সম্পূর্ণ বিশ্বাস বা সঠিক শ্রদ্ধা করতে দেয় না। আর এও বলেছি, ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি রাজনৈতিক দলের উদ্ভবও হয় সমাজ তথা রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব-কামনা থেকে। এই আকর্ষণ না থাকলে কোন দলই দানা বাঁধতে পারে না। শাসন-কর্তৃত্বই এর প্রেরণার উৎস। সংগঠন ও সমর্থক উভয়েরই। আর রাজনৈতিক দল যত সহজে জনচিত্তকে বশ করতে পারে, প্রয়োজনে উত্তেজিত করতে বা বঞ্চনায় উদ্বুদ্ধ করে সামাজিক বঞ্চনার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করতে পারে, এমন কি আত্মত্যাগের মশাল জ্বেলে আত্ম-হত্যায় প্ররোচিত করেও কৃতকার্য হতে পারে, অন্য কারো পক্ষে ত বটেই, কোন ব্যক্তি-শাসকের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। অন্যের সঙ্গে এখানেই রাজনৈতিক দলের বড় প্রভেদ। কারণ গণমনের একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে এর ভীতিমূলে। 'ব্যক্তির শাসন সামাজিক পঙ্কিলতা দূর করতে অক্ষম নয়ত অনিচ্ছুক' এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার পরই গণমনে দেখা দেয় বিকল্পের সন্ধান এবং রাজনৈতিক দলের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে জনগণ বরণ করে নেয় তাঁদের। রাষ্ট্রের উপর একের স্থলে বহুর কর্তৃত্ব মেনে নেবার এটাই বোধহয় মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস। কিন্তু তার পরের ঘটনা?

সম্ভবত এখানে এসেই রাষ্ট্রকতৃত্বের মৌল মনস্তত্ত্বটা বেশ কিছু সাধারণ মানুষের কাছেও ধরা দিয়ে ফেলেছে। প্রকাশ পেয়েছে, এখানে কর্তৃত্বের সঙ্গে কর্তব্যপালনের যত না ঘনিষ্ঠতা হয় তার অনেক

বেশী ঘনিষ্ঠতা জন্মে অধিকারের সঙ্গে। পরন্তু অন্যত্র যেমন এক্ষেত্রেও ঠিক তাই, যে-বস্তু একান্তভাবে নিজস্ব নয়, অথচ কর্তৃত্বটা প্রায় নিরঙ্কুশ, সেখানে কেবল অধিকারবোধটাই সমগ্র চেতনাকে ঘিরে রাখে। এর থেকে মুক্ত থাকা শক্ত। প্রায় অসম্ভবও বলা চলে। কারণ কেউ কিছুটা মুক্ত থাকতে চাইলেও যেহেতু শাসক শব্দের উৎপত্তিগত অর্থের প্রভাবে সমগ্র শাসনযন্ত্র পরিচালিত হয় এবং ব্যক্তি বা দলীয় শাসনে জনগণকে বিশ্বাস করে তাদের উপর সার্বিক কোন দায়িত্ব অর্পণের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে উঠার অবকাশ থাকেনা, কাজেই এখানে এলে এর বিরোধী ধারণা একসময় অনিবার্য কারণেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ব্যক্তি বা দলীয় শাসনে শাসনযন্ত্রই প্রত্যক্ষ শাসক। গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র, পরিচয় যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে এ যে সমাজের বাকী মানুষের সক্রিয় প্রক্রিয়ার বহির্ভূত একদল ক্ষুদ্র সংখ্যক মানুষের অভিমতনির্ভর ব্যবস্থা, এই রূঢ় সত্যটা প্রশাসন যন্ত্রের প্রতিটি মানুষ স্পষ্ট অনুভব করতে পারেন তাই কায়েমী স্বার্থহানিকর কোন মৌল পরিবর্তন এক্ষেত্রে প্রায় কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না।

একে আরও একটু স্পষ্ট করলে দেখা যাবে, 'রাজা' এই বিশেষ একটি অর্থবোধক শব্দ যেমন বহুর ভিতর একজনের আলাদা অস্তিত্ব ও মর্যাদা ব্যক্ত করে তেমনি রাজনৈতিক দলও আলাদা একটি সংজ্ঞা ও অস্তিত্ব। আবার ওই রাজার রাজত্ব রাখতে যে ধরনের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী ভাবে দেখা দেয়, একটি গোষ্ঠি বা দলের ক্ষেত্রেও প্রায় সেই সবই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ক্ষেত্রান্তরে এর বাইরের চেহারায় কিছু প্রভেদ থাকলেও ভিতরের বস্তু প্রায় একই থাকে। তন্ত্র যাই থাক এ-তত্ত্ব এঁরা সকলেই জানেন যে, জনগণের মৌল সমস্যাগুলির যেকোন পরিবর্তনে সর্বাধিক প্রয়োজন যেমন জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা, তেমনি সেই সহযোগিতার সার্থক সমাপ্তি শেষে শাসক ও শাসন যন্ত্রের বর্তমান রূপ অর্থাৎ গুরুত্ব ও প্রয়োজন কিছুটা ফিকে হয়ে পড়বেই।

রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে সংঘাত সর্বকালের ও সকল দেশে। এই ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি বা দল এ-সংঘাত এড়িয়ে যেতে চাইলেও ক্ষমতাকামী অন্য ব্যক্তি বা দল নিশ্চেষ্ট থাকেন না, তাঁরা চূড়ান্ত লক্ষ্যপানে ছুটতে চান। ছুটতে তাঁদের হয়ও। কারণ এ-ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র শিথিলতায় ওই ব্যক্তি বা দল তাঁদের গুরুত্ব ও সমর্থক দুইই হারান এবং এঁদের অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অভাব যেমন প্রাচুর্যের গুরুত্ব বাড়ায়, কিংবা অন্ধকার বাড়ায় আলোর গুরুত্ব, তেমনি সামাজিক অবিচার আর অব্যবস্থা থেকেই এই সকল ব্যক্তি বা দলের গুরুত্ব বেড়ে থাকে। এর পরিমাণ নির্ভর করে জনমানসে অবস্থাটা তুলে ধরার কৌশলগত শক্তির উপর। শাসনতক্তে টিকে থাকার প্রধান একটি অবলম্বনও এই। যদিও কর্তৃত্ব দখলের ক্ষেত্রেই এটা বেশী মূল্যবান। সুতরাং রাষ্ট্রক্ষমতা যদি রাজনীতিকদের মুখ্য কাম্য হয় এবং আজ অবধি দুই একটি ক্ষেত্র ব্যতীত যার ব্যতিক্রম আদৌ দৃষ্টিগোচর হয়নি, তবে এ-ধারণা মোটেই অমূলক হবেনা যে, পরিপূর্ণ সুস্থ, সাবলীল ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ এঁদের কারো পক্ষেই সুখকর হতে পারে না। কারণ এটা তাঁদের গুরুত্বেরই পরিপন্থী।

অবশ্য আমি বার বার কেবল সেই রাজনীতিকদের কথাই বলতে চাইছি, যাঁরা নেতৃত্ব নয় কেবলমাত্র রাষ্ট্র তথা সমাজের উপর কর্তৃত্ব করতে চান। চান তার ব্যক্ত উদ্দেশ্য অবশ্যই সমাজের কল্যাণ। কিন্তু একজন ব্যক্তির কথা দূরে থাক, যেকোন একটি দলের দিকে তাকালেও দেখা যাবে তাঁদের নিজেদের ভিতরই ক্ষমতার কাড়া-কাড়ি কত ব্যাপক। একজন সহকর্মী বা সহযাত্রীকে ল্যাং মেরে হামেসাই আর একজন উপরে উঠতে চাইছেন। এর জন্য প্রায় সকল সুযোগই এঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য। আর এখানেই শেষ নয়, তাঁর জীবিতকালে অপর কেউ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে না পারেন সে-বিষয়ে তাঁর চেতনা হয়ে ওঠে আরও বেশী সক্রিয়। ডান বাম কারো ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম বড় একটা চোখে পড়বে না।

কিন্তু এখানে সাধারণ মানুষের বিচার্য কি? যাঁরা নিজেদের ভিতর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পরিহার করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, একই দলের

সহ-সাথীদের সঙ্গেও সমতা রাখতে অপারগ তাঁরা বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবেন, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখতে ও সকলের জন্য সম সুযোগ সৃষ্টি করতে আন্তরিক তৎপর হতে পারবেন একি সম্ভব? আর এই সময়ই কি তাঁদের থাকে?

আমরা পূর্বেই দেখতে পেয়েছি, পৃথিবীতে যে-চাষযোগ্য জমি আছে তা সঠিকভাবে চাষ হলে অন্তত একহাজার কোটি মানুষের খাদ্যের অভাব থাকে না। অথচ আজ ৪ শ' কোটি মানুষের ভিতর প্রায় ২ শ' কোটিই বুভুক্ষায় ধুঁকছে। মানুষ এ্যাটম, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন বোমা বানাচ্ছে, চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে, কিন্তু কোটি কোটি অভুক্ত মানুষের জন্য সর্বনিম্ন যেটুকু খাদ্যের প্রয়োজন এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিচারে যেখানে অন্তরায়ের প্রশ্নটাই অবান্তর হয়ে পড়ে— কই তাও ত উৎপন্ন হচ্ছে না। আর শুধু কি তাই, এই অভাব এবং কোটি কোটি মানুষের অনাহার, অপুষ্টি বা অকালমৃত্যু যতটা গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল ঠিক ততটাই কি কোথাও পেয়েছে? তথ্যই বলবে, পায়নি। কিন্তু কেন?

প্রশ্নটা সরল, কিন্তু অত্যন্ত নির্মম। আর কণ্ঠ যাঁদের নির্ভীক তাঁদের উত্তরটাও খুব স্পষ্ট—সকল মানুষ পেট পুরে খেতে পেলে এবং এই খাদ্যবস্তু সহজ প্রাপ্য হলে তাদের ভিতর যে স্থিরতা আসে, চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে ও আত্মমূল্যবোধ সজাগ হয়ে আত্মনির্ভরতার শক্তিকেও সক্রিয় করে তোলে অর্থাৎ সমাজে আসল চালাকীটা ঠিক কোথায় সেটা দৃষ্টিগোচর হয়ে প্রত্যেকের অধিকারের দাবী সঠিক পথ ধরার শক্তি পায়—সমাজের উপর কর্তৃত্ব করছেন বা করতে চান এমন একজনও তাতে সায় দিতে পারেন না। এমন একটি অবস্থা সহ্য করাও এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ অন্য কোন যুক্তিদ্বারা একথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলেনা যে শুধুমাত্র উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় সমাজের সকল মানুষের সম অংশ ও কর্তৃত্ব থাকলে এই অবস্থা কিছুতেই দেখা দিতে পারত না কিংবা কিছুকাল পারলেও এতকাল পারত না।

একথা যাঁরা বলেন যে 'ভারতে বহু সমস্যার উৎপত্তি ও স্থিতির

মূলে ছিল রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের অক্ষমতা বা অবিবেচনা' তাঁরা কিছু ভুল বলেন যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা শক্ত। অন্যের ভুল-ত্রুটি এবং তজ্জনিত ক্ষয়ক্ষতি বা বিকাশ মন্থরতা তুলে ধরে নিজেদের দুর্বলতার কৈফিয়ত দিতে চাইলেও প্রথমেই প্রশ্ন জাগবে, এ সবই ত পরীক্ষিত বিষয়; কাজেই সংশোধনের পথ ত অজানা থাকার কথা নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে-সময় অপচয় হয়েছে এক্ষেত্রে তাই বা হবে কেন? তবে এ-প্রশ্ন এখানে অবান্তর। উত্তরদাতাদের কেউ এসব প্রশ্ন আমলও দেন না। বরং এখানে পালটা প্রশ্ন হতে পারে, এ কি শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? কিংবা কোন বিশেষ মতবাদে দীক্ষিত একদল শাসকই এর জন্য দায়ী এবং এঁদের পরিবর্তে এমনই অন্য কারো বা আর কোন মতবাদীদের উপর এ-দায়িত্ব বর্তালে অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটবে যার ফলে অভিযোগ করার কিছুই আর থাকবেনা? স্বাধীনতার পর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি তাই অস্পষ্টতা কিছু হয়ত থাকতেও পারে। সেটা স্বাভাবিক কিন্তু পরিবর্তন যেসব ক্ষেত্রে বহুবারই ঘটেছে সেখানেই কি অবস্থার মৌল কোন ব্যতিক্রম ঘটেছে?

আদতে এর সবটাই হয়ত এক অলস তর্ক। অন্তত সাধারণ মানুষের কাছে ত বটেই। কারণ এদের চেতনা রাজনৈতিক তত্ত্বকথার কূটজালে আবদ্ধ হয়ে একেবারে অসাড় হয়ে না গেলে একথা বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হোত না যে, একদিকে গুপ্তধনের প্রলোভন আর অন্য দিকে চোরাবালির ভয় দেখিয়ে আসলে ওই বক্তারা যা বলতে চান সে কেবল সমাজের ৮০ ভাগ মানুষকে নিংড়ে রস বের করার যে-যন্ত্রটি সভ্যতার আদি থেকে সক্রিয় হয়েছে তারই দখল পাওয়ার আমন্ত্রণ। ওই যন্ত্র সরাবার কোন আশ্বাস ওতে নেই।

আমরা ইতিহাসের আর একটু গোড়ার দিকে যদি যাই তবে দেখতে পাব রাজতন্ত্রের কবল থেকে যেদিন প্রথম জনগণ শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন সেদিন মাত্র একটি দলই সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরাই দেশের সমগ্র অধিবাসীর প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার পেয়েছিলেন। এই দলটির রাজনৈতিক সংজ্ঞা বা তাত্ত্বিক

মূল্য হয়ত আজকের মত স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু দেশের সকল মুক্তিকামী মানুষ একই উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে একদল বিশেষ মানুষ বা একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্বভার ন্যস্ত করে অবশ্যই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। এটাই সম্ভবত জনগণতন্ত্রের আদি পর্ব। কিন্তু তার পরের ঘটনা?

দেখা গেল, কিছুদিনের মধ্যেই একদল সন্ধানী মানুষ এর ভিতরকার গুপ্ত কৌশলটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন এবং তাঁরা এও জানতে পেরেছেন, সম্পদ, সম্মান ও সমগ্র সমাজের উপর প্রতিপত্তি লাভের এমন সুলভ রাস্তা আর একটিও নেই। এ এক দুর্লভ আবিষ্কার। এর হাতছানি অস্বীকার করা শক্ত। সুতরাং তারাও আর একটি দল বা সংঘ গঠন করে জনগণের বিভিন্ন অভাব, অভিযোগ বা অসন্তুষ্টি সামনে রেখে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে তৎপর হয়ে উঠলেন। হয়ত এমনি করেই প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছে।

অবশ্য অভাব ও অভিযোগের বেদনা থেকেও এর জন্ম হতে পারে। কিন্তু যেভাবেই হোক, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই যে এর চরম লক্ষ্য এ অস্বীকার করা যায় না। সাধারণ মানুষের অভাব বা অভিযোগই এক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন। আর এটা তীব্র হলে কিংবা ইন্ধন দিয়ে গণমনে 'প্রতিকারহীন হয়েছে' এই বোধ জাগিয়ে দিতে পারলে তবেই একের স্থলে অন্যের হাতে ওই ক্ষমতা যাওয়া সম্ভব। ক্ষমতা জোর করে কেড়ে নিতে হলেও অভাবী ও অভিযোগকারীদের ওই চেতনাসিক্ত সমর্থন ও আর সহযোগিতা চাই। সুতরাং সামাজিক অবিচার যেমন শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের মৌল উপাদান, একের স্থলে অন্যের প্রতি আকর্ষণের হেতুও এই। এটা প্রায় সকলেই জানেন। আর সবচেয়ে বেশী জানেন যেকোন একজন শাসক নিজে। অথচ এঁদের কেউই সমাজ থেকে এই হেতুটি মুছে ফেলতে পারেন নি। পারলে অন্য শাসক বা দলের প্রতি গণ আকর্ষণ অবশ্যই শেষ হয়ে যেত।

কিন্তু বহুদৃষ্ট এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও জনগণ এঁদের কথায় আকৃষ্ট হয় ও নির্ভর করে কেন? কোন নিগূঢ় তত্ত্ব এখানে অবশ্যই আছে।

হ্যাঁ! তত্ত্বটা কিছু নিগূঢ়ই বটে। যদিও এটা নিগূঢ় হয়েছে

জনগণের অস্থিরতা এবং সত্য উদ্‌ঘাটনে অক্ষমতা থেকেই। কেননা বিষয়টি নিয়ে যাঁরাই উপস্থিত হন তাঁরা আসেন নতুন সাজে নব নব শব্দ যোজনায় নতুন আশার বাণী নিয়ে। কয়েক দিন আগের ব্যর্থ কেউ এলেও জনগণ দেখে তাঁদের নতুন চোখে, নতুন আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে। অতীতকে ভুলে যেতে তাদের ক্ষণমাত্রও দেরী হয় না।

কিন্তু বারে বারেই এটা হয় কি করে?

এখানেই গণমনের আরও দুটি দুর্বল দিকের সন্ধান পাওয়া যাবে। এবং মূলত এই দুর্বলতার সুযোগেই আমাদের পরিচিত বর্তমান সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পেরেছে। এর একটি হোল দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনীতিকে এক করে ফেলা এবং অন্যটি রাষ্ট্র থেকে ঠিক কতখানি কার প্রাপ্য সে-সম্বন্ধে কারো ধারণাই স্পষ্ট না থাকা। সহজ কথায় আমরা প্রায় প্রত্যেকেই সকল রাজনীতিকের ভিতর কিছুটা বিজ্ঞতা ও দেশপ্রেমের মহিমা কল্পনা করে থাকি। অর্থাৎ রাজনীতিক মাত্রই যে বিজ্ঞ আর দেশভক্ত, প্রায় সমগ্র মানুষের মনে এমনিই একটি ধারণা জন্মলাভ করেছে। এটা বর্তমান সমাজের দান। কারণ সামাজিক পরিবেশ সঠিক ও ন্যায়নিষ্ঠ হলে এটা বুঝতে কষ্ট হোত না যে, দেশপ্রেমের উদ্ভবই হয় দেশ ও দেশবাসীর প্রতি অদম্য ভালবাসা এবং কর্তব্যের আকর্ষণ থেকে। অসত্য, অসুন্দর, অভাব আর অপমানের হাত থেকে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করাই এর ধর্ম। এ-বস্তু আত্মত্যাগ আর আত্ম-পীড়নেই নিবদ্ধ থাকে, প্রতিদান চায় না, কেবল আত্মদানেই সার্থকতা খোঁজে। একজন খাঁটি দেশপ্রেমিকের পক্ষে দক্ষ রাজনীতিক হওয়া খুবই শক্ত। প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। কিন্তু দক্ষ রাজনীতিকের ক্ষেত্রে দেশ ও দেশবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসার প্রশ্নটাই কিছুটা গৌণ। এঁদের মুখ্য প্রয়োজন দলীয় ব্যক্তি বা সমর্থকদের মুগ্ধ রাখার উপকরণ, দেশবাসীর প্রতি অনুরাগের অভিনয় এবং সামাজিক অবিচার-ঘটিত অসত্য ও অসুন্দরকে কাজে লাগাবার কৌশল। এই কৌশল আর অভিনয়েই আমরা বিদ্ধ হই। এঁদের ভিতর ব্যতিক্রম যদিও বা থাকেন কিন্তু তাঁকে চিনে নেওয়া অতীব

শক্ত। আর খুঁজে পেলেও দেখা যায়, তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা পূর্বাহ্নেই ওই আরব্ধ চরিত্রের শক্তি লুপ্ত না হোক ভোঁতা করে দিয়েছেন। গান্ধীজীর নাম এখানে তুলব না। কারণ সে-ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লিখা অবধি তাঁর অপেক্ষা করতে হয়নি। তাছাড়া কর্তৃত্বের হাতছানি তাঁকে স্পর্শ করতেও পারেনি। সফল নেতৃত্ব-দান শেষেও নিরাসক্ত নিরহংকার অস্তিত্ব তিনি।

অন্যদিকে আমরা কেউই জানিনে, রাষ্ট্র তথা সমাজের কাছ থেকে আমাদের সঠিক প্রাপ্য কতটুকু? নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে যার যত সতর্কতাই থাক, সমাজের পক্ষে সেই যোগ্যতার কতটা মূল্য দেওয়া সম্ভব ও সংগত সে-বিষয়ে কারো ধারণাই সম্পূর্ণ নয়। এই পরিমাপ করার ধৈর্যও কারো থাকে না। বিচার শক্তি নিজের দেবার যোগ্যতাকে আমল না দিয়ে 'আরও প্রাপ্য আছে' কেবল এই চেতনাকেই মুখ্য করে নেয়। আর ঠিক এরই সুযোগ নিয়ে থাকেন প্রতিটি কর্তৃত্বকামী ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দল। 'সমাজের বর্তমান অন্যায়, অবিচার, অভাব ও অব্যবস্থার মূলে আছেন আজকের এই শাসককুল', কিংবা ওই 'আরও প্রাপ্য আছে' যুক্তিকে সুড়সুড়ি দিয়ে 'কিন্তু এই শাসকদের না হটালে সেটা পাওয়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই' এই জাতীয় বক্তব্যে এঁরা সহজেই জনচিত্তকে আকর্ষণ করতে পারেন। কেউ তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই ধারণা সন্দেহাতীতভাবে জাগিয়ে তুলতে পারলে সেই প্রাপ্য আদায়ের আশ্বাসে তাকে কাছে টানা কিছুমাত্র শক্ত নয়। চেষ্টা করলে হয়ত বা কিছুটা বিভ্রান্তির ফাঁদেও ফেলা যায়। অন্তত তার যুক্তির শক্তি সাময়িক হলেও যে যথেষ্ট শিথিল করা যায় এর প্রমাণ আছে সর্বত্র। বিষয়টি সকলেরই অজ্ঞাত তা হয়ত নয়, কিন্তু একে এড়িয়ে চলা খুবই শক্ত। এ-ক্ষেত্রে হাতের কাছেই পশ্চিমবংগ ও কেরালা রাজ্যকে স্মরণ করা চলে। কারণ এদেশে এ দু'টি রাজ্যেই নাকি শিক্ষিত আর রাজনৈতিক চেতনালব্ধ মানুষের হার বেশী। দুনিয়ার তামাম তন্ত্রের কোন একটির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই যে এঁদের কাছে অজ্ঞাত নয় বাক্যে ও ব্যবহারে বহু জন এটা প্রকাশ করেও থাকেন। আর গণ-

তন্ত্র রক্ষায় এঁরা যেভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন তার ত তুলনা মেলাই ভার। বুর্জোয়া শক্তিকে যেকোন মূল্যেই এঁরা প্রতিহত করতে বদ্ধ-পরিকর। উত্তম প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই! যদিও অন্য অঞ্চলের অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, 'এটা কোন গণতন্ত্র? যে-গণতন্ত্রে অন্তত দাবী করা চলে, মনের আবেগ এবং সামাজিক অভাব-অভিযোগের বিষয়-গুলি নির্ভীক কণ্ঠে প্রকাশ করা চলে অর্থাৎ, যেসব কথা অধিকাংশ রাজতন্ত্রে, স্বৈরতন্ত্রে বা বিশেষ একটি দলতন্ত্রে উচ্চারণ করাও অসম্ভব, অথবা যে-তন্ত্র 'বুর্জোয়া' বলে প্রচারিত হয়েও বিশ বছরের একটি প্রতিষ্ঠিত দলকে হটিয়ে দিয়ে কেবল 'চোথা' কয়েকটি ভোট পত্রের ব্যবধানেই অন্য দলকে শাসন তক্তে বসাতে পারে ওঁদের প্রত্যাশিত গণতন্ত্রও কী সেই গণতন্ত্র? কিংবা কোন গণতন্ত্র কতটা গণমত-নির্ভর আর কোনটির ভিতর কতটা শয়তানির সুযোগ নিহিত আছে সেই গূঢ় তথ্য না জানলেও যেহেতু কোন মানুষই ভুল ত্রুটির উর্ধে নয় আর যদিও বা তা কেউ হন তবে আরও যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান পেলে তাঁর উপরই দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া সংগত এবং সুস্থ পরিবেশে অধিক মানুষের স্বতঃস্ফূর্তঃ সম্মতিক্রমে এই হস্তান্তরই হোল প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার; কাজেই এ-প্রশ্নও কারো থাকতে পারে, 'এঁরা যে-গণতন্ত্রের কথা বলেন তাতে এসব সুযোগ আছে তো?' আবার এ-প্রশ্নও কারো থাকতে পারে, যে-কমিউনিস্ট গণতন্ত্রীরা ভারতবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার যোগ্যতম অভিভাবকরূপে নিজেদের জাহির করতে তৎপর, তাঁদের শাসন ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে আছে জনগণ তাঁদের ন্যূনতম কোন অভিযোগ নিয়েও শাসন দরবারের সামনে ভিড় করতে পারেন?'

অথচ প্রধানত এই কমিউনিস্টদের হাতেই এই দু'টি রাজ্যের শাসনভার তুলে দিয়ে জনগণ তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালাবাসীর মত রাজনৈতিক চেতনা-লব্ধ বিজ্ঞ মানুষের পক্ষে ভুল বুঝাবুঝি বা অবিবেচনা প্রসূত আবেগের অবকাশ থাকবে এটা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। কেন পারে না সে-তথ্য পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে। কাজেই এই দায়িত্ব অর্পণ ব্যাপারটার যুক্তি খুঁজতে হলে এক্ষেত্রে এই ধারণাই পোষণ করতে হয়

যে, ভারতে যে-সংজ্ঞায় গণতন্ত্র পরিচিত সেই সংজ্ঞা পালটানোই ছিল এই হস্তান্তরের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই কী এর শেষ কথা? সম্ভবত নয়। কারণ যাঁরা এঁদের সমর্থন করেছেন এবং আজও করছেন, তাঁদের ভিতর স্বতন্ত্র সংজ্ঞার প্রভাব আছে খুবই সামান্য সংখ্যক ব্যক্তির উপর, কিন্তু বাকী সমগ্র সমর্থকই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন ও হচ্ছেন মনের সেই দুর্বল অংশটিরই প্রভাবে, যেখানে রাজনীতিকরা প্রভুত্ব করেন ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের আশ্বাস দিয়ে। এই আশ্বাসলব্ধ পরিবর্তনটাই এঁরা চান, তার পরিণতিটা জানতে চান না। অনেকের জানবার মত মননশীলতাই থাকে না। গণমনের এই বিশেষ অবস্থাটির প্রতি আকর্ষণ কেবল একটি মাত্র দলের নয়, সকলের। এ-কথা পূর্বেই বলেছি। কখন কী উপলক্ষ্যে কোন যুক্তির সাহায্যে একে চাগিয়ে দিয়ে কাজে লাগাতে পারবেন তার উপরই নির্ভর করে এঁদের সাফল্য। বিষয় নির্বাচন এবং উপস্থিত করার কৌশল; এই দুটিই এর প্রধান অংশ।

যেমন ভারতে চুক্তিকৃত রাজন্য ভাতার পরিমাণ ছিল বছরে প্রায় ৪ কোটি টাকা। এ যে একটি বিরাট অপচয় এতে কোন সন্দেহ ছিল না। একদিন এ-চুক্তির প্রয়োজন থাকলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাবে ভারতবাসীর সামনে উপস্থিত হোল এ এক অনাবশ্যক ও অপ্রীতিকর গুরুভার হয়ে। শুধু অপচয় বলে নয়, অবমাননাকর বলেও অনেকে বিবেচনা করলেন। অতএব এর পরিবর্তন চাই। এ-দাবী স্বাভাবিক। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার বা চুক্তির অবশ্যই একটি বিশেষ মর্যাদা থাকে। আর সেটাই সভ্যতার প্রধান চিহ্ন। অধিবাসীদের কাছেও এটা গুরুত্বের প্রতীক। কাজেই কিঞ্চিৎ দ্বিধা থাকলেও ছিল হয়ত এখানেই। পরিবর্তনের বিষয়টি তাঁরা হয়ত একটি যুক্তিসিদ্ধ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার আর জনস্বার্থ পরস্পর বিরোধী নয়। কোন বিশেষ অবস্থায় একটি অপরটির পরিপন্থী হলেও যথেষ্ট সতর্কতায় সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান খুঁজতে হয়। এটাই এ-সমাজের রীতি। একে অগ্রাহ্য করলে শাসনক্ষমতায় আসীন যেকোন দল যেকোন মুহূর্তে গণ-

স্বার্থের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রের দেওয়া যেকোন অঙ্গীকারকেই নাকচ করতে পারেন। আর এই সুযোগে একসময় হয়ত সমগ্র রাষ্ট্র-সংবিধানটিকেই পালটে ফেলার যুক্তি খাড়া হতে পারে। কারণ সমস্যা জর্জরিত সমাজে সাধারণ মানুষ যে এসব নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার অবকাশ পাবে না এ-বোধ রাজনীতিক মাত্ররই থাকে। বরং ওই ৪ কোটি টাকার মত ইস্যুকেই বৃহৎ করে তোলা তাদের পক্ষে বেশী সহজ। হয়ও ঠিক তাই। শুধু অর্থক্ষতিটাই যদি গণ আলোড়নের প্রধান হেতু হোত তবে স্বাধীনতার পর প্রতি বছর কেন্দ্র ও প্রতিটি রাজ্য সরকারের যে-অডিট-রিপোর্ট বের হয় এবং সে-রিপোর্টে যেসব ক্ষতির ফিরিস্তি থাকে অর্থাৎ .যে-কোটি কোটি টাকার কর ফাঁকি, হিসেবের কারচুপি, অপচয়, অপব্যয় প্রভৃতি ধরা পড়ে তার জন্য জনগণ আরও বেশী সরব হোত। কারণ স্বাধীনতার পরেও এ-ক্ষতির মোট অঙ্ক নাকি কয়েক হাজার কোটি টাকা। এ ভিন্ন প্রায়শঃই সংবাদপত্রে যেসব তথ্য বের হয়, যেমন সরকারী গুদামে আজ লক্ষ টন সিমেণ্ট জমে নষ্ট হোল, কাল আর একটি গুদামে ২৯ লক্ষ টাকার দামী শাড়ী পচে গেল, পরশু খাদ্য গুদাম থেকে কয়েক কোটি টাকার খাদ্যশস্য হয় অখাদ্য নয়ত উধাও হোল, আবার কয়েকদিন পরই আমদানি করা বহু কোটি টাকার মূল্যবান যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেল ইত্যাদির মোট যোগফলও কয়েকশ' কোটি টাকা। এর পর বিদেশী মুদ্রা ফাঁকি, শুল্ক ফাঁকি, সরকারী বহু সংস্থায় লোকসান প্রভৃতি কত কিই ত আছে। এই কলকাতা শহরেই ট্রাম ও বাস চালাতে গিয়ে রাজ্য রাজকোষের ক্ষতি বছরে প্রায় ১০ কোটি টাকা। যুক্তিগ্রাহ্য মুনাফাই হতে পারতো নাকি যেখানে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট ক্ষতি তা হলে বছরে ১৩।১৪ কোটি টাকা। আর শুধু অর্থক্ষতিই ত নয় যানবাহনের অব্যবস্থায় জনগণের যে দুর্ভোগ হচ্ছে অনেকের মতে সেটা নাকি 'মধ্যযুগীয় সামন্ত হৃদয়হীনতাকেও হার মানায়।' অথচ রাজন্য ভাতার মত এসব ক্ষতিও রাজকোষের এবং এর প্রতিটি পয়সাই দিচ্ছে জনগণ; হয় কেউ তার সহজ উপার্জন থেকে—নয়ত কেউ তার বঞ্চনার পরিধি বাড়িয়ে। কিন্তু এ নিয়ে কি

খুব বেশী কারো মাথা ব্যথা আছে? নেই। থাকেও না কোনদিন। যতক্ষণ না কোন রাজনীতিক বা কোন দল একটি ক্ষতিকে ক্ষতির সংজ্ঞায় ব্যক্ত করেন ও প্রতিবাদের শক্তি যোগান ততক্ষণ গণমনের বোধশক্তিটাই ঘুমিয়ে থাকে। আর গণমনের এই অবস্থাটাই হোল রাজনীতিকদের জীয়নকাঠি এবং তূণের মারণ অস্ত্র। রাজকোষের সব ক্ষতিই জনগণের, কিন্তু কোন ক্ষতিতে কখন তাদের ব্যথিত হতে হবে বা প্রতিবাদ করা আবশ্যক সেই বোধ জাগিয়ে দেন রাজনীতিকরা। ব্যথার পরিমাণ এবং প্রতিবাদের ভাষাও বাৎলে দেন তাঁরাই। এটা তাঁদের কর্তব্য বা কৃতিত্ব যাই হোক, কিন্তু গণচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ওঁদেরই মুখাপেক্ষী হওয়া। যার মূল্য ওঁরা সুদে-আসলেই আদায় করে থাকেন। আর এ থেকে এ-সিদ্ধান্তে আশা কিছুমাত্র শক্ত নয় এবং সেই সিদ্ধান্তকে কোন যুক্তিদ্বারাই খণ্ডন করা যায় না যে, ব্যক্তিবিশেষ অথবা কোন দলের উপর রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকলে আর একজন ব্যক্তি কিংবা আর একটি দল চিরকালই গণমনের ওই দুর্বল অংশ দুটির সুযোগ গ্রহণ করতে থাকবেন এবং বর্তমান সমাজে যে-জটিলতা, যে-অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্যগুলি রয়েছে তা চিরকালই থেকে যাবে। অর্থাৎ যে অন্যায়, অবিচার, অসুস্থতা ও অজ্ঞতাকে হাতিয়ার করে সভ্যতার সেই সূচনাকাল থেকে একে অপরের উপর প্রভুত্ব করছে, মুষ্টিমেয় মানুষ সমাজের বৃহত্তর সংখ্যক মানুষকে পদানত করে রেখেছে এবং তাদের শ্রমরসে এরা পুষ্টও হচ্ছে, তার অবসান কোন কালেই হবে না। কারণ মানুষ যতই পাক তার চাওয়ার যেমন শেষ নেই এবং বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সেটা সম্ভবই নয়, তেমনি যারা পাচ্ছে আর যারা পাচ্ছে না তাদের উভয়ের চাওয়ার প্রবৃত্তি চিরকাল সক্রিয় থাকবে বলে পরস্পর ব্যবধান ও তজ্জনিত সংঘাতও থেকে যাবে।

অবশ্য কমিউনিস্ট সমাজে এরও একটা স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা আছে। যদিও ব্যাখ্যাটা সকলের নয়, যাঁরা অধিক পাচ্ছেন বা কর্তৃত্ব করছেন তাঁদের। কিন্তু সেই ব্যাখ্যা থেকে যদি এ-ধারণাই করতে হয় যে, ওই সমাজে 'আরও চাই' আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটেছে কিংবা

কোন অন্যায় বা অবিচার নেই বলেই আজকের ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজনও শেষ হয়ে গেছে, তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রশ্ন সংগত যুক্তিতেই দেখা দেবে যে, এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হলে সেখানে জনমত নিয়ন্ত্রণের আদৌ কেন প্রয়োজন ঘটে এবং কেন সেখানে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমত প্রকাশের সকল সম্ভাবনাময় অবলম্বনই কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় ?

এর কোন সদুত্তর নেই। যুক্তিগ্রাহ্য কোন তথ্যও এর সমর্থনে নেই। বরং সব কিছু মেনে নেবার প্রবৃত্তিই কীভাবে জনমনের আর সব জিজ্ঞাসা স্তব্ধ করে দেয় সেটা স্পষ্ট হওয়ার মত যথেষ্ট তথ্য আছে। যেমন কমিউনিস্ট প্রভাবিত যুক্তফ্রন্ট শাসনে কোন কোন বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীর হয়েছিল। পূর্বে যেখানে একটিমাত্র খুন, জখম বা নারী নির্যাতনে সমগ্র সমাজ আলোড়িত হোত, সমবেত কণ্ঠ সরব হয়ে উঠতো, কিন্তু এই সময় প্রায় প্রতিদিন ২।১০ টি এরূপ ঘটনার সংবাদেও সমাজ একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। এমন কী সংবাদ জানার আগ্রহটাই যেন থেমে গেল। এর জের অবশ্য এব পরেও মেটেনি। তবু ত কমিউনিস্টরা একক ভাবে শাসন ক্ষমতা পাননি যে তাঁদের প্রভাবেই সব চিত্ত একেবারে নিষ্ক্রিয়, নিঃস্পৃহ হয়ে পড়বে। আর ঘটনার কেন্দ্রভূমি কেবল মাত্র একটি রাজ্য সীমায় আবদ্ধ বলে এর গণতান্ত্রিক কাঠামোটাও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়তে পারেনি। কিন্তু কোন প্রতিকারেব পথ নাগালের বাইরে চলে গেলে মানুষের মন থেকে কী ভাবে ন্যায়-অন্যায় বোধ, চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং মানবীক চেতনা শিথিল হয়ে যায় এ তারই একটি অতি বাস্তব নিদর্শন।

মানুষ মাত্রই নতুনের পূজারী। অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার বাসনা তার চিরন্তর। এর বিরূপতা বা অন্তরায় মাত্রই অন্তরকে ব্যথিত করে। প্রতিকারের পথও খোঁজে। এটা তার ধর্ম। এ-ধর্ম সোজা পথ না পেলে অনেককে বাঁকা পথে টেনে নেয়। আর আমরা কেউ স্বীকার করি বা না করি ইতিহাস এটা গোপন করতে পারেনি যে, জনগণের স্বাধীন সত্তা যেখানে যত বেশী

দমিত হয়েছে কর্তৃত্বের কাড়াকাড়ি সেখানেই তত বেশী উগ্র হয়ে পড়েছে। সুতরাং অক্ষমতা বা অবিচারজনিত পরিবর্তন প্রয়াসটা জনগণ কর্তৃক ব্যক্ত হতে না পেলেও 'শোধনবাদী', 'সংশোধনবাদী', 'ধনতন্ত্রের দালাল' কিংবা 'জনস্বার্থের পরিপন্থী' শক্তি দমন করার যুক্তির আড়ালে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এক শ্রেণীর ভিতর থাকেই এবং এর সবটুকু মূল্যও দিতে হয় বাকী জনগণকে, অধিকন্তু পরিবর্তন আপোসে হলে যে-মূল্য দিতে হয় এসব ক্ষেত্রে দিতে হয় তারও অনেক বেশী।

অধিকাংশ মানুষের ধ্যান-ধারণাই কিছুটা পরিবেশনির্ভর। কাজেই এর তাত্ত্বিক যুক্তির সঙ্গে ন্যায়যুক্তির প্রভেদ ঠিক কোথায় ও কতখানি, সহজে নজরে আসে না। যেমন পূর্বে এদেশে সতীদাহ প্রথা সমাজগ্রাহ্য এবং যুক্তিসিদ্ধও হয়েছিল, কিংবা কোন কোন দেশের রাজাকে তথায় ঈশ্বরের অংশ রূপে মেনে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ন্যায়ের দরবারে এর একটিকেও কী যুক্তিসিদ্ধ করা চলে? আসলে পরিবেশের প্রভাবে যুক্তিও কিছুটা প্রভাবিত হয় তাই বহু জনের কাছেই এ-ধারণা গুরুত্ব পায় না যে, শুধু সমাজগ্রাহ্য হলেই কোন ব্যবস্থা ন্যায় বা যুক্তিগ্রাহ্য হয় না, ন্যায় ও যুক্তিগ্রাহ্য হতে হলে ব্যবস্থাটিকে অবশ্যই সার্বিক কল্যাণধর্মী হতে হয়। সুতরাং খুব স্পষ্ট করেই বলা চলে, কোন সামাজিক বিধি-বিধান বা ব্যবস্থাপনা—সে যত দীর্ঘস্থায়ীই হোক,—তা যদি আশ্বাস বা আস্ফালনের গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকে, প্রতিশ্রুতি বাস্তবতার স্পর্শ না পায়, তবে তার ভিতর বাস্তবিক কোন সত্য আছে তা কিছুতেই স্বীকার করা চলে না।

পূর্বেই বলেছি, সমাজের প্রায় সকলেই পরিবেশের অধীন। আর যে-পরিবেশ গড়ে ওঠে প্রধানত শ্রেণী স্বার্থে তথা শ্রেণী শাসনে, তার যুক্তিও স্বভাবতই সংকীর্ণতাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। তন্ত্রের ভেদাভেদে এর পরিবর্তন হওয়া শক্ত। ভারতবাসী ত বিদেশী রাজশাসন দেখেছেন, স্বদেশী না-রাজ-না-গণতন্ত্র শাসনও দেখেছেন, সংসদীয় গণতন্ত্র দেখেছেন, আবার সেই সঙ্গে হবু সমাজতন্ত্রও দেখছেন। কিন্তু প্রশাসন যন্ত্রের —যে-যন্ত্র মূলতঃ সামাজিক পরিবেশও সৃষ্টি করে থাকে—কোথায় কী পরিবর্তন ঘটলো, তা কি সকলে জানেন? অন্তত ৮০ ভাগ মানুষ

বোধহয় জানেন না। তাঁদের পক্ষে এটা সম্ভবই নয়। অথচ এঁদেরই কারো কারো মন্তব্যে এই দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ পায় যে, 'এই সমাজ ব্যবস্থায় যদি একজন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক হাজার টাকাও বেতন পান তবু তিনি তাঁর শিক্ষা কার্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারবেন না, সরকারী কর্মচারীদের পাঁচগুণ বেতন বাড়লে, এমনকি সকল খাতের সমগ্র রাজস্বটা কেবল তাঁদের প্রয়োজনে ব্যয় হতে থাকলেও প্রশাসনিক অলসতা কিংবা জনগণের হয়রানীর বিলোপ ঘটবে না এবং শ্রমিক, কর্মচারী ও কৃষকদের কয়েকগুণ অতিরিক্ত আয় বাড়লেও উৎপাদন চূড়ান্ত লক্ষ্য ছুঁতে পারবে না। এ শুধু অনুমান নয়, পরীক্ষিত ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবিতা। তবে এসব কথার মূল্য কিছু নেই। কারণ একের বিষয় অন্যের জানবার বা বুঝবার অবকাশই এ-সমাজে নেই। পরিবেশই এ-প্রয়োজন অর্থাৎ, দেশের সামগ্রিক প্রয়োজন অস্বীকারে সাহায্য করে। প্ররোচিতও করে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে অপরকে বঞ্চিত করতে। এই পরিবেশ নিজের প্রয়োজনের পরিধি ও তার ন্যায্যতা ধার্যের একতরফা সুযোগ দিয়েছে তাই কর্তব্য-হীন অধিকার বা কর্মহীন ফলের দাবীও যথেষ্ট সমাজগ্রাহ্য হতে পেরেছে। আর এই যে একটা আংশিক মানুষের দাবীতে রেলের চাকা অচল হয়ে গোটা দেশবাসীর জীবনযাত্রা অচল করে দেয়, সমগ্র দুগ্ধপ্রকল্প বন্ধ করে রোগী ও শিশুদের অনাহারে রাখে, কখনও বা লক্ষ লক্ষ টাকার দুধ নষ্ট হয়েও যায় এবং সমগ্র চিকিৎসা-ব্যবস্থা অচল হয়ে বহু রোগীর অকাল মৃত্যু ঘটায় অর্থাৎ, খাদ্য, জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসা, যানবাহন—এক কথায় কোন কিছুর উপরই বাকী সমগ্র জনগণের কিছুমাত্র অধিকার থাকে না, তাদের প্রতিবাদের এক্তিয়ারটাও অগ্রাহ্য হয় আর এই সব অধিকারই ন্যস্ত হয় কেবল সংশ্লিষ্ট কর্মীদের উপর, এর মূলেও থাকে এই সামাজিক পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন। সমাজ স্বীকার করে নিয়েছে, কেবল ওঁদের দাবীই গণতান্ত্রিক অধিকারভুক্ত। যে-কাজের ফলে একজন সাধারণ নাগরিকের জেল, জরিমানা বা হাজতবাস হয়ে থাকে সেই কাজও ওঁদের গণতন্ত্রসম্মত অধিকারের আওতায় পড়ে। আর এ-

অধিকার বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে চাইলেই যেকোন শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠন যেকোন মুহূর্তে যেকোন প্রতিষ্ঠান যতদিন খুশী অচল রাখতে পারেন। পারেন কারণ সাধারণ মানুষ এবং যাত্রী, রোগী বা শিশুদের কোন সংগঠন নেই। আর সেটা যে সম্ভবও নয় সেকথা ওই দাবীদার এবং সমাজকর্তারা জানেন, কাজেই বাকী সকলের অধিকার গৌণ হতেও কিছুমাত্র আটকায়নি। 'কিন্তু গণতন্ত্র ?'—কেন! 'জনগণ ভোট দিচ্ছে না? রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক বলা হচ্ছে না ?'

তা ঠিক। এবং এর পরেও যদি সংসদীয় অর্থাৎ, দলীয় গণতন্ত্রের মহিমা কেউ না বুঝে থাকেন তবে সে-অপরাধ ত তারই। তাও বটে। কারণ এ-প্রশ্ন ত কেউ তোলেনি যে, এই যে কোটি কোটি গণজীবনকে অচল করে দেবার আইনসিদ্ধ অধিকার ওই মুষ্টিমেয় গণরা পেলেন একি সমগ্র দেশবাসীর অভিমত নিয়ে হয়েছে ? সম্ভবত কেউ তা তোলেনি এবং এও বোধ হয় ঠিক যে, সে-সুযোগই সাধারণ মানুষের কোথাও জোটেনি। যদিও প্রায় সকলেই জানেন হরির লুটের বাতাসা ছড়িয়ে দিলে দাতার তাতে আপাত ত্রুটি বেশী থাকেনা, কিন্তু সে-বাতাসা কেবল সবল ব্যক্তিরাই কুড়িয়ে নিতে পারেন এবং নিয়েও থাকেন তাঁরাই। দুর্বল যাঁরা তাঁরা বঞ্চিত হন। পৃথিবীর সর্বকালের আর সব শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে ত বটেই এমন কি আজকের দলনিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের সঙ্গেও হয়ত এই লুটের বাতাসা ছড়াবার একটা স্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। চালাক ব্যক্তিরা দু'হাতে লুটে খাবার যতটা সুযোগ পেয়েছেন, সরল, সৎ এবং দুর্বল যাঁরা তাঁরা ঠিক ততটাই অসহায় ও বঞ্চিত হয়েছেন, হচ্ছেন। নিত্য নতুন লুটেরার আবির্ভাবও সহজ থেকে সহজতর হচ্ছে।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবি অনগ্রসর সমাজের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলেছিলেন, 'যেখানে অন্তর্নিহিত সামাজিক শক্তিগুলি অধিকতর উৎপাদন ও তার প্রগতির পথ উন্মুক্ত করতে অক্ষম সেখানেই সমাজ অনগ্রসর। কর্তব্যের চেয়ে অধিকার সচেতনা এ-সমাজের একটি প্রধান লক্ষণ।' গান্ধীজীও অনেকটা এই কথাই বলেছেন।

বলেছেন, 'নীতিশাস্ত্র এবং অর্থনীতির মধ্যে আমি কোনও সুস্পষ্ট পার্থক্য বিবেচনা করি না। অর্থনীতি যখন কোন ব্যক্তি বা জাতির নৈতিক অধোগতি সাধন করে তখন তাহা দুর্নীতি।'

অধিকাংশ সমাজে, বিশেষ করে অনুন্নত সমাজে শ্রেণী বিশেষের অধিকার-চেতনা আজ এমন একটি স্থানে উপস্থিত হতে পেরেছে যার ফলে শুধু তাঁদের নয়, সমাজের বিরাট এক অংশের কর্তব্যবোধ ও ন্যায়নীতির ধারণাটাই সম্পূর্ণ পালটে গেছে। নগদ অর্থ ফাঁকি আর মূল্য নিয়ে কর্মে ফাঁকি যে একই পর্যায়ে পড়ে, উপরন্তু এই ফাঁকি আরও বৃহৎ ক্ষতির জমি তৈরী করতেও পারে, এই বোধটাই বহুর চেতনা থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে, শুধু মাইনে বৃদ্ধি, চাকরীর স্থায়িত্ব বা পদমর্যাদার উন্নতি থেকেই এই বোধশক্তি আবার ফিরে আসবে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় তা বোধ হয় সম্ভব নয়। আবার এ-সম্ভাবনা যদি যুক্তির বিচারেই নস্যাৎ হয় তবে সমাজের বাকী মানুষই বা ন্যায়নিষ্ঠ থাকবে কোন আদর্শের প্রভাবে? আদর্শেরও প্রকৃত মূল্যটা প্রচারে প্রকাশ পায় না, পায় প্রয়োগে। সেখানে ন্যায়নিষ্ঠার অভাব থাকলে কারো পক্ষেই সত্য নিরূপণ করা কিংবা সঠিক লক্ষ্য স্থির করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠার অভাব থাকলে সেখানে অনিবার্য কারণেই অসত্য সত্য হবে এবং সত্য অসত্য হবে। সমাজের সকল মানুষের সক্রিয় প্রতিকার প্রচেষ্টা ভিন্ন এর প্রতিবিধান সম্ভব নয়। আবার কিছু কর্তৃত্ব না থাকলে কারো সক্রিয়তাই কিন্তু আন্তরিক হয় না। সুতরাং সমাজকে যদি ন্যায়নিষ্ঠ রাখতে হয় এবং সেই সমাজকে যদি সমষ্টি মানুষের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত করতে হয় তবে তার একমাত্র ন্যায়গ্রাহ্য পথই হোল কর্মশক্তি নিয়োগ এবং সেই কর্মফল বণ্টনে একটি সার্বিক কর্তৃত্বের পত্তন করা। কারণ আত্মকর্তৃত্ব না থাকলে কোন মানুষ যেমন তাঁর পরিপূর্ণ কর্মশক্তি নিয়োগে অন্তরের সাড়া পায় না, তেমনি একটি সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্বের বাইরে যিনিই এই কর্তৃত্বের অধিকারী হোন তাঁর চেতনা কিছুতেই সঠিক ন্যায়নিষ্ঠ থাকতে পারে না। 'পারে' এই বক্তব্য হয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, নয়ত অবিবেচনা-

প্রস্তুত। কিন্তু সত্য কিছুতেই নয়। নেতৃত্বও সমতাভাবের বাইরে গেলেই সেটা হয় কর্তৃত্ব।

বিষয়টিকে অন্যভাবে পর্যালোচনা করলে হয়ত আরও একটু স্বচ্ছ হবে। যেমন সরকারই হোন কিংবা কোন ব্যক্তি মালিকই হোন, শ্রমিক-কর্মচারী বা জনগণের সব দাবী মেটাবার শক্তি কারোই থাকে না। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। রাজতন্ত্রে কিংবা কোন ব্যক্তি-সর্বস্ব শাসনে অধিকাংশ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ স্বভাবতই হয় সীমিত এবং তাদের আত্মচেতনাও যথেষ্ট বিকাশলাভের সুযোগ পায় না। ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে কিছু মানুষ সহজেই সর্বেসর্বার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন। যদিও অনেকে বলেন, 'এই সর্বেসর্বারা কিন্তু কোন অধিকার বলেই সমগ্র সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অচল করতে সাহস পাননি, যেটা এই গণতন্ত্রে মাত্র কয়েক ব্যক্তি চেষ্টায়ও সম্ভব হচ্ছে।' এটা অবশ্য স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু গণতন্ত্রে অধিকাংশ মানুষের আত্ম-চেতনা সজাগ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, কাজেই বিভিন্ন মানুষের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন দাবী জেগেছে, সমাজের গতির সঙ্গে সে-দাবীর যোগান বাড়ছে এবং যেহেতু গণচেতনা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার একটি মূল্যবান হাতিয়ার কাজেই দাবী যোগাবার লোকও আছে। সুতরাং যথেষ্ট কুটতর্ক শেষেও এই সিদ্ধান্তে আসা কিছুমাত্র কষ্ট নয় যে, দাবীর সঙ্গে দাবী মিটিয়ে নেবার দায়িত্বটা যদি ওই দাবীদারদের উপরই বর্তে তবে সেক্ষেত্রে একটি সার্বিক সুস্থ পরিবেশ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন পথই আর তাঁদের সামনে খোলা থাকে না।

অনেকে মনে করেন, 'যেখানে বেশীরভাগ মানুষ অশিক্ষায় ও দারিদ্র্যে সমাজের সঠিক অবস্থা বুঝে নিতে অক্ষম সেখানে একের স্থলে দেশের সমষ্টিগত দলের শাসন হলে যেকোন সমস্যার মোকাবিলা সহজ হবে। কারণ এতে সমগ্র দেশবাসী একই সঙ্গে নির্দিষ্ট একটি কর্মসূচীর সামিল হতে অন্য কারো প্ররোচনা বা প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে না। দলীয় সংঘাত অথবা ক্ষমতার

কাড়াকাড়ি না থাকলে জনগণের পক্ষেই সঠিক পথ বেছে নেওয়া সহজ হবে।' মনে হয় এ-ধারণা এসেছে মূলত বহু দলের সংঘাত থেকে। যদিও মাত্র ২-৩টি দল যেখানে, সেখানেও এ-সংঘাত আছে, তবে তার দাপট হয়ত ততটা নয়। দলীয় সংঘাত আকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক হয়েছে কাজেই এই ধারণার ঔচিত্য না হোক, ঔদার্য ও সরলতার মূল্য কিছু অবশ্যই আছে। কিন্তু যুক্তি?

প্রথমতঃ এরূপ মিলন কোথাও পোক্ত হয়েছে তেমন নজির নেই। আর মিলন যদিও বা হয় কিন্তু যে-কারণে কোন একটি রাজনৈতিক দলই দলীয় স্বার্থের ঊর্ধে থাকতে পারেন না সেই কারণটি একত্র হওয়ার ফলেই দূরে থাকবে তারও যুক্তিগ্রাহ্য হেতু নেই। 'অযোগ্যতা সমবেত শক্তির প্রভাবে হ্রাস পাবে এবং পরস্পর অবিশ্বাস না থাকলে সমাজের গতিও বৃদ্ধি পাবে' এ হয়ত যুক্তি হতে পারে। কিন্তু দেশের সমগ্র মানুষের স্বার্থটাই যদি সকলের একমাত্র লক্ষ্য হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন দলের উৎপত্তি কেন? মত ও পথ ভিন্ন? অন্যের যোগ্যতা সন্দেহাতীত নয়? কিন্তু সে-ক্ষেত্রে তাঁরা একত্রে একই পথ ধরে এগোবেন কী করে? ঔদার্য যতই থাক এর ন্যায়গ্রাহ্য উত্তর কিন্তু শক্ত। বরং পৃথক অস্তিত্বের মিলনে আত্মঅস্তিত্বের প্রয়োজনই যে মিলনপূর্ব ঔদার্যটুকু আরও সহজে পিষে ফেলতে পারবে তার পক্ষে যুক্তি আছে। এসব ক্ষেত্রে 'আদর্শ' অর্থে যে-উঁচুদরের একটি আবেগ আমরা কল্পনা করি তার বাস্তব মূল্য কিছু যদি থাকেও তবে তা আছে কেবল সাধারণ কর্মী ও সমর্থকদের কাছে। যাঁরা নেতা অর্থাৎ রাজনীতি যাঁদের পেশা এবং কর্তৃত্ব যাঁদের সাধনা, তাঁদের কাছে এর মূল্য প্রায় সবটাই বাচনিক। প্রয়োজনে এর রূপ পালটায়, ব্যাখ্যা হয়। কাজেই এক দলের স্থলে বহুদল হলেই তার মৌল পরিবর্তন হবে, সামাজিক পরিস্থিতি পালটাবে এর যুক্তিগ্রাহ্য হেতু নেই। এই মিলন থেকে বরং এমন একটি পরিণতির জন্যই অপেক্ষা করা চলে এবং যার সামান্য কিছু বাস্তবতায় প্রকাশও পেয়েছে,—ক্ষমতা এবং তার অবশ্যম্ভাবী সুযোগগুলিকেই মাত্র এঁরা একের পরিবর্তে

সকলের ভিতর আপোসে ভাগ করে নিয়েছেন। যা একটি দল ভোগ করছিলেন বা করতে পারতেন তাতেই সকলের অংশ স্বীকৃতি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এর প্রারম্ভিক অধ্যায় শেষ হতে এও দেখা গেছে, আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আয়াসে সফল করতে বর্তমান সমাজের যে-অব্যবস্থাগুলি সহজ অবলম্বন হয়ে থাকে তার প্রায় প্রত্যেকটি এঁদের পরস্পরবিরোধী ক্ষমতার সংঘাতে যতটাও বা সংযত ছিল এই মিলনে তারও আর প্রয়োজন নেই। ভারতে যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলি হয়ত আমার বক্তব্য থেকেও বিষয়টিকে বেশী স্পষ্ট কবতে পেরেছিল। যদিও প্রসঙ্গটির প্রধান অংশ এও নয়। প্রধান যেটা এবং যাকে কোন ছলেই খাটো করা চলেনা, সে হোল এরূপ বহুদল শাসনে প্রশাসনিক যন্ত্রটির উপর কিছু বিভ্রান্তির ছায়াপাত পড়েই। পড়তে বাধ্য। কারণ আদর্শই হোক কিংবা রাজনৈতিক চেতনাই হোক, এর প্রভাব যখন সর্বত্র এবং প্রসার ঘটাতে সকল দলই উদগ্রীব, তখন কেবল প্রশাসন কর্মীরাই এর বাইরে থাকবেন বর্তমান সমাজে সেটা বোধ হয় অসম্ভব। আর কেউ থাকতে চাইলেও অন্যের পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব নয়। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন দল সমর্থকরা একে অপরকে হেয় করতে তৎপর হবেন এবং অধিকৃত ক্ষমতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবেন এ-সম্ভাবনা কী উড়িয়ে দেওয়া চলে? একেবারে যে চলেনা তারও কিছু পরিচয় বোধ হয় বহু দেশের মানুষই পেয়েছেন। অবশ্য বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে একাধিক দলের সার্থক শাসনের নজিরও আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইংল্যাণ্ড এর জ্বলন্ত প্রমাণ। বিশেষ একটি পরিস্থিতি থেকেই এই মিলনের মানসিকতা গড়ে উঠেছিল এবং এ-জাতীয় মানসিকতা ভিন্ন সম্ভবত এরূপ সরকার একদিনও সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। তাছাড়া ইতিহাস এও প্রমাণ করেছে যে, মানসিক প্রস্তুতি যথেষ্ট সুদৃঢ় থাকা সত্ত্বেও এরূপ সরকার যে-পরিস্থিতি থেকে গঠিত হয় কেবল তার মোকাবিলা অবধিই সার্থক হতে পারে, তার বাইরে এই যোগ্যতার প্রভাব বিশেষ পড়ে না।

প্রায় সকলেই লক্ষ্য করেছেন, রাজনৈতিক দলমাত্রেই নেতা ও কর্মীর মূল্য ধার্য হয় তাঁর সমর্থক সংখ্যার বিচারে! যাঁর যত বেশী সমর্থক প্রকৃতপক্ষে তিনি তত বড় নেতা বা কর্মী। এই সমর্থক কিসের প্রভাবে হবেন তার কোন সামাজিক নির্দেশ নেই। প্রতিভা, অর্থ এমন কি প্রকাশযোগ্য নয় এমন কিছুর প্রভাবেও এটা হতে পারে। অর্থাৎ সমর্থনের হেতু ব্যক্তিত্ব, না অন্য কিছু সেটা অপরিহার্য নয়, তাঁর গুরুত্বের প্রধান অংশ কেবলমাত্র সমর্থক সংখ্যা। রাজতন্ত্রেও এত উদারতার স্থান ছিল কিনা বলা শক্ত। কিন্তু এ থেকে এমন একটি প্রশ্নও কারো জাগতে পারে ; 'যে-ব্যবস্থায় সমাজের উচ্চপদে এমন কি মন্ত্রীত্বে বৃত হতেও কোন নির্দিষ্ট মানের যোগ্যতার আবশ্যক থাকে না সেখানে অযোগ্যতাই যদি সর্বত্র যোগ্যতার দাবী করতে চায় তবে তা প্রতিরোধের কোন সুযোগ থাকে কি? একদিন ত তবে গোটা সমাজকেই এ-দাবী গ্রাস করতে পারে।'

হয়ত বলা হবে, 'এ-ধরনের একটি সামাজিক চরিত্র শুধু অনগ্রসর দেশেই দেখা দিতে পারে। কারণ জনগণ যথেষ্ট সতর্ক নয় তাই অযোগ্য ব্যক্তিরাও এখানে জনপ্রতিনিধি হতে সাহস পান এবং এঁদেরই কারো কারো পক্ষে নগদ বা মন্ত্রীত্ব মূল্যে বিক্রিত হওয়াও সম্ভব যার অপরিহার্য প্রভাবে গোটা সমাজের নৈতিক মূল্যবোধই অবনমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু উন্নত কোন সমাজে এ কখনই ঘটনা হতে পারে না।'

এ একটি তর্কের বিষয়। কোন সমাজে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব কিনা সন্ধানের অপেক্ষা রাখে। তবে এও ঠিক, উন্নত দেশের রাষ্ট্রকর্তারা অভিজ্ঞ এবং তার চেয়েও সতর্ক। একটু বেশী চালাকও বোধ হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে আড়াল রাখার কূট কৌশলে ওঁরা বেশী রপ্ত। তবে এসব সত্ত্বেও কিন্তু এমন অকাট্য প্রমাণ মেলেনি যা থেকে মূল প্রশ্নকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করা চলে। সমাজের নৈতিক মূল্যবোধটা ত আর আড়ালে রাখা যায় না।

অনেকের মতে 'সমস্যা এবং অভাব আছে বলেই মানুষ নিত্য নতুন পথের হদিস পাচ্ছে, আরও বেশী পাওয়ার তাগিদ বাড়ছে,

ফলে মানুষের অনুসন্ধিৎসা ও মনীষারই বিকাশ ঘটছে। অভাব এবং সমস্যা না থাকলে মানুষের চলার গতিই শ্লথ হয়ে যেত।' হয়ত তর্কের দরবারে এ-মতের গুরুত্ব কিছুটা আছে, কিন্তু যুক্তির সামনে এ-মত সম্পূর্ণ দ্যুতিহীন। কারণ অভাব বা সমস্যা না থাকলেই মানুষের চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যেত এটা যেমন প্রমাণ করার মত কোন তথ্য নেই, তেমনি সমস্যাহীন পরিবেশ আর প্রাচুর্য থেকেই মানুষের চলার গতি শ্লথ হয়ে যাবে এরও ন্যায়গ্রাহ্য যুক্তি নেই। আদতে এর সবটাই এক অবাস্তব কল্পনা। প্রাচুর্য সীমাহীন যদি হয়ও তবু আরও পাওয়ার বাসনাকে কখনই নিঃশেষ করতে পারে না। অর্থাৎ প্রাচুর্য কামনার গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবে এ একেবারেই অসম্ভব। আর কামনা থাকলে সমস্যা কিছু থাকবেও। কাজেই কামনাবিমুখ প্রাচুর্য এবং সমস্যাহীন সমাজ আসলেই অলীক কল্পনা।

কিন্তু প্রশ্ন এ নয়। এসব যুক্তিতর্ক বর্তমান সমাজের একটি রক্ষাকবচ মাত্র। সাধারণ মানুষের চেতনাকে এরই ভিতর আবদ্ধ রাখার ফিকির। আসলে সমস্যা কিছু ছিল, আছে এবং থাকবেও। এর অনেকটাই হয়ত প্রকৃতিদত্ত। কিন্তু যে-সমস্যা সৃষ্টি করা হয় এবং যে-কল্পিত সমস্যার গল্প ফেঁদে অধিকাংশ মানুষকে অসহায় ও পরনির্ভর করার চেষ্টা চলে, এ-প্রসঙ্গের মূল বিষয় সেইটিই। অর্থাৎ যে-সমস্যার চাপে আজ বেশীর ভাগ মানুষই বিকাশ বঞ্চিত, নিষ্প্রভ ও নিষ্পেষিত এবং অতি ক্ষুদ্র একদল মানুষ এই সমস্যাকেই পুঁজি করে পুষ্ট হচ্ছে, বাকী সমগ্র মানুষের উপর ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কর্তৃত্ব আর প্রভুত্ব করার সুযোগ পেয়ে তিলে তিলে এদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে, সেই সমস্যার বিলুপ্তি ঘটানই হচ্ছে মানবসমাজের মূল সমস্যা। সহজ কথায়, সমস্যা মানুষের বিকাশশক্তিকে বিকসিত করতে ইন্ধন যোগালেও তার নিজ চরিত্রের পরিবর্তন ভিন্ন সকল মানুষ কিছুতেই বিকসিত হবে না। আর সমস্যার চরিত্র পরিবর্তন করতে হলে সর্বাগ্রে চাই সমাজব্যবস্থারই আমূল পরিবর্তন। শ্রেণীবিশেষই যে এখানে বাকী মানুষের বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে, তাদের সৃষ্টিধর্মী

চেতনার উপর অসত্যের আবর্জনা চাপিয়েছে, এই সরল সত্য দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করতে হবে। কারো বিন্দুমাত্র ন্যায়বোধ অবশিষ্ট থাকলে স্বীকার করতে হবে একথাও যে, মানব সমাজের বৃহত্তর অংশকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে গণ্ডীবদ্ধ রাখার নির্লজ্জ বাসনা আর সেই সুযোগ থেকেই জন্ম নিয়েছে পরিচিত সমাজের সমুদয় সমস্যা। উদ্ভব হয়েছে অ্যাটম, নাইট্রোজেন প্রভৃতি বিধ্বংসী মারণ অস্ত্র। সৃষ্টি ও হাতিয়ার হয়েছে মানুষকে বেকার বা কর্মবিমুখ করার যন্ত্র। আর স্থায়ী হয়েছে ব্যাপক বুভুক্ষা ও দারিদ্র্য। কিন্তু মানুষ যদি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আজকের এই সমস্যার অবসান ঘটাতে পারে অর্থাৎ যাঁরা এ-সবের সৃষ্টিকর্তা তাঁদের কর্তৃত্বচ্যুত করে তথায় সার্বিক মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবে আগামী দিনের সমস্যার উদ্ভব হবে সাগর সেচে মানিক তোলার যন্ত্র। মানুষকে পরাধীন ও পদানত করার অস্ত্রের বদলে তৈরী হবে প্রকৃতিকে পদানত করার অস্ত্র। প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ না থেকে সর্বস্তরের সকলের ভিতর ব্যাপ্ত হতে পেলে অর্থাৎ, ধূর্ত ব্যক্তিরা ব্যাপ্তির পথ রুদ্ধ করতে না পারলে সমাজের এ-পরিবর্তন দূরাগত তো নয়ই সম্ভবত বহু পূর্বেই মানবজাতি ওই পর্যায়ে পৌঁছে যেত। কারণ যত প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে এবং যত কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার ভিতর বেশীটাই হয়েছে কঠিন প্রতিযোগিতার ও তীব্র প্রতিবন্ধকতার বাধা সরিয়ে। অশুভ বাধা সরাতে যেয়ে বহু প্রতিভাই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে এবং ৩।৪ অংশ মানুষ আদৌ কোন সুযোগই পায়নি। সুতরাং এই সত্য উপলব্ধি করতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, সমাজে শ্রেণী-প্রভুত্ব না থেকে সার্বিক মানুষের কর্তৃত্ব থাকলে আজ অবধি যত প্রতিভা ও যত মনীষার সাক্ষাৎ মানুষ পেয়েছে তার চারগুণ বেশী অবশ্যই তাঁরা পেত। তবে এও সঠিক সংখ্যা নয়। কারণ মানবশক্তির যতটা অপরকে পদানত রাখতে ব্যয় হয়েছে তা যদি না হোত এবং কোন প্রতিবন্ধক না থেকে প্রত্যেকেই যদি সম সুযোগ পেত তবে কেবল প্রতিভার প্রতিযোগিতায় আরও বহুগুণ এবং আরও উন্নত প্রতিভার জন্ম হোত।

রাষ্ট্র হচ্ছে এক বৃহত্তম সংস্থা। এর কর্মকাণ্ড আরও বৃহৎ। সাধারণ মানুষ এর নাগাল প্রায় কোন কালেই পায় না। 'পায় না' অর্থে সেই সুযোগই তাদের কাছে রুদ্ধ। রুদ্ধ রাখা হয়েছে এবং এর প্রায় সব কৃতিত্বটাই শাসক ও শাসনযন্ত্রের। ধূর্ত সুযোগসন্ধানীরা দিয়ে থাকে মদ ত। এর উপর ক্ষমতালোভী রাজনীতির ব্যাপারীরা কে কখন কোন উদ্দেশ্যে কী বলেন তার হদিস পাওয়া আরও দুরূহ। কিন্তু এর পরও যদি দেশের সমগ্র উৎপাদন, বণ্টন, পরিবহন প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থার ভার কেবলমাত্র প্রশাসন কর্তৃত্বে ন্যস্ত হয় তবে সাধারণ মানুষ খেই হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। এই অবস্থায় তারা পরিস্থিতির দাসত্ব করতে বাধ্য হতে পারে, আত্মনিগ্রহের কুশলী প্ররোচনাকে বৃহত্তর কল্যাণের পরাকাষ্ঠা ভাবতে অনুপ্রাণিত হতে পারে, অবিবেচক বা অশালীন হতেও হয়ত বিবেকের বাধা থাকে না, কিন্তু কিছুতেই একজন সম্পূর্ণ মানুষ হওয়ার উপকরণ পেতে পারে না। আর এই নিগূঢ় তত্ত্বটাই হোল রাষ্ট্রকে ব্যক্তি বিশেষ বা দলীয় কর্তৃত্বে রাখার মৌল উপাদান। মানুষকে পূর্ণ বিকসিত ও আত্মনির্ভর মানুষ হতে হলে তার নিজের উপর যে যথেষ্ট কর্তৃত্ব থাকা চাই এবং এই কর্তৃত্ব পেতে গেলে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের কবলমুক্ত করে সার্বিক কর্তৃত্বে রাখা চাই এই তত্ত্বটাই সযত্নে ও সুকৌশলে সাধারণের কাছে গোপন রাখা হয়েছে। আর ব্যবস্থাটির পত্তনও সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে, কাজেই এর যারা শিকার তাদের কাছেও এটা সংস্কারে পরিণত হতে পেরেছে।

কিন্তু প্রতিকারের পথ?—পথ কেবল সত্য উপলব্ধি। সত্য উপলব্ধি থেকেই সঠিক শক্তি জন্ম নেয়। স্মরণ রাখতে হবে, প্রায় কোন মানুষই সর্বক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ মানুষ নয়। আবার কোন মানুষ সর্বক্ষণের জন্য বা জন্মসূত্রে অমানুষও নয়। আর মানুষ অন্যায় করে তখনই যখন তার ওই অসম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের আরও অভাব ঘটে। অজ্ঞতা, অক্ষমতা, অভাব অথবা লালসার তাড়না, এর যেকোনটিই হেতু হতে পারে। কিন্তু মূল হেতু হোল সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা। অন্যায়ের উপকরণ নিয়েই সমগ্র সমাজ গড়ে উঠেছে, না অন্যায় করার

প্রয়োজনে উপকরণগুলি সৃষ্টি হয়েছে সে-তর্ক আজ বৃথা। কিন্তু এই অন্যায় প্রতিরোধে কিংবা অন্য যেকোন প্রতিকারে সামান্যতম অন্যায়ও হবে সম্পূর্ণ অমানবীয় এবং ক্ষমার আযাগ্য অপরাধ। কারণ প্রথম অন্যায়কারীকে ক্ষমা করা যায় তার অজ্ঞতা বা অক্ষমতার যুক্তিতে। মেনে নেওয়া যায়, সামাজিক কিংবা সমসাময়িক প্রভাব তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, প্ররোচিত করেছে। ধৃষ্টতা হলে সেটাও ওই পরিবেশ ঘটিত প্রভাব। কিন্তু প্রতিরোধ বা প্রতিকারকারীর প্রতিটি কাজই সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত বলে এখানে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে সেটা হবে আরও বড় অন্যায়। অধিক মানুষের স্বার্থের প্রয়োজনে বললেও এ-অন্যায় ন্যায়সিদ্ধ হয় না।

সম্ভবত কার্ল-মার্ক্স এবং গান্ধী দর্শনের ভিতর সর্বাধিক প্রভেদ এখানেই। মার্ক্স যুক্তি দেখিয়েছেন, 'অন্যায়ের প্রতিকারে এমন কোন অন্যায় নেই যা অসঙ্গত বা করা চলে না।' আর গান্ধীজীর যুক্তি, 'অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায় দ্বারা হয় না।' মার্ক্স অন্যায়কারীকে দমন করতে দৈহিক বল প্রয়োগকেও যুক্তিগ্রাহ্য করেছেন অধিক মানুষের কল্যাণের যুক্তিতে। আর গান্ধীজী গুরুত্ব দিয়েছেন কেবল শুভবুদ্ধি ও মনুষ্যত্বের উপর। এই শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে অন্যায় প্রবৃত্তিকেই নিঃশেষ করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ যুক্তিকারীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যাই থাক, মার্ক্স-যুক্তিতে মানুষকে মানুষের দাসত্বমুক্ত হতে পশু প্রবৃত্তির দাসত্বকেও বরণীয় করা চলে। যার একমাত্র এবং অপরিহার্য পরিণতি থেকেই হয়ত কোটি কোটি সাধারণ মানুষও আজ রাষ্ট্রযন্ত্রকে অন্যায়মুক্ত করতে হিংস্রতার পথকে 'ন্যায্য' ভাবতে শিখেছেন আর বহুকোটি মানুষ মুষ্টিমেয় পার্টি নেতা, শাসক ও প্রশাসন যন্ত্রের স্থায়ী দাসত্বেও হয়ত আবদ্ধ হয়েছেন। অন্য দিকে গান্ধীজী এই ধরনের মানসিকতা শুধু 'অজ্ঞতা' বলেই ক্ষান্ত হননি, অমানবীয় সকল প্রবৃত্তির সঙ্গে অপরের অন্যায় প্রভাব পরিহার করতে পারলে তবেই যে মানুষ সত্যের সন্ধান ও দাসত্ব মুক্তির শক্তি পাবে সেটাই তাঁর সমগ্র জীবন চরিতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

এঁরা উভয়েই মহাপুরুষ। নিশ্চিতই মানব জাতির পরম সুহৃদ।

রাজনীতিতে দুজনেই সুপণ্ডিত, কিন্তু কেউই এঁদের পেশাদার রাজনীতিক হননি। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণই ছিল এঁদের ধর্ম ও একমাত্র সাধনা আর তাই বোধহয় শুধু একটি মাত্র দেশের ভৌগলিক সীমায় এঁদের ধ্যান-ধারণাকে আবদ্ধ রাখতেও পারেননি। এঁরা উভয়েই নমস্য। তবে নির্ভুল ও সহজ পথই মানুষের কাম্য। এই পথ চিনে নিতেও অবশ্যই সঠিক চেতনা চাই। অথচ হিংসার কার্যকারীতায় বিশ্বাসী একজন মনুষ্যত্বহীন অসম্পূর্ণ মানুষ তার অধিকার সম্বন্ধেই কী সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে পারে? ন্যায়গ্রাহ্য যুক্তিতে তা কখনই কিন্তু পারে না।

শেষের কথা

আমি খুব স্পষ্ট করে এবং দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে চেয়েছি, মানব-সমাজের সর্বত্র রাষ্ট্রকর্তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব দ্রুত প্রসার লাভ করেছে, সব কিছুই তাঁদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে কিন্তু এই সমাজে যারা বঞ্চিত, অবহেলিত, শোষিত ও নিপীড়িত তাদের মুক্ত করতে কোন রাষ্ট্রকর্তাই কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেন নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নৃপতি, দলপতি, রাজাধিরাজ, শাহানশাহ্ বিভিন্ন রাষ্ট্রে কর্তৃত্ব করেছেন, করছেন; অনেকে নিজেকে প্রায় 'সর্বশক্তিমান' বা 'ঈশ্বর-প্রেরিত দূত' বলেও জাহির করতে চেয়েছেন, যেমন একদা দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বরের সঙ্গে তুলনা করে প্রজাদের কৃতার্থ হতে হয়েছে, কিন্তু কেউই এঁদের এই সামাজিক দুর্বলতা বা হৃদয়হীনতা দূর করতে পারেন নি। বহুজনে বহুদফা কর্ম-যজ্ঞের পত্তন করেছেন, বহু জেল, জরিমানা, মৃত্যুদণ্ডের ফোয়ারা ছুটেছে, অন্যথায় প্রতিরোধ বা আইন শৃঙ্খলার নামে বহু মানুষের হাত, পা, নাক, কান কাটা হয়েছে, অমানবীয় চরম নৃশংসতাও কম হয়নি; কিন্তু তবু এর একটিও একচুল পিছু হঠেনি; বরং নিয়ত সমানে বেড়েছে। আর এও বলেছি, এই সামাজিক অবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রকর্তাদের স্বার্থ, সমর্থন, অক্ষমতা, অনীহা বা অবহেলার কোথায় কী ও কতটা সম্পর্ক, কিংবা এ-সম্পর্ক আদৌ আছে কি নেই, তা

নিয়ে তর্ক কিছু যদিও বা চলতে পারে কিন্তু এর একটিও যদি না থাকে তবে কোন অন্যায় বা অবিচারই স্থায়ী হতে পারে না। যদিও এই থাকা না-থাকার সবটাই প্রায় নির্ভর করে রাষ্ট্রের উপর যাঁরা কর্তৃত্ব করেন তাঁদেরই উপর। আর সব শেষে বলেছি, শুধুমাত্র প্রশাসন নির্ভরতায় অর্থাৎ, জনগণকে সঠিক মর্যাদায় সঙ্গী না করে যিনি বা যাঁরা যত চেষ্টাই করুন সমাজে জটিলতা কেবল বাড়তেই থাকবে, স্থায়ী প্রতিকারের পথ কখনই মুক্ত হবে না।

একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত; সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু একদা বলেছিলেন, 'কালোবাজারীদের নিকটবর্তী ল্যাম্পপোষ্টে ফাঁসি দেওয়া উচিৎ।' এটা ছিল স্বাধীনতা-প্রাক্‌কাল। অথচ স্বাধীনতার পর এই কালোবাজারীরাই সংখ্যায় ও শ্রীতে বহুগুণ বেড়েছে এবং দীর্ঘকাল এই পণ্ডিত নেহরুই ছিলেন অমিত শক্তির অধিকারী এক প্রশ্নাতীত সুযোগ্য রাষ্ট্রনেতা তথা রাষ্ট্রকর্তা। অন্যায় প্রতিকারে ক্ষমতাহীন এবং ওই ক্ষমতাধারী নেহরুর আন্তরিকতায় বিন্দুমাত্র প্রভেদ ছিল এ-ধারণা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ ইনি ত সেই নেহরু; সুইজারল্যাণ্ডে প্রিয়তমা পত্নী যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় করুণ আবেদন জানাচ্ছেন মাত্র একটিবারের জন্য তাঁকে শেষ দেখা দেখে যাবার জন্য, তখনও তিনি দেশ সেবার মূল্য গুণছেন স্বদেশের আলমোড়া জেলে বসে। অবশ্য পরে তিনি মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু তখন প্রায় শেষ অবস্থা উপস্থিত। আর পূর্বেও স্ত্রীর চিকিৎসা ও সান্ত্বনার যখন একান্ত প্রয়োজন তখন তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত আর্ত বিহারবাসীর সেবায়। ভয়াবহ সেই ভূমিকম্পে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়ে যে-অগুণতি মানুষ আরও অসহ্যকর মৃত্যুর বিভীষিকায় আচ্ছন্ন, পণ্ডিতজী তখন হয়ে উঠেছেন এক জীবন্ত সান্ত্বনা। আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিশ্রাম নেবার এমন কি নিজের ব্যথা অনুভব করার অবকাশও নেই, অসুস্থ স্ত্রীকে তিনি জানালেন, 'আমার অসংখ্য মা, ভাই, বোনেরা যে এখানে অনাহারে, অচিকিৎসায় উন্মুক্ত প্রান্তরে হাহাকারে মরছে, এদের ফেলে আমি যাই কি করে?'

সত্যিই ত দেশের কোটি কোটি অসহায় মানুষের আর্ত কান্নায় যাঁর আত্মসত্তা লীণ হয়ে গেছে একা স্ত্রীর কান্নায় সে-সত্তা আলাদা হবে কি করে? অথচ এই স্ত্রীই যে ওই বিশাল হৃদয়ের কতখানি জুড়ে ছিলেন তার সন্ধান কি তিনিই তখন জানতেন? এমন কীই বা বয়েস তখন? কিন্তু আর কেউ ত সেই শূন্যস্থানে বিন্দুমাত্রও ছায়া ফেলতে পারে নি। এই নেহরুজীকেই তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে সারা পৃথিবীর লোক চিনেছে, ভালবেসেছে। পিতা পণ্ডিত-মতিলাল নেহরু যখন পরিহাসছলে বলছেন, "আমার বার লক্ষ টাকা জেলখানায় পচছে;" তার বহু পূর্বেই কেবল শিক্ষার জন্য ব্যয় করা তাঁর 'বার লক্ষ টাকার জহর' দেশবাসীর ভিড়ে হারিয়ে গেছেন। সুতরাং আন্তরিকতার অভাব ঘটেছিল কিংবা পূর্ব ইচ্ছা বিস্মরণ হয়েছিলেন এ তো সত্য হতে পারে না। তবে কি এখানেও সেই প্রবাদ বাক্যটিই প্রতিবন্ধক হয়েছিল, যে-প্রবাদে আছে, 'রাজা শোনেন অন্যের কানে আর দেখেনও প্রায় অন্যের চোখে?' গণতন্ত্রে অবশ্য রাজা নেই। কিন্তু যে বা যাঁরা ওই তখ্‌তে বসেন তাঁরাই কী নিজে সবকিছু শুনতে বা দেখতে পান? এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর সাধারণ মানুষ জানে না। যদিও বহু জনকেই বলতে শুনেছি, 'এঁদেরও প্রধান অবলম্বন নিয়ত বেষ্টনকারী একদল বিশেষ সুযোগপ্রাপ্ত মানুষ, প্রশাসনের এক উচ্চ মহল এবং জনসভার হাততালি। কারণ এটা মিথ্যা হলে এর সব ইতিহাসই অন্যভাবে লিখতে হোত। এমন কী ক্ষমতাধারী নেহরুজীও তাঁর ক্ষমতাপুর্ব ওই অভিমতকে কার্যকর করার সহজ পথ খুঁজে পেতেন।' কথাগুলি একেবারে অসত্য বলে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। কারণ প্রকৃতপক্ষে জনগণ এখানে আশাহত হয়েছে তাই নয়, পূর্বের তুলনায় তারা আরও বেশী অন্যায়ের শিকার হয়েছে।

ভারতে শিল্প-বাণিজ্যে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা। এর মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই দ্রুত অগ্রগতি এবং অসৎ শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের কবল থেকে দেশবাসীকে মুক্ত রাখা। এই বিনিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন মহলে মতভেদ আছে। একদল অতি প্রগতিশীল আশাবাদীর ধারণা,

'সমাজতন্ত্র' নামক পুষ্টিকর মেওয়াটি কেবলমাত্র সরকারী আমলারাই দ্রুত পেড়ে আনতে পারেন; জনগণ এ-ব্যাপারে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বা নির্ভরযোগ্য অংশ নয়। তাদের বরং সংগত ভূমিকা হবে, ওই আমলাদের কাজকেই নিঃদ্বিধায় সমর্থন করা।' যদিও লগ্নীকৃত সব মূলধনটাই জনগণের। হয় তাদের কর থেকে সঞ্চিত, নয়ত তাদের অবশ্য পরিশোধ্য দেশী-বিদেশী ঋণ দ্বারা সংগৃহীত। অর্থাৎ এ-মূলধনের প্রকৃত মালিক তারাই। এখানে বোধ হয় ভিন্ন মতের সুযোগও নেই। কিন্তু যাঁরা বলছেন 'দেশব্যাপী মূল্যবৃদ্ধি, উৎপাদন মন্থরতা এবং সংখ্যাতীত মানুষের বেকার দশায় যে-ব্যাপক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য সরকারী বিনিয়োগ কতটা দায়ী সেটা প্রশ্ন যদি নাও হয় তবু এর ব্যবস্থাপনায় যে ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছে তার দায়িত্ব কি একেবারে অস্বীকার করা চলে? সম্ভবত নয়। কারণ কিছু অযোগ্যতা এবং কারো কারো দুষ্টবুদ্ধিজাত খেসারত মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা আংশিক পূর্ণ করা গেলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন সরল রাস্তা মেলেনি।' অবশ্য সমগ্র বিষয়টির পিছনে আর একটি যুক্তি রয়েছে; 'সরকারী বিনিয়োগ কেবল লাভের উদ্দেশ্যে নয়, বৃহত্তর গণস্বার্থই এর প্রধান লক্ষ্য।'

মনে হয় ভিন্ন প্রশ্ন জেগেছে এই নিয়েই। "শিক্ষা, চিকিৎসা, জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা প্রভৃতির সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগ কি একই পর্যায়ে পড়ে? অথবা 'গণ' অর্থে সমগ্র দেশবাসী, না কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট কর্মীকুল?" যেমন কারো বক্তব্য: "কলকাতার ট্রাম কোম্পানী বেসরকারী মালিকানায় যে প্রচুর মুনাফা করেছে সে-তথ্য ট্রেড-ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দসহ প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতাই দিয়েছেন। লাভের পরিমাণটাও অনেকে দেখিয়েছেন। যদিও তখন ভাড়া ছিল ১/৩ অংশ এবং যাত্রীদের সামনে যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল নিশ্চিত। কিন্তু সরকারী কর্তৃত্বে ভাড়া বাড়লো তিনগুণ, ভাড়া দিয়েও গন্তব্য স্থলে পৌঁছা হোল অনিশ্চিত এবং ওই মুনাফার পরিবর্তে লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ালো বছরে প্রায় ৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ এর সরল অর্থ দাঁড়ায়; পূর্বে শোষিত হয়েছেন কয়েক হাজার কর্মচারী আর পরে

বর্ধিত ভাড়া এবং যাতায়াতের অনিশ্চয়তায় শোষিত হচ্ছেন কয়েক লক্ষ যাত্রী। শুধু তাও নয়, লোকসানের ওই ৪ কোটি টাকা আদায় হচ্ছে সমগ্র দেশবাসীকে শোষণ করে। 'বৃহত্তর গণস্বার্থ' যুক্তিটার প্রকৃত অর্থ তবে কি এই ?"

এর পর আসে তাঁদের কথা, যাঁরা বলছেন, "বেসরকারী ক্ষেত্রে ওই ৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হলে প্রচলিত নায্য হিসেবেই মুনাফা হোত বছরে কম করেও ৬শ' কোটি টাকা, আর পরিবেশ অনুকুল থাকলে এই মুনাফার কড়ি কেউ ফেলে রাখতেন না, নতুন নতুন শিল্প-বাণিজ্যেই বিনিয়োগ করতেন। অর্থাৎ মূল বিনিয়োগটা চলত চক্রবৃদ্ধি হারে এবং এর ফলে এই সময়ের ভিতর অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হোত প্রায় ৭০-৮০ লক্ষ মানুষের।" অবশ্য এঁরা শুধু জাতীয়-চেতনাসম্পন্ন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের উদ্যোগের পরিস্থিতিটাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন এবং বলেওছেন, 'জাপান, জার্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশে সাধারণত যা ঘটে থাকে এ কেবল তারই প্রতিধ্বনি।'

এমন যুক্তি ও ব্যাখ্যা আরও অনেকের আছে। কিন্তু সব শেষেও এমন কিছু স্পষ্ট হয় নি যা থেকে প্রমাণ করা চলে, সার্বিক মানুষের স্বার্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ কিংবা সকলের স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে দেশের কল্যাণে সকলকে একাত্ম করার সঠিক পথ মিলেছে। প্রথমত যেসব উন্নত দেশের তুলনা করা হয়েছে সেখানেও সকল মানুষ শোষণমুক্ত নয়। বেকারভার এবং অন্যান্য উপসর্গও কম-বেশী ঠিকই আছে। দ্বিতীয়, সরকারী প্রকল্পের প্রতি জনগণ আরও কতটা নির্বিচার আনুগত্য দেখালে এবং উচ্চপদস্থ আমলারা অধঃস্তন কর্মীর প্রতি কত বেশী কর্তৃত্ব করার সুযোগ পেলে উৎপাদন গণ-আরব্ধ উৎকর্ষতা পেত ও লোকসান হোত না সে-তথ্য এখনও প্রকাশ পায় নি। বিশেষ শক্তির দাপটে অন্যত্র কী হয়েছে জন-গণের চোখের জলের সে-ইতিহাস গণতন্ত্রে না তোলাই ন্যায়সঙ্গত। বরং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত হোল, "যেখানেই হোক, কর্তৃত্বের নিদানে জাতীয়তাবোধ থাকে না, থাকে সহসাথী সুলভ নেতৃত্বের

বিধানে। অথচ প্রায়ই দেখা যায় ভীতিমিশ্রিত একটি 'ইয়েস স্যার' সম্পর্ক কেবল সমাদর পায় তাই নয়, এই বোধটা যে অপরিহার্য সেই পরিবেশ গড়তে সকল সমাজকর্তাই উদ্‌গ্রীব আর সম্ভবত এই কারণেই রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েও কোন সংস্থা ঠিক 'জাতীয়' হয়ে ওঠে না। এটা কোন ব্যক্তি বা ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ নয়, ব্যক্ত ঘটনার দ্বিধাহীন স্বীকৃতি মাত্র।" কোন রাজনৈতিক মতবাদে আবিষ্ট নয়, কিন্তু জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এমন কিছু কর্মীকেও আক্ষেপ করতে শুনেছি, "রাষ্ট্রায়ত্ত হলেই তাকে 'জাতীয়' ভাববার অবকাশ কোথায়? রাষ্ট্রকর্তারা হয়ত ভাবেন 'অধঃস্তন কর্মীকুলের সততা, কর্মকুশলতা এবং জাতীয়তাবোধ ঠিক নির্ভরযোগ্য নয়, এ-ক্ষেত্রে কর্মকর্তা আর উচ্চ মহলই কেবল এর অধিকারী' আর ওই সব কর্মকর্তারা এবং উচ্চমহল হয়ত ভাবেন 'রাষ্ট্রায়ত্তের অর্থটাই হোল কেবল তাঁদেরই উপর সমগ্র দায়িত্ব বর্তানো।' ফলে এঁরা পান মালিকের ভূমিকা আর সাধারণ কর্মীদের ভূমিকা হয়ে পড়ে শুধু শ্রম ও মজুরীতে নিবদ্ধ। অর্থাৎ সেই মালিক-শ্রমিক সম্বন্ধ। তবে মালিকের ভূমিকায় থাকলেও মালিকের দরদ কিন্তু এখানে জাগে না। জাগতে পারেই না। কারণ প্রকৃতই ত এঁরা মালিক নন। কাজেই জাগে শুধু কর্তৃত্ব করার অধিকার এবং এই মালিকস্বার্থহীন কর্তৃত্বই রাষ্ট্রমালিকের সঙ্গে নাগরিকদের যে সম্পর্কটা থাকে অপরিহার্য তাকে সহজেই 'অনাবশ্যক' করে তোলে। অর্থাৎ শুধু উচ্চপদের স্বাচ্ছন্দ্য বা সংখ্যাধিক্যে নয়, যে দৃষ্টিকোণ থেকে দখলদার কোন বিদেশী শাসনে শৃঙ্খলা রক্ষা ও কাজের উৎকর্ষতা বাড়াতে একদল বিশেষ মানুষকে তৎপর হতে হয় জাতীয়করণের পরও উপর মহলের কিছু অংশ সেই চেতনায় আবিষ্ট বলেই হয়ত একদল দুর্বলচিত্ত কর্মীর কাছে উৎপাদন থেকেও কিছু পাইয়ে দেবার আশ্বাস গুরুত্ব লাভ করেছে।"—এ সব মন্তব্যে শুধুই আবেগ আছে, যুক্তি নেই, এ বোধ হয় ঠিক নয়।

ট্রটস্কি তাঁর 'Revolution Betrayed' গ্রন্থে লিখেছেন 'Socialism in a backward country leads to corrupt

bureaucracy' অর্থাৎ অনগ্রসর দেশে সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্র। রাশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভের বহু ভাষণেও প্রায় একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। স্পষ্ট বক্তা বলে ক্রুশ্চেভের সুনাম ছিল।

এঁরা দুজনেই ছিলেন যথেষ্ট বিজ্ঞ এবং তার চেয়েও বেশী অভিজ্ঞ। বহু ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকে যে-সত্যকে এঁরা সঠিক সত্য বলে চিনেছেন, তাকে অবজ্ঞা করা মূঢ়তারই নামান্তর। তা ছাড়া ভারত-বাসীর কাছে এই বিষয়টি বোধ হয় গোড়াতেই স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল যে, পরাধীন জাতির কাছে নিয়ম-শৃঙ্খলার যে-সংজ্ঞা থাকে কোন স্বাধীন নাগরিকের কাছে তা কখনই মূল্যবান হতে পারে না। কারণ প্রথমটির সঙ্গে থাকে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস ও অধিকার কায়েম রাখার সম্পর্ক। আর দ্বিতীয়টির ন্যায়গ্রাহ্য মূল্য কেবল শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সহযোগিতায়। কাজেই এই দুয়ের প্রভেদটা এত বিরাট যে, একে এক করতে চাইলে গোটা দেশবাসীর চিত্তটাই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। পড়তে বাধ্য।

ইতিহাস থেকে দেখা যায়, সামন্ততন্ত্রের সূচনায় জনগণ দিত শুধু দখলী জমির খাজনা এবং পরে যোগ হতে থাকে বিভিন্ন কর। যথা: জলকর, পথকর, শিক্ষাকর, দেশরক্ষা কর ইত্যাদি। আয়কর এসেছে আরও পরে। আর প্রশাসনের সঙ্গে সম্বন্ধও ছিল শুধু এই সব কর ও খাজনার। উৎপাদন বা বণ্টনের উপর এঁদের কোন এক্তিয়ার ছিল না। এরপর এলো গণতন্ত্রের যুগ এবং শুরুতে এসময়ও ওই বিষয় দুটি প্রশাসন কর্তৃত্বের বাইরেই থাকলো। বড়জোর কিছু কিছু নীতিগত নির্দেশদানের অধিকার তাঁরা পেলেন। কিন্তু এই সময় শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুত অগ্রগতি শুরু হয়ে গেছে এবং মালিক পক্ষের প্রভূত সুখ-ঐশ্বর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মচারীর স্বাচ্ছন্দ্যটাও অনেক বেড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এই বাড়ার পরিমাণটা প্রশাসনযন্ত্রের উচ্চ মহলকে অবধি পিছনে ফেলছে এবং যার প্রতিক্রিয়া রোধ করতে আয়কর সহ বিভিন্ন করের মাত্রা চড়িয়ে রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা এখানে একটা ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ প্রশাসন কর্মীদের প্রাপ্যটাও সাধ্যমত বাড়াচ্ছেন। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজনের

দিক থেকে যদিও বা কিন্তু 'অন্যের তুলনায় সরকারী আমলারা যে একটু বেশীই পাবেন' এই ধারণা সমাজে বহু পূর্বেই এসে গেছে। আগের দিনগুলিতে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি বলে কার্যত এ ছিল এক অলিখিত রীতি। কিন্তু এই রীতিতে যখন ভাঙ্গন ধরেছে এবং তার গতিও বাড়ছে ঠিক প্রায় তখনই দেখা দিল কমিউনিস্ট শাসন। চিন্তার এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হোল প্রশাসন কর্তাদের সামনে। এখানে শুধু কর আর রাজস্ব নয়, ঐশ্বর্যের মূল উৎস উৎপাদন, বণ্টন পরিবহণ, নির্মাণ প্রভৃতি বা এককথায় সব কিছুরই পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব এলো প্রশাসন কর্তাদের কবজায়। অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে উন্নত দেশে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে সেটা এখনও স্পষ্ট হওয়ার অবকাশ ঘটেনি। কিন্তু অনুন্নত কোন কোন দেশের বেশ কিছু আমলা যে এই অধিকারের প্রতি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হয়েছেন এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থা থেকে একেবারে প্রকৃত প্রগতিশীল (?) অবস্থায় পৌঁছতে রাষ্ট্রকর্তাদের উপর চাপ দিচ্ছেন এ-সংবাদ অনেকেই দিয়েছেন। যদিও রাষ্ট্রের এ-পরিবর্তন না ঘটিয়েও কিন্তু যুদ্ধে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপান আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদেশ আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পেরেছে এবং ওই একই অবস্থার জার্মানীও প্রায় টেক্কা দিচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে সার্বিক মানুষের কর্তৃত্ব থাকলে গতিটাও আরও কতটা বাড়তো সেটা স্বতন্ত্র বিষয়, কিন্তু কেবল আমলা নির্ভরতা যে গণতন্ত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না এবং সমগ্র দেশবাসীর আত্মীক সত্তা ও কর্মশক্তির বিকাশ ঘটাতেও পারে না হয়ত এই বিশ্বাসই ওই রাষ্ট্রদুটি কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে নি। ১৯৬২ সালে ব্রহ্মদেশ তার সমগ্র বাগিচা ও বড় বড় শিল্প সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু নিরপেক্ষ প্রতিটি সংবাদেই প্রকাশ পেয়েছে, ঠিক এর পর থেকে তখাকার অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান আরও বেশী নিম্নগামী হয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, বেসরকারী উদ্যোগই শ্রেষ্ঠ। তবে একথাও দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা চলে, সার্বিক মানুষের মঙ্গলের পথও ওটা নয়। এ-মঙ্গল আসতে পারে শুধুমাত্র সার্বিক মানুষের কর্তৃত্ব থাকলে।

দেশবরেণ্য সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'সর্বাপেক্ষা জঘন্য অপরাধ, অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আপোস করা। আর মানুষের পক্ষে বড় পুণ্য হইতেছে, যতই মূল্য দিতে হোক না কেন অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা।' কিন্তু সকলের শক্তি সমান নয় এবং সামগ্রিক অন্যায় বা অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে অবশ্যই এক বিরাট সংখ্যক মানুষের শক্তি চাই। এ-শক্তি সংহত করা এবং তাকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত শক্ত। আর যদিও বা কেউ কিছুটা পারেন কিন্তু এক সময় ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ মাথা চাড়া দেবেই। এটা ইতিহাস। কাজেই এ-ক্ষেত্রে এমন একটি হাতিয়ার চাই যার কার্যকারিতা অস্বীকার করা শক্ত। কার্যত অসম্ভব। এই হাতিয়ারের পরিচয় দিতে যেয়ে আমি বলেছি, রাষ্ট্রের নামে কিছু আমলার কর্তৃত্ব কিংবা অন্য পরিচয়ে আর একদল মানুষের কর্তৃত্ব নয়, সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টনসহ দেশবাসীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আর্থিক ব্যবস্থাই থাকবে সকলের সমপুঁজি, সমস্বার্থ ও সমকর্তৃত্ব নির্ভর। রাষ্ট্র যে সম অংশে সকলের সেই সত্যকে কৌশলী তাত্ত্বিক ধোঁয়ার আছন্নতা থেকে বাস্তবে টেনে আমার যুক্তিগ্রাহ্য সহজ পন্থাটিকেই আমি বরণ করার কথা বলেছি। এর সহজ অর্থ মানুষের কর্মশক্তি, কর্ম এবং তার কর্মফলের উপর আর একটি শ্রেণী বা শক্তির কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ নস্যাৎ করা। কারণ মানুষের পার্থিব জীবনের সকল বিষয়, সকল অনুভূতি, সব উপলব্ধিও প্রধানত এরই সঙ্গে জড়িত আর এর ব্যক্ত চরিত্র থেকেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধ ও তার প্রকাশ প্রবৃত্তি। আরও দেখা যাচ্ছে, যেখানেই ভিন্ন স্বার্থসন্ধানী আর একটি শ্রেণী বিদ্যমান কিংবা যেখানেই অতিরিক্ত ক্ষমতা ও সুযোগপ্রাপ্ত উপরওয়ালা বা কর্তা, সেখানেই শোষণ, দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও কর্মবিমুখতা। এটা হতে বাধ্য। কারণ মূলত অর্থ সম্পদই যখন মানুষের সমগ্র পার্থিব জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে তখন সেই অর্থ-সম্পদের উপর শ্রেণী বিশেষের কিছুমাত্র অতিরিক্ত কর্তৃত্ব থাকলে সমাজে অন্যায় আর অবিচার চিরকালই স্থায়ী হয়ে থাকবে। এ-সত্য কারো অজানা নয়। বিশেষ করে যাঁরা অতিরিক্ত কর্তৃত্বের অধিকারী তাঁরা আরও বেশী করে জানেন

বলেই একে আড়ালে রাখতে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে উচ্চমানের তাত্ত্বিক সব কলাকৌশল, 'বুর্জোয়া' 'প্রগতি' এবং আরও কত তাত্ত্বিক যুক্তি আর মনমাতানো আইন-কানুন। সব জেনেও না জানার ভান যাঁরা করেন তাঁরা আশ্রয় নেন এখানে।

এই বুর্জোয়া শব্দটি আর এক ধাঁধাঁ। কারণ এ যদি অসম সমাজব্যবস্থা বা সম্পদ বৈষম্য থেকে গুরুত্ব পেয়ে থাকে তবে অন্তত কমিউনিষ্ট সমাজগুলিতে এতদিনে এর অস্তিত্বই থাকত না। বিশেষ করে অকমিউনিষ্ট দেশের ভাষ্যকাররা এর যা অর্থ করেন তাতে একটিমাত্র দলের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা হোত আরও বড় 'বুর্জোয়া' ব্যবস্থা। দেশের কোটি কোটি মানুষকে মুষ্টিমেয় মানুষের কর্তৃত্বে রাখার যেকোন ব্যবস্থাই ওই পর্যায়ে পড়ে। অন্যদিকে বুর্জোয়া হবে হাজারপতির কাছে লক্ষপতি এবং লক্ষপতির কাছে কোটিপতি। আর যদি নির্দিষ্ট একটি মান ঠিক করে তার অতিরিক্ত সম্পদ ভোগকারীকে অথবা এই সুযোগ সৃষ্টিকর ব্যবস্থাকে 'বুর্জোয়া' বলা হয় তবে প্রতিটি রাষ্ট্রের জাতীয় আয় এবং অন্যান্য সুযোগ সম অংশে সকলের ভিতর বণ্টন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটা কোথাও হয়েছে বলে জানা যায়নি। যদিও এক্ষেত্রেও একটি সার্বিক মান স্থির করা শক্ত। কারণ আমেরিকা বা অন্য উন্নত দেশের জাতীয় আয় ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে যে 'মান' নির্দিষ্ট হবে ভারত প্রভৃতি অনুন্নত দেশে তা হবে না। আর কোন ব্যবস্থা যদি সে-দেশের সার্বিক জীবনযাত্রার মান অন্যের তুলনায় উর্ধে তুলে দিতে পারে তবে তাকে আর কেউ 'বুর্জোয়া' বললেও ওই দেশবাসী স্বীকার করবে না। আদতে এইসব তাত্ত্বিক কচ্‌কচি বোধহয় সাধারণ মানুষের দৃষ্টি থেকে কায়েমী সুযোগগুলি রক্ষা করারই এক কৌশল।

কমরেড ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিনের প্রথম ভারত সফরের সময়কার খবরে দেখেছি, কলকাতার রাজভবনে ওঁদের চলার পথ এবং অবস্থিতির ঘরগুলিতে যে-লাল কার্পেট পাতা হয়েছিল তার মূল্যই ছিল নাকি পূর্বেকার যেকোন রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য মোট খরচের প্রায় সমান। আর এ-ব্যবস্থার মূলেও ছিল নাকি ওঁদেরই অভ্যস্ত পরিবেশ

রক্ষার প্রয়াস। অর্থাৎ স্বদেশে ওঁরা ওই পরিবেশেই অভ্যস্ত। এদেশে ওঁরা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত এবং কাম্য অতিথি। সাধ্যমত যত্নের ত্রুটি হলে জাতির লজ্জার সীমা থাকত না। আর আমরা যথেষ্ট করতে পেরেছি সে-দাবীও সঙ্গত নয়। কিন্তু অন্য দেশের কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতেন, 'বুর্জোয়া' ব্যবস্থা উচ্ছেদকারী এবং সাম্যবাদের পূজারী ওই দেশটির ক'টি মানুষ ওদের ওই অভ্যস্ত পরিবেশ গড়ার সামগ্রী চোখেও দেখেছেন?—আমারই নয়, অনেকের ধারণা, 'এ প্রশ্নের উত্তর তিনি পেতেন না।'

উত্তর পাওয়া যাবেনা এমনিই আরও অনেক প্রশ্নের। পূর্বেই বলেছি, এ এক ধাঁধাঁ। আর তথাকথিত সাম্যবাদীরা এ-ধাঁধাঁ প্রসারিত করেছেন তাঁদের কবরখানা অবধি। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবরখানা। সর্বমোট কটি শ্রেণী আছে সেখানে জানা নেই। কিন্তু রাশিয়ায় ক্রুশ্চেভের স্থান হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। স্ট্যালিন প্রথমে স্থান পেয়েছিলেন প্রথম শ্রেণীতে। কিন্তু বছর কয়েক বাদে তাঁকেও সরিয়ে দেওয়া হোল ওই দ্বিতীয় শ্রেণীতে। আবার নাকি তাঁকে প্রথম শ্রেণীতেই ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটা প্রগতিবাদ, সাম্যবাদ। অথচ এই বুর্জোয়া ভারতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে-নিমতলা শ্মশানে স্থান পেয়েছেন সেখানে হাজার হাজার অখ্যাত, অজ্ঞাত এমন কি অবজ্ঞাত ভিখারীকেও সৎকার করা হচ্ছে। যেখানে দেশের সর্বোচ্চ নেতা বা মনীষীদের শেষ শয্যা রচিত হচ্ছে সেখানেই সর্বস্তরের সকলে স্থান পাচ্ছে। অন্তত মৃত্যুর পর আর এখানে কোন শ্রেণীভেদ নেই। অবশ্য এ-সব ঘটনা বা ধাঁধাঁ নেহাতই মামুলী। বৃহৎ আর সব বিষয়ের পাশে দ্যুতিহীন স্ফুলিঙ্গমাত্র। তবে এ থেকে গভীরের ক্রিয়াগুলিও অবশ্যই অনুভব করা যায়।

আমি পূর্বেই বলেছি, ইতিহাসের শিক্ষা হোল অপরের উপর কর্তৃত্ব করার বাসনা যাঁর নেই তিনি নেতা হতে পারেন কিন্তু প্রচলিত সমাজে কর্তৃত্বে থাকতে পারেন না। আবার এই বাসনা যার ভিতর আশ্রয় পায় তাঁর গতি কেবল ন্যায়গ্রাহ্য যুক্তির গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকবে, সাফল্যের উপকরণ সন্ধানে গলিপথ ধরবে না এও প্রায়

অসম্ভব। যদিও এঁদেরই বাইরেটা থাকে সবচেয়ে বেশী ন্যায়-মার্জিত। কিন্তু আদতে অপরকে অনুগত বা আশ্রিত করাই এর ধর্ম। সমাজ অসহায় তাই এটা মেনে নিয়েছে বা নিতে বাধ্য হয়েছে। আর এ শুধু বর্তমান বা লিখিত ইতিহাস কালের ঘটনা নয়। মানুষের কল্পিত আদর্শ যুগের জন্যও তাঁরা এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। আমাদের শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন ভগবানের অবতার, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির অবতার না হলেও ধর্মপুত্র এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ধার্মিক। অথচ এঁরাও কোন স্বাধীন সত্তার আত্মনির্ভর মানুষকে সহ্য করতে পারেননি। অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সমগ্র দেশের স্বাধীন, শক্তিধর ও আত্মনির্ভর নৃপতিদের পরাজিত ও আজ্ঞাধীন করেছিলেন। এসব হয়ত উচ্চমার্গের বিষয়। কিন্তু সমগ্র জাতির নেতা হলে সম্ভবত তাঁর ভিতর এই 'অধীন' করার বাসনা জাগে না, জাগে ভালবাসায় অন্তরে স্থান পাওয়ার বাসনা। কোন বিরাট দেশের এক বিখ্যাত সম্রাট ব্যক্তিগত জীবনে কেবল ধর্মগ্রন্থ নকল করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। কিন্তু তাতে কি রাজনীতির চরিত্র পালটেছে? কিংবা জনগণ দেশের স্বার্থে একাত্ম হতে পেরেছে? সামন্ত বা রাজতন্ত্রে রাজা-বাদশাহরাই ছিলেন সর্বেসর্বা। কী তাঁদের নীতি, কোথায় কাকে নিয়োগ করা হবে এবং জনগণের প্রতি কী তাঁদের কর্তব্য, সে-সবই ছিল জনগণের এক্তিয়ার বহির্ভূত। কিন্তু গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রে এ 'এক্তিয়ার' নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয়েছে। জনগণ এই সংবাদটা জানে। আর কিছুর প্রয়োজনও তাদের থাকে না। কারণ নির্বাচিত একদল প্রতিনিধির উপর পরবর্তী ওই অধিকারগুলি ন্যস্ত না করে উপায় নেই। অতএব এখানে প্রশ্ন কিছু থাকলেও থাকে এই প্রতিনিধি এবং তাঁদের নির্বাচন নিয়ে। কিন্তু সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রকে যেভাবে আমরা চিনেছি সেখানে অধিকাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধিই কী সরাসরি গণনির্বাচিত প্রতিনিধি? প্রশ্নটা এসেছে, কারণ বেশ কিছু মানুষের কাছে নাকি এই সত্যটা ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে যে, 'এঁদের প্রকৃত নির্বাচক হলেন কোন-না-কোন একটি রাজনৈতিক দল আর জনগণও নির্বাচন করেন এই দলটিকেই।' এই যুক্তির সমর্থনে এঁরা বলেন, "জনগণ ভোট দেন, 'তাঁদের

প্রতিনিধি' বলে পরিচয়ও দেন, কিন্তু নির্বাচিত ব্যক্তিরা পরিচালিত হন কেবল দলেরই নির্দেশে। হতে বাধ্য, কারণ দলীয় শৃঙ্খলার একটি সম্বন্ধ এর সঙ্গে জড়িত। ন্যায়নিষ্ঠা বা ব্যক্তিত্ব যত মূল্যবানই হোক, দলের সংহতি তার চেয়েও বড়। আর সবচেয়ে বড় নিজের অস্তিত্বের সম্বন্ধ। এই অস্তিত্বের তাগিদ মানুষ মাত্ররই থাকে। বিশেষ করে যে-সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিত্বের আলাদা মূল্য নির্ণয়ের কোন মাপকাঠি বা সুযোগ নেই। কাজেই এ-ধারণাও হয়ত অমূলক হবেনা যে, এই প্রতিনিধিরা স্বভাবতই উদ্বুদ্ধ হবেন প্রথমে নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে, পরে দলের স্বার্থে এবং সর্বশেষ গণস্বার্থ সম্বন্ধে। আর এই সামাজিক পরিবেশে অধিকাংশ প্রশাসন কর্মীদের ক্ষেত্রেও হবে ঠিক তাই,—প্রথমে নিজের স্বার্থ, পরে তাঁর নিয়োগকর্তার (ব্যক্তি বা দল যিনিই কর্তা হোন) এবং তার পরই কেবল আসবে গণস্বার্থ। অর্থাৎ মাঝে নির্দেশকারী আর একটি পক্ষ জনগণের প্রত্যক্ষ অভিমতমুক্ত থাকলেই সেখানে গণস্বার্থের বিষয়টি এসে যাবে একেবারে তৃতীয় স্থানে। আর এই অবস্থায় এর মূল্যও হবে কিছুটা কৃপা মিশ্রিত। যা সভ্যতার সেই সূচনা থেকেই মানুষ দেখে আসছে।"

এই প্রসঙ্গের আরও একটি দিক আছে। আর তা নিয়ে হয়ত কিছু চিন্তা-ভাবনাও শুরু হয়েছে। এই দিকটা হোল, দেশের আংশিক অধিবাসী নিয়ে গঠিত এক বা একাধিক দলের মনোনীত কয়েক ব্যক্তিকে যদি সমগ্র দেশবাসী এই বিশ্বাস থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে বসাতে চান যে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে এ-কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন, তবে দলবহির্ভূত সার্বিক অধিবাসীর ভিতর থেকে সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করলে কেন তাঁরা তা পারবেন না? এক্ষেত্রে বরং ওই নির্দেশকারী তৃতীয় পক্ষের কর্তৃত্বটুকু ত অন্তত জনগণের অধিকারে থাকবে এবং তাঁদের স্বার্থটাও তৃতীয় স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হতে পারবে। এ ভিন্ন একই দলের কেউ প্রধান, কেউ মুখ্য, কেউ আধা বা সিকিমন্ত্রী, আবার কেউবা কেবলই সদস্য বা কর্মী থাকার যে মানসিক দ্বন্দ্ব অথবা দলের ভিতরই

অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এবং যার বিষাক্ত দাহ কেবল দলের কর্মশক্তিকে পঙ্গু করতে চায় না, গোটা সমাজকেই দূষিত আর অক্ষম চেতনায় আচ্ছন্ন করতে উদ্যত হয়, এক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাও আর থাকে না। তবে এ-প্রশ্ন এখনও সকলের মনে জাগেনি। জাগেনি তার কারণ বোধ হয় বিকল্প কোন সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়নি। ফলে দলাধীন যোগ্যতাটাই অপরিহার্য ভাবতে হচ্ছে।

কিছুকাল পূর্বে ভারতের একজন প্রবীণ রাজনীতিকের কণ্ঠে ঠিক এমনই একটি সুর ধ্বনিত হয়েছিল। ইনি চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী। জাতীয় সরকার সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে যেয়ে তিনি বেশ জোরালো সুরেই বলেছিলেন, 'কেবল রাজনৈতিক দলগুলি থেকেই নয়, বাইরে থেকেও প্রভাবশালী লোকদের নিয়ে এইরূপ সরকার গঠন করা উচিত।' ভারতের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'আমাদের দরকার দক্ষ একটি জাতীয় সরকার আর এর জন্য একটিমাত্র দল থেকে নয়, এমনকি সমস্ত রাজনৈতিক দল থেকেও হয়ত সব উপযুক্ত লোক পাওয়া নাও যেতে পারে, সুতরাং বাইরে থেকেও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের গ্রহণ করা উচিত।'

প্রায় শতবর্ষ যিনি পৃথিবীর বহু ঘটনার সাক্ষী এবং প্রায় ৬ দশক কংগ্রেস দলীয় রাজনীতির সর্বোচ্চ স্তরগুলিতে অবাধ বিচরণ করেছেন, প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছেন আর সর্বোপরি সত্য দর্শন ও সত্যভাজনই ছিল যাঁর জীবনের মূল ধর্ম, তাঁর অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধিজাত এই স্পষ্ট বক্তব্য রাষ্ট্র, রাজনীতি এবং জনগণের স্বার্থ সম্পর্কে অবশ্যই কিছু নতুন আলোকপাত করতে পেরেছে। এবং সেই আলোকে ইতিহাসকে নতুন করে সন্ধান করলে এ-ধারণাও যুক্তিযুক্ত হওয়া অসম্ভব নয় যে, সমাজের সর্বশ্রেণীর সকল মানুষের কল্যাণপ্রয়াসী সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিদের একজনকেও হয়ত এভাবে সংগ্রহ করা যাবে না। এর কারণ, প্রথমত দলীয় রাজনীতিতে যাঁরা আবদ্ধ তাঁরা নির্ধারিত একটি পরিধির বাইরে আর কিছুতেই বিশ্বাসী নন। আর যদিও বা এমন কেউ থাকেন, কিন্তু যতক্ষণ না তিনি তাঁর দলের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন ততক্ষণ তাঁর ভিতর ওই আকাঙ্খিত শক্তি-

স্থায়িত্ব পেতে পারে না। অর্থাৎ এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাটা এখানে প্রায় অবশ্যম্ভাবী বলা চলে যে একটি স্বাধীন দেশে সক্রিয় রাজনৈতিক দলের কোন কর্মকর্তার পক্ষে নিজেকে সর্বজন সমকক্ষ করা অন্তত শক্ত। প্রায় অসম্ভবই। এইসব রাজনীতিকরা যখন কোন জাতীয় সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেন তখন তাঁর সামনে থাকে নিজদলের তাত্ত্বিক কষ্টিপাথর। যখন দেশের দিকে তাকান তখন নিজেকেই দেখতে চান সর্বত্র ও সর্বাগ্রে। আর যখন কিছু প্রতিষ্ঠা করতে চান তখন নিজেকে এবং তাঁর মতবাদকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চান সকলের উপরে। এর ব্যতিক্রম যদিওবা থেকে থাকে কিন্তু তার সন্ধান এখনও মানুষ পায়নি।

অবশ্য জাতীয় সরকারের প্রকৃত যে-সংজ্ঞা সেটা পৃথিবীর কোথাও স্পষ্ট হয়নি, কাজেই কোন ভ্রান্তি যদি চেতনাকে আচ্ছন্ন করেই তা দোষের নয়। এ দিক থেকে স্বর্গত রাজা গোপালাচারীও হয়ত কেবল একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিতই দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি যদি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করে নিতেন তবে বোধ হয় আরও স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন বোধ করতেন যে, রাজনীতিমুক্ত কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সহ দেশের তাবৎ মানুষের ভিতর থেকেই কেবল সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন গণ প্রতিনিধির সমাবেশ ঘটানো যায় এবং শুধু এঁদের দ্বারাই একটি ন্যায়নিষ্ঠ ও মোহমুক্ত প্রকৃত জাতীয় সরকার গঠন করা সম্ভব। যেমন শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, 'অতীতের মানুষ যা করেছে চিরকাল তারই পুনরাবৃত্তি করে চলা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ হোল অভিনব সিদ্ধি।'

এই প্রসঙ্গের আরও একটি দিক আছে। যেমন কোন রাজা বা সম্রাট তাঁর রাজ্য অথবা সাম্রাজ্যকে অবশ্যই নিজস্ব ভেবে থাকেন এবং একে রক্ষা করতে তাঁর আত্মদানে উদ্বুদ্ধ হওয়াও বিচিত্র নয়। এর বহু প্রমাণ আছে ইতিহাসে। কিন্তু কোন দলীয় ব্যক্তির পক্ষে এই চিত্তবৃত্তি কি দানা বাঁধতে পারে? সম্ভবত নয়। এর কারণ এঁদের স্থায়ীত্বই যে সন্দেহাতীত নয়। এটা ভুলে যাওয়া অসম্ভব। ইতিহাসই ভুলতে দেয় না। যদিও ক্ষমতা, সম্মান, ও সুযোগের দিক থেকে

এ-ক্ষেত্রে প্রভেদ থাকে সামান্যই। বরং সমাজ-ব্যবস্থার মৌল পরিবর্তন ঘটাতে এঁদেরই সুযোগ বেশী। প্রয়োজনে অনেক বেশী মানুষের সক্রিয় সহযোগিতাও এঁরা পেতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই একই মানসিকতার প্রকাশও ত ঘটেনা! সম্ভবত অনিশ্চিত কর্তৃত্বের সঙ্গে অবিশ্বাসের যে একটা আত্মিক সম্বন্ধ থাকে সেটাই না জনগণ, না রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, কারো বা কিছুর সঙ্গেই একাত্ম হতে দেয় না। ক্ষমতার আগে ও পরে সর্বদাই এ-ব্যবধান থাকে। কিন্তু কোন দলের না হয়ে এঁরা কেবল জনগণের একাংশ হলে কর্তৃত্ব হারাবার আশংকায় ত নয়ই, কর্তৃত্ব হারিয়ে গেলেও তার তাপদাহ কারো ভিতর বিচ্ছেদের ধারণা জাগাত না। তবে এটা এখানে বড় নয়। বড় হোল রাষ্ট্রীয় সম্মতিতে জনগণের অংশ ও তাকে রক্ষার বিষয়। রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি মূলতঃ 'রাজসম্পত্তি', কিন্তু দলতন্ত্রে? মনে হয় এখানেও জনগণ আলাদা অস্তিত্ব। আর তাইত চোখের সামনে বিরাট ক্ষতি হতে দেখলেও কারো প্রতিরোধ বাসনা জাগে না। 'জনগণই সর্বেসর্বা' বলে গলা ফাটালেও সম্বিৎ ফেরে না। যেটা প্রকৃত জাতীয় সরকার হলে কখনই সম্ভব হোত না। এর একটি ছোট প্রমাণ আছে এই পশ্চিমবঙ্গের একটি আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে। গণস্বার্থে কত আইনই ত চালু আছে, কিন্তু কটি তার যথাযথ পালিত হয়? অথচ কেবল প্রতিবাদের এক্তিয়ার আছে বলেই 'ধূমপান নিরোধ' আইনটি কিন্তু পুরোপুরিই সার্থক হয়েছে। আর এর জন্য না প্রয়োজন ঘটেছে সরকারী খপরদারী, না দেখা দিয়েছে আইন ভঙ্গকারী ও প্রতিবাদকারীর ভিতর কোন অপ্রীতিকর ঘটনা।

কে ভাল আর কে তা নয় সেটা আর প্রশ্ন নয়। এবং প্রশ্ন নয় কে কত উদার চরিত্রের বা উন্নত কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন আর কতবেশী মানুষ তার ফলে উপকৃত হয়েছে সেটাও। এ-জাতীয় প্রশ্নে বড়জোর এই প্রশ্নটিকেই কিঞ্চিৎ হালকা বা মার্জিত করা যায় এবং যার যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর থেকে হয়ত বা প্রত্যেকের আলাদা মূল্যায়ন করে কারো কিছুটা গুরুত্ব বাড়ানো যায়। কিন্তু যেটা এখানে প্রধান জানবার বিষয় তা হোল, যতটা

এঁরা করেছেন তার পরেও করবার মত যে-বিপুল কাজ অবশিষ্ট থাকে তা সম্পূর্ণ করার সুযোগ এঁদের আছে কি না? কারণ জাতীয় সরকারের চিন্তা এসেছে ঠিক এই প্রশ্ন থেকেই। এবং বেশীরভাগ চিন্তাবিদ ও যুক্তিবাদী মানুষের হয়ত ধারণা, প্রকৃত জাতীয় সরকার বা দলহীন সমাজের সঙ্গে বর্তমান সরকারগুলির প্রভেদও ঠিক এইখানে। তত্ত্বে যেটা 'গণতন্ত্র' তথ্যে সেটা দলাধীন। কাজেই একটা সীমিত শক্তি কর্তৃক এটা পরিচালিত হয়, যার ফলে সমাজের অগ্রগতিও সীমিত হয় বা কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু দলহীন গণতন্ত্রে—সঠিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গেও এ একাত্ম,—সরকার ও দেশের সমগ্র মানুষের একাত্মতার অবশ্যম্ভাবীতায় একটি ন্যায়নিষ্ঠ উদ্যমশীল শক্তির উদয় হয়ে সকলের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অবধি তার গতিকে পৌঁছে দেবার সক্রিয়তাকেই অনিবার্য করে তুলবে। যেমন কোন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার মালিকের অধিকার ও প্রয়োজন অবজ্ঞা করে চলার সুযোগ পেলে এবং এই অবস্থাটা সংশ্লিষ্ট কর্মীরাও জেনে ফেললে ওই মালিক আর প্রতিষ্ঠানের যে-অবস্থা হয় বর্তমান সমাজ ও অধিবাসীর অবস্থাটাও হয়ত অনেকটা তাই। কিন্তু সার্বিক কর্তৃত্বে এ-সম্ভাবনা অসম্ভব। এই সমাজ কীভাবে গঠিত হবে এবং কীভাবে পরিচালিত হবে তার একটা রূপ-রেখা 'নতুন সমাজের নক্‌শা' অধ্যায়ে আমি দিয়েছি।

মানুষের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, পরস্পর দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের পত্তন হয়েছে প্রধানত সম্পদকেই কেন্দ্র করে। একদল মানুষ ছলে বা বলে বাকী মানুষকে বঞ্চনা করতে চেয়েছে এবং প্রায় বঞ্চনা করেই অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হয়েছে। আরও দেখা যাবে, এর ভিতর যতটাও 'ন্যায্য' বলে স্বীকৃতি পেয়েছে সমাজ-ব্যবস্থা সঠিক ন্যায়নিষ্ঠ হলে তার বেশীটাই হোত অন্যায্য। অবশ্য সম্পদই দ্বন্দ্ব সংঘাতের একমাত্র হেতু নয়। সামাজিক মর্যাদা, অধিকৃত বা ন্যস্ত ক্ষমতা, গুণগত অথবা পরিমাণগত যোগ্যতা এবং শ্রেণী আর সম্প্রদায়গত বিভেদ থেকেও এর উৎপত্তি হয়ে থাকে।

তবে এরও মূলে থাকে কিছুটা ওই সম্পদেরই প্রভাব। যদিও সমগ্র বিষয়টিই কিন্তু লজ্জাকর ও যুক্তিহীন। এবং সমাজে শ্রেণী কর্তৃত্বেরই অবশ্যম্ভাবী এক প্রতিচিত্র। রাষ্ট্র হচ্ছে সমগ্র অধিবাসীর। এরাই এর সঠিক মালিক। এতে কোন মতভেদ নেই। কাজেই কারো উপর কোন বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ বা প্রত্যাহারের অধিকারও মূলত তাদেরই।

এর জন্য অথবা দেশের যেকোন কাজের জন্যই তাঁরা একদল উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করে এই যাবতীয় অধিকার ও দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে কেবল এই একটিই শর্তে যে, তাঁরা ওই নির্দিষ্ট দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে বদ্ধপরিকর হবেন এবং জনগণের পূর্ণ আস্থা ও কর্তৃত্ব তাঁদের উপর থাকবে। এই আস্থা ও কর্তৃত্বই হোল মূল কথা। এটা না থাকলে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না, যার ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই গণশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজকে ন্যায়নিষ্ঠ করতে ও আরব্ধ লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে অক্ষম বা নিয়ত বাধার সম্মুখীন হন। অর্থাৎ মানুষের আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সমগ্র অবলম্বনগুলির উপর অপরের প্রতিকারমুক্ত কর্তৃত্ব থাকলে তার ফল শুভ হয় খুবই সীমিত ক্ষেত্রে আর সার্বিক সমাজ হলে এ হবে প্রায় অসম্ভব।

'মানুষই মানুষের প্রধান শত্রু' এই বক্তব্যে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই। আবার মানুষই যে মানুষের শ্রেষ্ঠতম সুহৃদ এতেও বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তবে এই দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীর আধিপত্যই সমাজে বেশী। বিপদও এখানেই। বিশেষ করে এঁরা যদি সার্বিক সমাজ তথা রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার পান তখন সমগ্র মানব জাতিরই ভীতির কারণ হতে পারে। অর্থাৎ দলবদ্ধও যদি হয় তবু হিংস্র পশুর শক্তি কতটুকু? কিংবা সতর্ক শক্তিধর মানুষের কাছে প্রকৃতির পরিচিত রুদ্রতাই বা কতখানি ভীতিকর হতে পারে? অথচ একজন মাত্রও ক্ষমতাধারী মানুষ কয়েক দিনে, এমন কি কয়েক ঘণ্টায় কোটি কোটি মানুষকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলতে পারেন। মুছে এঁরা বহুকে বহুবারই ফেলেছেন।

ইতিহাসই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার কর্তৃক কয়েক কোটি মানুষ নিধন হয়েছে, যার ভিতর একমাত্র রাশিয়ানদের সংখ্যাই নাকি প্রায় দু কোটি। হিমলার, ফ্রাংক ও আইখম্যান ঠাণ্ডা মাথায় মুছে দিয়েছে ৬০ লক্ষাধিক ইহুদিকে। এমনিই চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং, নাদির শাহ প্রভৃতি আরও কত আছে। এই সেদিনই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ বাংলা দেশের ৩০ লক্ষাধিক নিরীহ, নিরস্ত্র, অসহায় মানুষকে নিঃশেষে মুছে ফেললেন। আর একাজে যাঁরা তাঁকে রসদ দিয়ে সাহায্য করলেন তাঁদেরই কী আলাদা করা চলে? চলে না। কারণ ন্যায়ের দরবারে স্বভাব খুনী, পেশাদার খুনী এবং খুনের পরিকল্পনা বা সাহায্যকারী একই পর্য্যায়ে পড়ে। যদিও এই শ্রেণীর ক্ষমতাগর্বী মানুষের কাছে এ-তত্ত্ব অবান্তর। কিন্তু বাকী মানুষের কাছে?

পৃথিবীর প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ আজও বাকী ২০ ভাগ মানুষের দাসত্ব করে চলেছে। এদেরই ভোগের পাত্র পূর্ণ করতে এই বিপুল শক্তি নিয়োজিত হচ্ছে। আজও একজন সমর্থ মানুষ আর একজন সমর্থ মানুষকে তাঁর পায়ে জুতো পরিয়ে দেবার কাজে নিয়োগ করতে পারছেন। দুটি অন্নের জন্য বাড়ীর ঝি, চাকর, রাঁধুনীর সমগ্র শক্তিই ব্যয় হচ্ছে। অথচ স্বাধীন বা সম্মানজনক কোন বৃত্তি পেলে এরা শুধু আর পাঁচজনের মত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত তাই নয়, শক্তির এমন অপচয়ও ঘটত না। অবশ্য যাঁরা এদের সেবায় অভ্যস্ত তাঁদের পক্ষে এই সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়া শক্ত। শক্ত এ-প্রশ্নও যেখানে একজনের দেহরক্ষার জন্য আর একজন এবং বহু ক্ষেত্রে একদল মানুষ নিযুক্ত হচ্ছেন। এই সকল ব্যক্তির ভিতর কিছু মানুষ যে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-গুরুত্ব যে সামাজিক ন্যায়ধর্মের বিচারে বাড়েনি, বেড়েছে তারই অভাব ও কিছু অক্ষমতা থেকে, দেহরক্ষার তাগিদটাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

সংগ্রাম মানুষ অনেক করেছে। রক্তপাতও কম করেনি। কিন্তু ইতিহাস খুললেই দেখা যাবে, এর প্রায় বেশীটাই করেছে তারা কেবল মানুষেরই বিরুদ্ধে। মানব শক্তির অর্ধেকেরও বেশী ব্যয় হয়েছে হয়.

মানুষকে পদানত করতে অথবা এই অধীনতা মুক্ত হতে। পরস্পর এ-সংগ্রাম কিন্তু আজও চলেছে। কিন্তু কেন? প্রাক্-সভ্যতাকালে অপরিণত মানব চেতনায় সত্য অজ্ঞাত থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু সভ্যতায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, মনীষায় যাঁদের এত অগ্রগতি, এত গর্ব, তাঁদের কাছে ত এ-সত্য অজ্ঞাত থাকার কথা নয় যে, মানব শক্তির এই বিপুল অপচয়ে সমগ্র মানব জাতির অগ্রগতিটাই মন্থর করে দিচ্ছে! তবে কী এঁরাও অর্থাৎ, আজকের এই সভ্যতা-গর্বী মানুষও এর অপরিহার্যতা স্বীকার করেন? না করলে কিন্তু এটা চলত না। অনেক পূর্বেই বন্ধ হোত। অন্তত তার পথটা স্পষ্ট হোত। সুতরাং এ-ধারণার যথেষ্ট হেতু আছে যে, ফসলটা অজ্ঞতার দান নয়, বরং অত্যন্ত কুশলী চিন্তার।

সভ্যতার আদি থেকেই শক্তিধর ও সুযোগসন্ধানী ব্যক্তিরা এসে জড়ো হয়েছেন এক একটি বিশেষ স্থানে। এঁদের কুশলী-প্রভাব ও প্রয়োজনে দেশের অধিকাংশ সম্পদ এসে জড়ো হয়েছে এখানে। ধীরে ধীরে এর রূপ পালটে হয়েছে শহর এবং পল্লীবাসীর রক্ত-লেহনে কিংবা প্ররোচনাবিদ্ধ তাদের আত্মনিগ্রহে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এই সব শহর ও শহরবাসীর। এটা আদিকাণ্ড। এর পর সভ্যতার অনেক বিকাশ ঘটেছে এবং তুলনায় শহর ও শহরের শ্রী বেড়েছে। স্বভাবতই এতে পল্লীশ্রীতেও টান পড়েছে। পড়তে বাধ্য। পল্লীর শ্রী কিছুটা না নিঙড়ে শহরের শ্রী বাড়ানো শক্ত। রুচি পরিবর্তনে পল্লীবাসীর বাইরের ঠাটে অবশ্যই কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু শহরের ক্রমবর্ধমান ভোগের পাত্রে আরও বেশী রস ঢালার দায়ও তাদের বেড়েছে। কোন একটি বিশেষ কাল, বিশেষ শহর, বিশেষ দেশ এবং বিশেষ মতবাদ বা তন্ত্রের উপর দোষারোপ করা বৃথা। কারণ যে বা যিনিই হোন, কর্তৃত্বটা সেখানে মুখ্য বিষয় হলে দেশের কর্তা ব্যক্তিদের শহর ও শহরবাসীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। কর্তৃত্ব না হয়ে ওটা নেতৃত্ব হলে পল্লী-শহরে ভেদ থাকত না; সমগ্র দেশের ও সর্ব প্রান্তের সম মূল্যায়ন অপরিহার্য হয়ে উঠতো। কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতিতে এ-আবেদন মূল্যহীন। আর হয়ত এই কারণেই

স্বাধীন দেশে কোন রাজনৈতিক দলই সঠিক অর্থে জাতীয় দল হতে পারে না। শ্রেণী বিশেষের বা এক অংশের দল হয় মাত্র। গান্ধীজীর দল ভাঙ্গতে বলার মূলে ছিল বোধ হয় এই সত্যই। একটি ছোট দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা যায়। বৃহত্তর গণস্বার্থের প্রকৃত সংজ্ঞায় সেটা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। যেমন সারা পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে রাস্তাঘাটের তীব্র অভাব। বর্ষার জল-কাদায় বেশীর ভাগ পল্লীবাসী হাবুডুবু খান। যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্তরায় বলে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। সর্বোপরি পল্লীর উদ্বৃত্ত উৎপন্ন পণ্য সময়মত শহরে আসতে না পারায় পল্লী, শহর এবং সমগ্র দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এসবের গোড়াকার কথাই নাকি অর্থাভাব। অথচ ঠিক এই অভাব অবস্থাতেই কলকাতার বুকে মাত্র ১৫ কিলো মিটার পাতাল রেলের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা। অনুরূপ এক কর্মযজ্ঞে বম্বে শহরের জন্যও বরাদ্দ হয়েছে ৪০০ কোটি টাকা। যদিও সারা ভারতের পল্লীচিত্র তুলে ধরে অনেককেই বলতে শুনেছি, 'এ বিলাসত প্রাচুর্যের। সব প্রয়োজন শেষের অতিরিক্ত।' তবে সঙ্গে সঙ্গেই এও এঁরা বলেছেন, "কিন্তু সেকথা শুনছে কে? ধনী ব্যক্তি তার প্রতিবেশী ও পথচারীকে তাক লাগাতে চান রাস্তায় ঘড়া ঘড়া আতর ঢেলে। বিবস্ত্র, অভুক্ত, আশ্রয়হীন মানুষ এই দৃশ্যে বড় জোর ভগবানের উদ্দেশ্যেই কেবল বলতে পারে 'এই তোমার বিচার প্রভু?' কিন্তু কী এসে যায় তাতে ওই সব ব্যক্তির?"

এইসব মন্তব্যে যুক্তি, না আবেগ বেশী সে-প্রসঙ্গ থাক। কিন্তু এও ত অস্বীকার করা সহজ নয় যে, ওই ২৫০ কোটি টাকায় হয়ত এ রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার এক বিরাট পরিবর্তন ঘটান যেত এবং যার ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক বনিয়াদটাও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হোত। আর সমগ্র পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় হলে স্বভাবতই সেখানে সমৃদ্ধির বহু পথ খুলে যেত, নতুন নতুন রুজির সুযোগ বাড়ত এবং ধীরে ধীরে কলকাতার উপর অতিরিক্ত চাপ হ্রাস পেয়ে এক সময় এর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ আর পরিবহন ব্যবস্থাকে সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলত, যা পাতাল রেলের পক্ষে

আদৌ কখনও সম্ভব নয়। বরং এই রেলের আকর্ষণেই এর আরও যে-আকর্ষণ বাড়বে তাতে চাপটা কিছু বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই থাকবে বেশী। কিন্তু তা ত সম্ভব নয়। সম্ভব নয় যেহেতু বর্তমান সমাজের ধর্ম হোল, দেশের প্রয়োজন থেকে আড়ম্বরকে বড় করে ধরা। এটা এ-সমাজে কর্তৃত্বের রক্ষাকবচ। আর এর মূলাধারই শহর ও শহরবাসী। সুতরাং শহরবাসীর চাহিদা বা রুচিকে স্বীকার করে তবেই যে পল্লীর বিষয় বিবেচ্য হবে এটা বোধ হয় সকলেই মেনে নিয়েছেন।

যেমন ভারতে আজ বিদ্যুৎশক্তির প্রচণ্ড অভাব। আর পশ্চিমবঙ্গে চলেছে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা। ফলে কৃষি ও শিল্প মার খাচ্ছে, দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে এবং নতুন কর্মক্ষেত্রই নয়, যা আছে সেখানেও এ-সুযোগ হ্রাস পাচ্ছে। এর ভিতর এক বর্ণও মিথ্যা নেই। সবটাই সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ-স্বীকৃত সত্য। অথচ এই ভারতেই শহরগুলির দিকে তাকান—তাকান এই কলকাতারই হোটেল, রেস্তোঁরা, প্রেক্ষাগৃহ, বিলাসবিপণি এবং বিভিন্ন পূজা, পরব, বিবাহ প্রভৃতি উৎসব মণ্ডপগুলির দিকে, দেখবেন বিদ্যুতের কি প্রাচুর্য সেখানে। অভাব ত নেই-ই; অপচয়ের লজ্জায় লজ্জা পাবার অবস্থাটাও যেন এখানে নেই। অপরিচিত কারো মনেই হবে না, কোটি কোটি বেকার মানুষের দেশে এই বিদ্যুতের অভাবেই বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে আছে এবং প্রয়োজন আর অন্যান্য আয়োজন সত্ত্বেও নতুন শিল্পের পত্তন হতে পারছে না। মনে হবে না খাদ্যাভাব ক্লিষ্ট মানুষের চোখের সামনে জমির সবুজ ধান শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে সেচের পাম্প চালাবার বিদ্যুতের অভাবে। আছে, নজির আরও আছে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, যেহেতু জনমত গঠিত হয় এবং গঠিত হওয়ার উপকরণ আর গঠনকারীরাও থাকেন শহরবাসীর মতামতকে কেন্দ্র করে, কাজেই শহরবাসীর চাহিদাটাই যে চূড়ান্ত, এ-বোধ কর্মকর্তাদের কেউ বিস্মরণ হতে পারেন না। আর তাঁদের স্থানও ত শহরেই।

অবশ্য বিভিন্ন বারোয়ারী পূজাকে কেন্দ্র করে যে-বিদ্যুতের হুল্লোড়

এখানে চলে তার বেশীর ভাগের উদ্যোক্তাই তরুণ সমাজ। তারুণ্যের একটি সহজাত ধর্ম ; অপচয়ের হিসেবকে অবজ্ঞা করা। এ-প্রবণতা কিছুটা দমিত থাকে যদি অভিভাবক ও কর্তা ব্যক্তিরা যথেষ্ট সংযমী হন। কিন্তু শহরের হোটেল, রেস্তোঁরা, বিলাসবিপণি, প্রেক্ষাগৃহ বা ধনী ব্যক্তিদের সামাজিক অনুষ্ঠানে বয়স্ক ব্যক্তিরা যে অপচয়ের অসংযম প্রায়ই প্রকাশ করেন তার প্রভাব কোন তরুণকে সংযম শিক্ষার আখড়া খুলতে উদ্বুদ্ধ করবে এ একান্তই অবাস্তব কল্পনা। বিশেষ করে যাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রয়েছে আতঙ্কগ্রস্ত অনিশ্চয়তার অবশ্যম্ভাবী অন্ধকার, তাঁদের কাছে ক্ষীণ এক টুকরো আলো বা ক্ষণস্থায়ী একটি নিশ্চয়তাই কী ফেলনা? হয়ত ওঁদের অনেকেই তা মনে করেন না। বরং ওঁরা চান আরও উজ্জ্বল দীপ্তি। সামনে গাঢ় অন্ধকার বলেই অল্প দ্যুতিতে মন ভরে না ; আরও আরও উজ্জ্বল দ্যুতিতে সেই অন্ধকার দূরে সরিয়ে রাখতে চান। হোক ক্ষণস্থায়ী, তবু বঞ্চিত, আশাহত, অনিশ্চিত জীবনে এটুকুর মূল্যই কি কম ? কিন্তু ওঁরা যদি সুনিশ্চিত হতে পারতেন যে এই বিদ্যুৎ সঞ্চিত হলে সমগ্র দেশের সঙ্গে ওঁদেরও ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলবে, ধনী ব্যক্তির বিলাসে সব নিঃশেষ হয়ে যাবে না, তবে ওঁরা কিছুতেই এ-অপচয় করতেন না। সহ্যও করতেন না, সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতেন। এমন কী স্বার্থসন্ধানী যে সব 'দাদারা' পিছনে থেকে মদত দিচ্ছেন তাঁদেরও চিনে ফেলতেন, সতর্ক হতেন।

শহরের প্রতি মানুষের মোহ আছে। এর আকর্ষণ এবং বিশেষ কিছু অধিকারও আছে। আর এই অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে সভ্যতার গোড়া থেকেই। সমগ্র দেশের সঠিক চিত্র ভুলিয়ে রাখার এ একটি পীঠস্থান। কিন্তু একথাও ঠিক এবং তা আজ খুব স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে যে, মানব সমাজে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে কেবল এই শহরের কল্যাণেই। শহর কেন্দ্রীক সভ্যতার স্থলে পল্লী কেন্দ্রীক সভ্যতার উপর গুরুত্ব দিলে এই সব সমস্যার অন্তত ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের অস্তিত্বই থাকতো না এবং এমন বহু সমস্যার মুখোমুখি মানুষ হয়েছে যা আদপেই দেখা দিত না। শহরের অতিরিক্ত গুরুত্ব

মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব করার সুযোগ ও প্রেরণা যুগিয়েছে তাই নয়, এক শ্রেণীর মানুষকে অমানুষ হতেও সাহায্য করেছে।

'শহর ও শহরবাসীর সমস্যাই মানব প্রগতির গতি বাড়িয়েছে' একথা যাঁরা বলেন তাঁদের যুক্তি হয়ত কিছু আছে। বক্তাদের কাছে এর মূল্যও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু বাকী প্রায় ৮০ ভাগ পল্লীবাসীর আত্মবিকাশের পথ যদি অবাধ ও শহরবাসীর সমতুল্য হোত; অন্তত শহরবাসীর প্রয়োজনে তাদের শক্তি যোগান না দিতে হোত তবে স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের প্রতিভা আরও বহুগুণ বিকসিত হোত, অগ্রগতি অনেক বেশী দ্রুত হোত। কাজেই যুক্তির উপর নির্ভর করলে এই ধারণাই কারো জাগতে পারে না যে, 'শহরের শ্রীবৃদ্ধিই মানব প্রতিভার উৎস।'

অবশ্য বর্তমান যুগে অতি বৃহৎ শিল্প কিংবা বৃহৎ কোন বন্দরকে কেন্দ্র করে মানুষের শক্তি ও সম্পদ কিছুটা কেন্দ্রীভূত হবেই এবং অনিবার্য কারণেই ছোটখাটো শহরও গড়ে উঠবে। একটি নির্দিষ্ট সীমা অবধি এ-প্রয়োজন অস্বীকার করা যাবে না এবং তা আজ সঙ্গতও নয়। কিন্তু একটি সঠিক ন্যায়নিষ্ঠ বা সমাজতান্ত্রিক সমাজে এই সব শহরের গুরুত্ব ও আকর্ষণ পল্লীর গুরুত্ব আর আকর্ষণকে কিছুতেই পিছনে ফেলতে পারে না। পল্লীকে শোষণ করে এর স্ফীত হওয়ার প্রয়োজন এবং সুযোগও থাকে না।

ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 'মানবজাতির অগ্রগতি যদি চাও, তবে পূর্ব-কল্পিত ধারণা সব জোর করে ঠেলে চল। চিন্তাশক্তি এভাবে আঘাত পেয়েই জেগে ওঠে, সৃষ্টিক্ষম হয়।'

অত্যন্ত সারগর্ভ উপদেশ। আজকের মানুষের পক্ষে জরুরীও বটে। কারণ ভাবী সত্যকে চিনতে গেলে চিন্তাশক্তি কেবল নির্দিষ্ট বা প্রচলিত সামাজিক গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা যেমন যুক্তিযুক্ত নয়, সব কিছুই নতুন দিনের আলোয় নতুন করে পরখ করা দরকার, তেমনি বিচার করা দরকার, যাঁরা স্বেচ্ছায় সকল মানুষের সকল ভাল করার দায় গ্রহণ করেন সেই রাষ্ট্রকর্তারা সভ্যতার আদি থেকে হাজার হাজার বছর চেষ্টা করেও কেন মাত্র ১।৫ অংশের

বেশী মানুষকে আত্মনির্ভর করতে পারেন নি? 'পেরেছেন' এই দাবী কেউ করলেও এবং তার সমর্থনে ওই ১।৫ অংশ মানুষের চিৎকার আর দেশের সকল জয়ঢাকগুলি একই তালে বেজে চললেও বাকী প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেনি।

শ্রম এবং শ্রমফলের সঠিক মূল্যায়ন শক্তি হোল সামাজিক ন্যায়-অন্যায় পরিমাপের একটি অপরিহার্য অবলম্বন। সমাজ এই শক্তির অধিকারী হলে ব্যক্তির সঠিক মূল্যায়নও সহজ ও নির্ভুল হয়। কিন্তু শ্রেণীশাসিত বা শ্রেণীপ্রভাবিত সমাজে, এ-শক্তি দেখা দেওয়া অসম্ভব। কারণ এখানে প্রতিটি পণ্য এবং শ্রমমূল্যই ধার্য হয়ে থাকে এক দল বিশেষ মানুষের স্বার্থজড়িত নির্দেশে অথবা তাঁদের প্রতিদান প্রতিশ্রুত প্রভাবে। উৎপাদন ব্যয়ের উপর কাম্য লভ্যাংশ যোগ করে কিংবা চাহিদা ও যোগান নির্ভর বাজার দরকে ভিত্তি করে ধার্য হয় পণ্যমূল্য এবং এই মূল্য থেকে কাঁচা মাল, অন্যান্য খরচ আর লাভের অংশ বাদ দিয়ে স্থির হয় শ্রমমূল্য বা মজুরী। সামাজিক প্রয়োজন এক্ষেত্রে আদপেই গ্রাহ্য নয়। মুনাফাটাই প্রধান এবং এর যুক্তিযুক্ততাও কেবল ওই বিশেষ শ্রেণীরই এক্তিয়ারভুক্ত। শ্রমিক, ক্রেতা এবং কাঁচা মাল সরবরাহ-কারী কেউ এখানে পক্ষ নয়। যেমন এক মণ পাট উৎপন্ন করতে কৃষকের খরচ পড়েছে ৫০ টাকা আর ক্রেতা তার মূল্য দিলেন ৬০ কি ৭০ টাকা। অন্যদিকে ওই পাট একটি শিল্প সংস্থার সাহায্যে রূপান্তর ঘটে বিক্রয় মূল্য হয়েছে ৫০০ টাকা আর এই রূপান্তরে ওই শিল্প সংস্থার সর্ব মোট খরচ হয়েছে ২০০ টাকা। যার ভিতর শ্রমিকের ভাগে পড়েছে হয়ত ৩০ কি ৪০ টাকা। অর্থাৎ পাট উৎপাদন থেকে তার ৫০০ টাকা মূল্যে রূপান্তর অবধি কার ভূমিকা কতটা, কার প্রাপ্য কত এবং ধার্য শ্রম ও পণ্য মূল্য ন্যায্য কিনা সেসব প্রশ্ন থেকেও এক্ষেত্রে মুখ্য হয়েছে একজন শিল্প মালিকের ভূমিকা; যে-মালিক সামাজিক নিয়মেই কৃষক, শ্রমিক আর ব্যবহারকারীর প্রয়োজন থেকে নিজের মুনাফাকেই

অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। পণ্য বা শ্রমমূল্যের সঠিক পরিমাপ যে একটি জটিল বিষয় তাতে সন্দেহ নেই। আর শ্রমিক, কৃষক এবং সাধারণ ক্রেতার কাছে বিষয়টি আরও বেশী জটিল বলে প্রকৃতই সমাজের উপর এর প্রভাব কতখানি, কিংবা তাঁদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কতটা তার পরিমাপ করা শক্ত। এখানেই চাই চিন্তাশক্তির নব জাগরণ। কারণ অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারাই পণ্য বা শ্রমের ন্যায্য মূল্য নির্ণয় সম্ভব নয়; যতক্ষণ না দেশের সকল মানুষের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে সে-ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। কৃষক, শ্রমিক বা মালিক এককভাবে ত নয়ই, শুধু এঁরাই সমবেত ভাবেও তা পারেন না। এসব ক্ষেত্রে .যে বা যাঁরা যে-সিদ্ধান্তই করুন অন্যের তাতে কিছু না কিছু ক্ষতি হবেই। এই বিষয়টি নিয়ে কার্ল মার্ক্স এক অতি বিরাট গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। পণ্যমূল্য ও মজুরীর ন্যায্য পরিমাণ সংক্রান্ত বহু তত্ত্ব সেখানে আছে। কিন্তু এই মূল্য ও মজুরীর সঙ্গে বাকী জনগণের স্বার্থের সমন্বয় ঘটাতে যে-সামাজিক বিধি-বিধানের ইঙ্গিত সেখানে দেওয়া হয়েছে এবং বিশ্বের কোন কোন অংশে যেভাবে তার প্রয়োগ হয়েছে তাকে যুক্তিযুক্ত বলে বোধহয় তথাকারই ১।৫ অংশের বেশী মানুষ মেনে নিতে পারেননি। বস্তুত শ্রমিক, কৃষক আর সাধারণ মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য নিয়ে সর্বত্রই চলেছে এক বিরাট তামাসা। তবে কোথাও শুধু তামাসাই, আবার কোথাও বা প্রায় দাসত্বের কাছাকাছি। তত্ত্ব বা আশ্বাসের আস্ফালনে আদত ঘটনা ঢাকা পড়লেও বাকী মানুষ কিন্তু পায় কেবলই শ্রেণী বিশেষের উচ্ছিষ্ট অথবা করুণার দান।

ঐ ত, ঐ যে ৭০ বছরের হাঁপানিগ্রস্ত কৃষকটি কড়া রোদে এক হাঁটু জলকাদায় দাঁড়িয়ে ধান চারা পুঁতছেন, উনি নিশ্চিতই জানেন, বয়সের ভার বা ব্যাধি ওকে নিবৃত্ত করলে অনাহার হবে অনিবার্য। হয়ত গোটা পরিবারই সোম বৎসর ক্ষুধার তাড়নায় জ্বলবে। কাজেই কাজ ওঁকে আমৃত্যুই করতে হবে—তার পূর্বে বিশ্রাম নেই, অবসর নেই। নানা দিকের নানা দাবী আর প্রতি-কূলতায় সঞ্চয় কিছু হয়নি। আর সমাজ ওঁর সুদীর্ঘকালের

উদয়াস্ত কঠিন শ্রমের অন্য কোন মূল্যও স্বীকার করেনি। কাজেই ওঁর অক্ষমতার দায়িত্ব নেবে কে?

অবশ্য কোন কোন সমাজে ইদানিং ঠিক এই শ্রেণীর নয়, তবে সম্পূর্ণ অক্ষম বৃদ্ধদের জন্য কিঞ্চিৎ সাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছে। উদারতাই বলতে হবে। যদিও এ-করুণা প্রাচুর্যের। এঁদের কৃতকর্ম তথা সমাজসেবার প্রতিদানের কোন ছাপ তাতে নেই। সুতরাং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে এই করুণা গ্রহণ করা সহজ নয়। অথচ এরই পাশে ঐ যে ভদ্রলোক ৫৮ কি ৬০ বছর বয়সে সরকারী কাজ থেকে অবসর নিলেন এই একই সমাজ থেকে উনি কী পাচ্ছেন? উনি পাচ্ছেন এককালীন কিছু নগদ অর্থ, যার পরিমাণ ওই কৃষকটির কাছে স্বপ্নেরও অতীত, আর পাচ্ছেন আমৃত্যু অবসর বৃত্তি এবং নিজের মৃত্যুর পর স্ত্রীর আমৃত্যু বৃত্তির নিশ্চিত স্বীকৃতি। কর্মজীবনে উনি কতটা দিয়েছেন এবং কতটা নিয়েছেন কিংবা ওঁর পারিবারিক চিকিৎসা, পুত্র-কন্যার শিক্ষা ইত্যাদিতে সমাজ কতটা ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছে সে-সংবাদ ওই কৃষকটির জানবার কথা নয়। যদিও তার একটি অংশ ওঁকেও দিতে হয়েছে এবং সেটা ওঁর অবশ্য পালনীয় কর্তব্যও। এ-কর্তব্য সমাজের সকলের। সরকারী কর্মচারীদের সব প্রাপ্য সমগ্র দেশবাসীকে অবশ্যই দিতে হবে। সমাজের আর কারো জন্য এই দায়িত্ব স্বীকারের বাধ্যবাধকতা রাষ্ট্রের নেই।

কিন্তু একটি খট্‌কা, একটি জিজ্ঞাসা কী এখানে দেখা দিতে পারে না? এই যে অবসর জীবনে নিজের ও পরে স্ত্রীর আমৃত্যু বৃত্তি এবং কর্মজীবনের বহুবিধ সুযোগ আর অধিকার, এ যদি কারো রাষ্ট্রের সেবার জন্যই এতটা গুরুত্ব পেয়ে থাকে, যেটা এক্ষেত্র একমাত্র যুক্তি, —তবে যে-কৃষক তাঁর উদয়াস্ত কঠিন শ্রমদানে উৎপন্ন খাদ্য দিয়ে সমগ্র দেশবাসীকেই বাঁচিয়ে রাখছেন অর্থাৎ, রাষ্ট্র সচল রাখার প্রধান যন্ত্র যে-মানুষ তাকেই সচল রাখছেন, তাঁর গুরুত্ব কেন আরও বেশী হবে না? আর ঠিক এতটা না হলেও ওই সরকারী কর্মীটির সম-পরিমাণ, কিংবা আরও কিছু বেশী গুরুত্ব আরও অনেকেরই আছে! কিন্তু কই তাঁদের জন্য ত এমন কোন ব্যবস্থা নেই? কেন?

প্রশ্নটি সংক্ষিপ্ত। তবে এর উত্তর কেউ দেন না। দিতে পারেন না। কারণ এই একটি 'কেন'র উত্তর দিতে গেলে আরও বহু 'কেন' এসে সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেবে কিংবা অনেক 'কেন'ই আসবে প্রায় রুদ্র মূর্তিতে।

যেমন যে-কোন যুক্তিবাদী ব্যক্তিই বলবেন, 'মানুষকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। দেশের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক কাজও এইটি। দেশ এবং জাতিকে কোন দিক থেকেই উন্নত স্তরে পৌঁছিতে গেলে তার প্রধান অবলম্বন হবে যোগ্য ব্যক্তি। যোগ্যতা না থাকলে কারো পক্ষেই কোন কাজে সম্পূর্ণ সফল হওয়া সম্ভব নয়। আর এই যোগ্য ব্যক্তি যাঁরা গড়বেন তাদের যোগ্যতা থাকতে হবে প্রশ্নাতীত। কিন্তু এ-সম্ভাবনার সুযোগই কী সর্বত্র আছে?

অবশ্য ঠিক এই প্রশ্নটিই ওই 'কেন'র পর্যায়ে পড়ে না। ওটা আসে শিক্ষাগত সমযোগ্যতায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে এর জন্য মোট শ্রমদান, শ্রমমূল্য এবং অন্যান্য সুযোগগুলির প্রভেদ থেকে। সামাজিক মর্যাদা নিয়েও একটি 'কেন' এখানে আছে। আর সব শেষে আছে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে একটি জোরালো 'কেন' যার গোড়াকার কথা হোল, একই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য একদল শিক্ষকের সব দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র এবং যার ভিতর থাকবে চাকরীর নিরাপত্তা, অবসরকালে নিজের ও পরে স্ত্রীর আমৃত্যু বৃত্তির স্বীকৃতি আর অন্য সকলের সম্বল হবে কেবল কর্তৃপক্ষের মর্জি। সুতরাং শিক্ষা ও পেশার সমতা সত্বেও যেখানে এতটা বৈষম্য সেখানে শিক্ষার মান কিংবা তার নৈতিক মূল্যই বা বজায় থাকবে কেন? এ গেল এক দিক। কিন্তু এ-প্রসঙ্গের আরও একটি দিক বা ওই 'কেন' আছে। কারণ যুক্তির বিচারে ত বটেই, এঁদের নিয়োগকর্তা আর রাষ্ট্রকর্তারাও বলে থাকেন, 'প্রকৃত শিক্ষাদান যেমন প্রচুর অধ্যবসায় ও শ্রমসাধ্য, তেমনি প্রয়োজনও এখানে ঐকান্তিক নিষ্ঠা'। এর অর্থ, বক্তব্য এবং তার অন্তর্নিহিত ফল লাভে আন্তরিকতা আছে স্বীকার করলে ধরে নিতে হবে, এই শ্রম আর নিষ্ঠাই এঁরা শিক্ষকদের কাছে চান। এটা

অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। অন্তত ওই চাওয়ার বিষয়টি। কিন্তু চাওয়ার নৈতিক অধিকার? কারণ শিক্ষকরাও সামাজিক মানুষ এবং ব্যক্তি বা পরিবারগত চাহিদা তাঁদের সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকবে এই কামনাই স্বাভাবিক। আর এ-কামনা তাঁদের বল্গাহীন হয়ে যোগ্যতার গণ্ডী ছাড়িয়েও যায় না। অথচ অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং বৃত্তির নৈতিক গুরুত্ব বাদ দিলেও শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতার বিচারে এখানে যে-মূল্য পাওয়া যায় অন্য বহু ক্ষেত্রেই তার মূল্য থাকে তিন, চার কি পাঁচ গুণ বেশী। এটা যুক্তিগ্রাহ্য এবং রাষ্ট্রগ্রাহ্য হোল কেন? অবশ্য এর একটা জুতসই উত্তর খাড়া করা হয়েছে এবং কিছু বিশেষ শ্রেণীর অর্থনীতিবিদের কাছে ত বটেই, দেশের যাঁরা কর্ণধার তাঁদের কাছেও ওই উত্তরটা নাকি জোরালো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে আছে, 'ওই সব ক্ষেত্রে মুনাফা হয় বেশী, কাজেই তার কর্মীমূল্যও কিছু বেশী।' এ-যুক্তি অন্যের কানে বেখাপ্পা নাও ঠেকতে পারে, তবে মানুষ গড়ার কারিগরদের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত। কারণ উপযুক্ত মানুষ তৈরী বেশী মুনাফাকর কিনা সেই প্রশ্নটিই এই যুক্তি দ্বারা নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কী করে ওখানে বেশী মুনাফা হয়?

অত্যন্ত সরল এ-হিসেব। যেমন, ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্স প্রভৃতি বেশী মুনাফা করে চড়া সুদে লগ্নি করে এবং আমানতকারী বা বীমাকারীদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে কম দিয়ে। আর শিল্প-বাণিজ্য সংস্থায় বেশী মুনাফা হয় প্রধানত পণ্যমূল্যকে তার ন্যায্য স্তর থেকে উর্ধে তুলে দিয়ে। এই শেষের ক্ষেত্রে অবশ্য কর ফাঁকি, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ওজন বা মূল্যের ভেল্‌কী এবং আরও কিছু অতি কৌশলজাত মুনাফা কোন কোন সংস্থায় যুক্ত হয়। কিন্তু এ-সব কুশলী মুনাফা বাদ দিলেও বাকী থাকে যে-বর্ধিত মূল্য এবং চড়া সুদ, সেটা আদতে দেয় কারা?

সাধারণ বিচারে এটা অবশ্য দেয় সমগ্র দেশবাসীই। কিন্তু এই বিচার কার্যটা সঠিকভাবে হলে দেখা যাবে, এটা দেয় প্রকৃতপক্ষে তারাই যারা এই সব প্রতিষ্ঠানের না মালিক, না কর্মচারী। অর্থাৎ

মূল্য বা মুনাফা কিছুতেই যাদের কিছুমাত্র অংশ নেই, আছে কেবল অতিরিক্ত মূল্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা।

বিষয়টি আর একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। যেমন ব্যাঙ্ক, ইন্স্যুরেন্স থেকে চড়া সুদে টাকা ঋণ করেন প্রধানত শিল্পপতি ব্যবসায়ী শ্রেণী। আর এই টাকায় এঁরা যেসব পণ্য উৎপাদন বা বণ্টন করেন স্বভাবতই তার মূল্যও হয় চড়া। হতে বাধ্য। সুদ কম হলে মূল্যও অবশ্যই কিছু কম হোত এবং বাকী দেশবাসী তা কম মূল্যেই পেতেন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, অধিক মুনাফার আসল রহস্য রয়েছে যারা এর কণামাত্র ফেরৎ পায় না সেই প্রায় ৮০ ভাগ মানুষকে নিংড়ে রস বের করার মধ্যে। বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় যারা পিছিয়ে পড়বে তাদের এটা মেনে নিতে হবে। কারণ সমাজটাই যে এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধিমানদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পরিচালিত হচ্ছে।

আর অপূর্ব এই বুদ্ধির মহিমা। এই বুদ্ধির কৌশলে পবিত্র বিচারালয়ের বুকে বসেই একদল কর্মচারী দিনের পর দিন দরাজ হাতে ঘুষ নিয়েও দিব্যি এর পবিত্রতা রক্ষা করতে পারছেন, আবার কারো একটি বেফাঁস কথাতেই এই পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই সব ঘটনা যে একটি বিশেষ সমাজ বা সময়েই নিবদ্ধ তাও নয়। সর্বকালে সকল সমাজেই এটা ছিল এবং আছে। হয়ত কোথাও কিছুটা গাঢ় বা উগ্র, আবার কোথাও বা কিছুটা ফিকে বা নম্র। কিন্তু তুলির টানে তারতম্য কিছু থাকেও যদি, সাদৃশ্য একটা সর্বত্রই আছে। যেখানে 'আদৌ নেই' বলা হয় সেখানকার সতর্ক দৃষ্টিচ্যুত খবরেও দেখা গেছে, স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরই তাঁর পুত্রকে নৌ-বিভাগের উচ্চ পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে, ক্রুশ্চেভের বিদায় পর্ব শেষ হতেই তাঁর জামাতাকেও প্রাভদার উচ্চপদ ছাড়তে হয়েছে। একে ওই বিশেষ বুদ্ধির খেলা নাও যদি বলা হয় তবু এ-ধারণা অন্যের অযৌক্তিক হয়ে ওঠে না যে, হয় ক্ষমতা বা বিশেষ বুদ্ধির জোরে অযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চস্থানে বসানো হয়েছিল, অথবা ওই ক্ষমতা বা বিশেষ বুদ্ধির জোরেই যোগ্য ব্যক্তিকে সরানো হয়েছে।

আসলে এই সব ঘটনাকে জনসমক্ষে যুক্তিসিদ্ধ করা এবং

অসত্যকে 'সত্য' বলে বিশ্বাস করার শক্তি এসেছে এক ধরনের বিশেষ বুদ্ধি থেকে। এটা প্রগতি না ব্যাধি, সে-প্রসঙ্গ আজ অবান্তর। তবে গোটা মানব জাতিই যে সংক্রামিত এবং আমরা প্রায় সকলে সংক্রামিত হয়েই জন্মেছি এতে সন্দেহ নেই। সুস্থ সমাজ আমরা দেখিনি, কাজেই তার সঠিক মূর্তিও আমাদের অজ্ঞাত। আর ঠিক এই কারণেই সারল্য থেকে ধূর্তামি, সত্য থেকে অসত্য, ন্যায় থেকে অন্যায় এত প্রগলভ ও বরিত হতে পারছে। কেউ বরণ করছে সমাজধর্মের সহজ অবলম্বন হিসেবে, আবার কেউ করছে অসহায় বা বিভ্রান্ত হয়ে। কিন্তু এরই ভিতর কারো কারো হয়ত এ-প্রশ্নও জেগেছে, মানুষ চিরকালই কী এই অবস্থাটা মেনে চলবে।

ঠিক এই প্রশ্নটিই বার বার আমি তুলতে চেয়েছি এবং বারে বারেই বলতে চেয়েছি ; সমাজে কার যোগ্যতা ও গুরুত্ব কতটা, কার অবদান ও প্রাপ্য কতটুকু আর কোনটা ন্যায় ও অন্যায় তা নিয়ে তর্ক কিছু যদিও বা চলতে পারে কিন্তু এর মীমাংসার অধিকার সমাজের কোন একদল বিশেষ মানুষের উপর শর্তহীন অর্পণের যুক্তি কিছুতেই স্বীকার করা চলে না। চলে না, কিন্তু তাই চলছে। আর মানব সমাজের মূল ব্যাধিটাও ঠিক এখানে। উপসর্গগুলি নানা কার্য কারণকে আশ্রয় করে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। মুক্তি চেতনাকে আছন্ন করতে সক্রিয় হচ্ছে। কেবল ধূর্তবুদ্ধি বা চালাকী, এই চিরাচরিত দাওয়াই প্রয়োগে অপর কেউ যে এই ব্যাধিকে নিরাময় করবেন এ-ধারণা অবাস্তব। রাজনীতির ব্যক্ত কোন তত্ত্বেও এর ওষুধ নেই। আর গণসমর্থন, গণসহযোগিতা এবং জনগণকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে তাদের উপর যুক্তিযুক্ত দায়িত্ব অর্পণের পথ না ধরে কোন রাজনীতিক, তিনি যত বড় শক্তিধরই হন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের যত উচ্চ আসনেই অধিষ্ঠিত থাকুন, এমন কি জনচিত্তে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণও যদি থাকে, যে ওই রাজনীতিক তাঁর সমগ্র দেশবাসীকে অন্যায়, অবিচার ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করবেন, মুক্ত রাখবেন এবং সকলকেই সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত করবেন আর সে-শক্তিও তাঁর আছে অর্থাৎ, রাজনীতির নিজস্ব চরিত্রই

তাঁর দেশপ্রেম ও মানবীয় চেতনার কাছে পরাভূত হয়ে পড়েছে কিন্তু তবুও দেখা যাবে সমাজের এমন কোন মৌল পরিবর্তন ঘটাবার সুযোগ তাঁর ঘটেনি যা থেকে সকল অধিবাসী ওই যুক্তিগ্রাহ্য সুযোগ ও মর্যাদার অধিকারী হতে পেরেছেন। এ-চেষ্টা কারো আন্তরিক নিষ্ঠায় সফল পরিণতির দিকে নিশ্চিত পদক্ষেপ করলে তাঁর নিজেরই পতন হবে অবশ্যম্ভাবী। আর এই পতনে সর্বাধিক তৎপর হবেন তাঁরই কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সহকর্মী কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী আর একজন রাজনীতিক। এঁরা শক্তি ও সমর্থন পাবেন স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী ও কায়েমী স্বার্থভোগী অন্য সকলের সঙ্গে একদল প্রভাবশালী প্রশাসন কর্মীর। এটা ইতিহাস এবং এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম এখনও প্রকাশ পায়নি। যদিও এই সত্যকে অভ্যস্ত চেতনার উপর দাঁড় করানো শক্ত। বাধা এবং সঙ্কোচও কিছু আছে। তার চেয়ে বরং ঘটনার অনিবার্য উপলক্ষ্যের উপরই অবিশ্বাসের রং চড়িয়ে আত্মখণ্ডনের পথ খোঁজা অনেক সহজ। আখেরের অন্তরায় ভীতি কিংবা নেতিবাচক নির্লিপ্ততা এই দুয়েরই প্রভাব এ-ক্ষেত্রে আছে। আর পরিচিত সামাজিক পরিবেশে সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু সত্য বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা করে না এবং এ-তোয়াক্কা না করতে দেওয়াই সঙ্গত। তাতে মঙ্গলই হয় বেশী। আর এই সত্য উদ্ঘাটন করলে স্পষ্টই দেখা যাবে, যে-পরিবেশ ও তার সম্ভাব্য পরিণতির সামনে সামন্ত যুগের শাসকরা তাঁদের পারিষদ আর আমলাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যুক্তিকেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং সাধারণ মানুষকে ওঁদেরই আশ্বাস দেওয়া দয়ার উপর ছেড়ে দিয়েছেন, আজও সমাজে সেই অবস্থাই বিরাজ করছে। কোথাও কোন দিনই বোধ হয় এর পরিবর্তন হয়নি। তাহলে গণ-নিবাচিত কোন মন্ত্রীর এই স্বীকারোক্তির প্রয়োজন ঘটতো না যে, 'আমরাও চাকরীই করছি এবং করছিও হয়ত আমলাদেরই অধীনে।' শুনতে হোত না নির্বাচিত কোন শাসক দলের এই অনুযোগ যে, 'নিজেদের দলীয় দ্বন্দ্বে দেশের অগ্রগতি আর সংহতি যদিও বা কিছু ব্যাহত হচ্ছে কিন্তু বহু আমলাই এর পিছনে মদত দিচ্ছেন।' আর হয়ত এ

দৃশ্যও দৃষ্ট হোত না, যেখানে শাসন ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেও কোন নির্বাচিত কর্তা ব্যক্তি অসহায় ভঙ্গীতে বলছেন 'সরকারী কর্মচারীরা নির্দেশ মানছেন না, ওঁরা সহযোগিতা করছেন না, এমন কী বহু জরুরী কাজেও ওঁরা বাধার সৃষ্টি করছেন' ইত্যাদি। এটা সামন্ত যুগ হলে না হয় বলা যেত, শাসক তাঁর একক শক্তির দুর্বলতার ফলে অবস্থাটা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের শাসক তথা মন্ত্রীরা ত একক নন। বিরাট একটি দল এঁদের পিছনে আছেন এবং যেহেতু গণ-নির্বাচিত শাসকদল, কাজেই ধরে নিতে হবে, বেশীর ভাগ গণও ওঁদের পিছনে রয়েছেন। অথচ তবুও এ-অসহায়তা কেন?

এর যুক্তিসিদ্ধ সঠিক উত্তর দিতে হলে তাকে বলতেই হবে, আসলে এঁরা একটি দল প্রতিনিধি যতটা, গণপ্রতিনিধি ততটা নন। বস্তুতঃ এঁরা বেশীটাই দলের প্রতিনিধিত্ব করেন আর চলেনও প্রধানতঃ দলের স্বার্থে, কাজেই নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠার সাহস বা শক্তি বিশেষ কারো থাকে না। নিজের অস্তিত্ব এর সঙ্গে জড়িত এবং এটা মারাত্মক ব্যাধির মত প্রায় কাউকেই রেহাই দিতে চায় না। শঙ্কা বা সন্দেহ নিয়ত চেতনার উপর প্রভাব খাটাতে থাকে এবং শেষ অবধি সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসন নির্ভরতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ শক্তিশালী একটি দল সক্রিয়ভাবে পিছনে থাকলেও ওই দলীয় কর্তার প্রশাসন যন্ত্রেরই কিছুটা ইচ্ছাধীন হয়ে পড়েন। যার কিছুটা ছাপ পড়েছে হয়ত মন্ত্রীদের ওই উক্তিতে। তত্ত্বটা সাধারণ-মানুষ সবটা জানে না বলেই একটা কাল্পনিক প্রভেদ খুঁজতে থাকে এবং তার সাক্ষাৎ না পেয়ে হায় আপসোস করে। কিন্তু যে-প্রশাসন যন্ত্রের উপর সকল বিধিবিধান তথা সমাজের চলার শক্তি নির্ভরশীল তার এক প্রভাবশালী অংশের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও সেখানে এ-ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে, তাঁদের প্রাধান্য বা স্বার্থের প্রতিকূল কিছু করার শক্তি পরিচিত সমাজে কোন শাসকের নেই। সমগ্র দেশবাসীর প্রতিনিধিদের এঁরা চেনেন না, কিন্তু দলীয় প্রতিনিধিদের দুর্বলতা ঠিক কোথায় তা এঁরা ভাল করেই জানেন। সুতরাং

অতি রূঢ় সত্য হোল, এককই হোন বা দলীয় হোন, যতক্ষণ কেউ আংশিক মানুষের প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হচ্ছেন, ন্যায়গ্রাহ্য যুক্তি দ্বারা সমগ্র দেশবাসীর প্রতিনিধি বলে সাব্যস্ত হতে না পারছেন এবং এই অবস্থাটা প্রসাশন যন্ত্রে প্রতিফলিত হয়ে এর গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করছে, ততক্ষণ সরকারী আমলাদের দ্বারা কোন রাষ্ট্রকর্তাই তাঁর এবং দেশবাসীর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ সফল করতে পারবেন না। এটাও রাজনীতিরই একটি বিশেষ অবস্থার পরিণতি। সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থ বা সমর্থন কিছুর তোয়াক্কাই এ করে না। রাজনীতির এই বিশেষ অবস্থাটি গড়ে ওঠে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থকে কেন্দ্র করে। কেবল নিজের কিংবা কোন একটি দলের শক্তি পিছনে থাকলেই এই অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। সার্বিক মানুষের সমবেত শক্তি সক্রিয় সহযোগিতা করলে তবেই এ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

অনেকে বলে থাকেন, "রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতান্ত্রিক প্রসাশনই অচল হয়ে পড়ে। দল না থাকলে মন্ত্রীসভায় স্থিতি আসে না, সুসংহত ও সুসংবদ্ধ প্রসাশন গড়ে ওঠে না এবং সরকারী নীতিতে সামঞ্জস্য বা পারম্পর্যও থাকে না। সংসদে কিংবা বিধান সভায় কোথাও দল না থাকলে সদস্যরা স্ব স্ব প্রধান হবেন, যাঁর যেমন অভিরুচি তিনি তেমনই প্রস্তাব আনবেন এবং মন্তব্য করবেন, একটা প্রস্তাবের সঙ্গে আর একটির মিল থাকবে না, যেচে কেউ আপোসের কথাও বলবেন না, ফলে আইন সভায় একটা হৈচৈ বেধে যাবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। বহুব মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারে একমাত্র দল। দলীয় মতকে প্রাধান্য দিয়ে সদস্যরা সাংগঠনিক সংহতি বজায় রাখেন এবং গণতন্ত্রও সুস্থির হয়।"

এ সম্বন্ধে পূর্বেই আমি বলেছি, গণতন্ত্রকে যে ভাবে আমরা চিনেছি তাতে এর পবিত্রতা শুধু নয়, প্রাণরক্ষায়ও দলই অপরিহার্য অবলম্বন। গণস্বার্থ থেকে ব্যক্তি বা শ্রেণী স্বার্থের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে শ্রেণী কর্তৃত্বের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকেই এখানে 'গণতন্ত্র' সংজ্ঞায় ব্যক্ত করা হয়েছে। গণতন্ত্রে কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের

নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয় না। তাদের অভিমতেরও তোয়াক্কা করতে হয় না। পরবর্তী নির্বাচন অবধি যোগসূত্র না থাকলেও চলে। আনুগত্য চাই কেবল দলের প্রতি। দলই সর্বেসর্বা। কাজেই অপরিহার্য।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর 'সমাজবাদ থেকে সর্বোদয়' পুস্তকে বলেছেন "দলতন্ত্রের মধ্যেই ক্ষমতালাভের জন্য কলুষিত এবং ক্ষয়িষ্ণু প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। অর্থ, সাংগঠনিক শক্তি এবং প্রচারের সাহায্যে দলগুলি জনসাধারণের উপর নিজেদের চাপিয়ে দিতে সমর্থ হয়। 'জনতার রাজ' কার্যত দলের শাসনে পরিণত হয় এবং দলীয় শাসন দলের মতলববাজ ছোট্ট একটি গোষ্ঠির হাতে গিয়ে পড়ে। শুধু মাত্র ভোটই গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত হয়। আর দলীয় ব্যক্তিই নির্বাচন প্রার্থী, কাজেই পছন্দ-অপছন্দের সীমাবদ্ধ সুযোগটুকুও মূল্যহীন হয়ে পড়ে।"

কেউ যদি যুক্তিকেই গ্রাহ্য না করে তার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু দলীয় গণতন্ত্রের সর্বাধিক সফল নজির তুলে ধরেও এই যুক্তিকে সরাসরি অবজ্ঞা করার সামর্থ কোন যুক্তিবাদীর নেই। আর ওই যে 'বহুর মধ্যে ঐক্য গড়ার কৃতিত্ব' কীর্তন কিন্তু দল এবং দলীয় গণতন্ত্র যেখানে সুস্থির হয়েছে বলে ধরা হয় সেখানকার অধিক সংখ্যক মানুষই কী অপরের কর্তৃত্বমুক্ত থেকে আত্মনির্ভরতায় সুস্থির হতে পেরেছেন? কই সে-অনুসন্ধিৎসা ত দূর হয়নি। অথচ গণতন্ত্র সঠিক হলে এই সুস্থিরতাই হোত তার অনিবার্য পরিণতি। কাজেই একটি বিশেষ ব্যবস্থার সুস্থিরতা সকলের কাছে সমান মূল্যবান নাও হতে পারে।

যেমন অন্য দলের কেউ হলে না হয় বলা যেত, তাঁর নিজের অথবা দলের গুরুত্বের প্রয়োজনেই কথাগুলি বলছেন, প্রকৃত ঘটনা হয়ত বা অন্য। কিন্তু একই দলের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য মন্ত্রীদের কেউ কেউ যখন বলেন, (কেন্দ্র বা রাজ্য সর্বত্রই কিন্তু মন্ত্রীসভার দায়িত্ব যৌথ) 'কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণে রাজ্যের অমুক অমুক জরুরী প্রকল্প কার্যকর হচ্ছে না; যার ফলে রাজ্যের সার্বিক অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হচ্ছে', কিংবা 'কোন রাজ্যের প্রধান কৃষি পণ্যের বিক্রয় মূল্য কয়েক

দফায় বাড়ানো হলেও অন্যত্র তা হচ্ছে না এবং বিশেষ কয়েকটি রাজ্যের স্বার্থে শুধু পণ্যমূল্য নয়, রেল মাশুলেও তারতম্য ঘটানো হচ্ছে', অথবা 'খরা, বন্যা প্রভৃতি একই প্রকার দুর্যোগে কোন রাজ্য সাহায্য পাচ্ছে একশ' কোটি টাকা, কোনটি পাঁচ-দশ কোটি, আবার কোনটি বা শুধুই উপদেশ, আশ্বাস বা যৎকিঞ্চিৎ করুণা', —তখন তাকে কী বলা হবে? এই বক্তাদের সকলেই গণনির্বাচিত, একই দলভুক্ত এবং যথেষ্ট দায়িত্বশীল পদে আসীন, কাজেই ধরে নিতে হবে, হয় এঁদের বক্তব্যই সত্য অর্থাৎ, কেন্দ্র সত্যই রাজ্য বিশেষের স্বার্থে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন, যা সার্বিক সংহতির পরিপন্থী, অথবা এই সব বক্তারাই সঠিক তথ্য দেন না, নিজেদের অযোগ্যতা চাপা দিতে কেন্দ্রের উপর দোষারোপ করেন। এর যেকোন একটিকে অবশ্যই সত্য হতে হবে। যুক্তিধর্মে না হয়ে উপায় নেই। অথচ এটা দীর্ঘকাল একই ভাবে চলেছে এবং সমগ্র গণদের নামে আংশিক গণদের একটি দলতন্ত্র বলেই স্বপদে থাকার ঐক্যমতটাও গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে পারছে। যে-ঐক্য প্রকৃত জনগণতন্ত্র হলে থাকত না ঠিক, কিন্তু সেক্ষেত্রে এমন ঐক্যের প্রয়োজনও পড়তো না। অযোগ্যতা কিংবা প্রাপ্ত ক্ষমতার পক্ষপাত করুণা এর একটিকেও জনগণ বরদাস্ত করতো না। সত্য যার বিরুদ্ধেই যাক তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই সরে যেতে হোত। দেশ ও জাতির পক্ষে মঙ্গলকর বলেই এ-ব্যবস্থা মেনে নিতে হোত।

তবে এত কথায় যাবার ধৈর্য্য বিশেষ কারো থাকে না। আর আজ এ-ধৈর্য্য আরও কমেছে, তাই অনেকে সোজাসুজিই প্রশ্ন তুলেছেন 'তা হলে সামন্ততন্ত্রই বা অযৌক্তিক হবে কেন? কারণ সেখানেও ত একদল মানুষ তাঁদের মর্জি মতই সমগ্র দেশবাসীর উপর কর্তৃত্ব করেছেন, প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ তাদের শ্রমরসে বাকী ২০ ভাগ মানুষকে পুষ্ট করতে বাধ্য হয়েছেন, আর আজও যদি অনেকটা সেই অবস্থাই চলতে পারে তবে কেবল একটি 'তন্ত্র' নিয়ে মাতামাতি বা এরই পবিত্রতা নিয়ে এত মায়াকান্না, আসলে ব্যাপারটি কী?'

এ-প্রশ্নের উত্তরও অবশ্য জনগণরেই একটি অংশ দিচ্ছেন। তাঁরা

বলছেন, সেদিন যাঁরা ওই সমাজতন্ত্রকেই ঈশ্বরের অবদান জ্ঞানে ধূপ ধূনা, যাগযজ্ঞে পবিত্র করেছিলেন আজ হয়ত তাঁরাই এসে এই দলীয়তন্ত্রকে গণতন্ত্রের নামাবলি পরিয়ে অতি পবিত্র এক সামগ্রী করে তুলেছেন। অথচ যুক্তির সামনে কোন তন্ত্র বা বিধানই বোধ হয় ততটা পবিত্র নয়, যতটা সর্বসাধারণের কল্যাণ। যে-তন্ত্র বা বিধানে মুষ্টিমেয় মানুষ সার্বিক মানুষের উপর নেতৃত্ব নয়, কেবল কর্তৃত্ব করাকেই মুখ্য অধিকারে পরিণত করতে পারেন, বহুর রস নিংড়ে নিয়ে মাত্র কয়েকজন স্ফীত হওয়ার সুযোগ পায়, ক্ষুদ্র একদল গণ কোটি কোটি গণর জীবনযাত্রা অচল করতে পারেন, সদর রাস্তায় বা স্টেশন চত্বরে দাঁড়িয়ে সরকারী কর্মচারী আইন বহির্ভূত কাজ করছেন দেখেও জনগণের প্রতিবাদ করার সুযোগ থাকে না, ভেজাল, কালোবাজার প্রভৃতি জঘন্য অপরাধ প্রতিরোধেও জনগণের সঠিক আইনসিদ্ধ এক্তিয়ার থাকে না, সেটা আর যাই হোক ন্যায়ের দরবারে 'জনগণতন্ত্র' বলে আত্মপরিচয় দিতে পারে না, আর এরই পবিত্রতা নিয়ে কিছু মানুষ প্রচুর গলাবাজি করলেও সাধারণ মানুষের শঙ্কা তাতে দূর হয় না।

কিছুদিন পূর্বের একটি সংবাদে দেখেছি, ব্লিৎস্ সম্পাদক শ্রী আর, কে, করঞ্জিয়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলছেন, 'দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজ আরও সহজ এবং দ্রুতগতিতে এগোতে পারে যদি তিনি কোন রকম বাধা না পেয়ে নিজের মনে কাজ করতে পারেন।' (আনন্দবাজার ১২-৪-৭৩) অত্যন্ত রূঢ় একটি সত্য হঠাৎই বোধ হয় স্পষ্ট প্রকাশ পেয়ে গেল। যদিও বাধাটা যে ঠিক কোথায় সে-সংবাদ শ্রীমতি গান্ধী দেননি। সেটা সম্ভবত তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়। এ-ক্ষেত্রে বোধ হয় কারো তা হয় না। কারণ দলতান্ত্রিক বা আমলানির্ভর সমাজের মহিমাই এই যে, রাষ্ট্রের অতি শক্তিধর সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিকেও মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে দল ও আমলা কুলের মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক হতে হয়। আর শ্রীমতি গান্ধী যে তাঁর বাধার প্রকৃত ক্ষেত্র বা সঠিক বাধাদানকারীদের চিহ্নিত করা থেকে বিরত থেকেছেন

তার মূল কারণও হয়ত এই সতর্কতা। অথচ তিনি খুব ভাল করেই জানেন, এ দেশের ৫৫ কোটি অধিবাসীর ভিতর অন্তত ৫০ কোটি মানুষই তাঁর সমর্থক, অনুগামী এবং সঠিক উদ্দেশ্যে ডাক দিলে এরা সর্বশক্তি নিয়েই তাঁর পিছনে দাঁড়াবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষা-শেষে আকাঙ্ক্ষিত নেতৃত্বের সাক্ষাৎ যে এরা পেয়েছে এবং বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের সফল সমাপ্তি সেই নেতৃত্বকে ভারত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম নেতৃত্বের সম্মান দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি এ সংবাদও তাঁর অজানা নয়। তিনি আরও জানেন, দেশের প্রায় ৯০ ভাগ ছাত্র ও যুব শক্তি ভবিষ্যতের সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তাঁর পিছনে আজ দণ্ডায়মান। যা একদিন মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বানেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সব কিছু জানার পরও যে তাঁর বক্তব্যে কিছুটা অসহায়তার সুরই ধ্বনিত হোল তার একমাত্র কারণ বোধহয় সমগ্র ছাত্র, যুবক এবং দেশের ৯০ ভাগ মানুষের সমগ্র শক্তি পিছনে থাকলেও সে-শক্তিকে কাজে লাগাবার বা সেই বিরাট শক্তির উপর নির্ভর করার সুযোগ এ-সমাজে অত্যন্ত সীমিত। আর এখানেই ব্যক্তি, শ্রেণী বা দল-তন্ত্রের সঙ্গে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রভেদ। ভিতরে কায়েমী স্বার্থের এক সুদৃঢ় বাধার প্রাচীর থাকে তাই নেতৃত্ব সঠিক হলেও এখানে থেকে গণশক্তিকে কাজে লাগাতে পারে না। আবার গণশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় সহযোগিতায় এগিয়ে এলেও ওই নেতৃত্বের সান্নিধ্যে যেতে পারে না।

তবে এসব তথ্যে নতুন কিছু নেই। আজকের চেতনাশীল মানুষের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণও নয়। কারণ ব্যক্ত ঘটনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ত পরিস্ফুট হয়ে এই সব কিছুরই আত্মিক সত্ত্বাকে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত করেছে। কাজেই আজকের প্রশ্ন, এই সামাজিক অবস্থাটা আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা? এবং যদি তা না হয় তবে এখনই এর অবসান সঙ্গত কিনা? আর সব শেষে সকল চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিকের কাছে সাধারণ মানুষের স্পষ্ট আর সরাসরি প্রশ্ন, মোট জন সংখ্যার ২ থেকে ৫

ভাগের বেশী মানুষ ত কোন দেশেই প্রসাশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় এবং এর ভিতরও খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই থাকেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী, সুতরাং কেবলমাত্র এঁদেরই জিম্মায় সমগ্র দেশের ন্যায় রক্ষা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এমন কি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কর্তৃত্ব ন্যস্ত রেখে বাকী ৯৫ থেকে ৯৮ ভাগ মানুষকে দূরে রাখলে সে-ক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য ফললাভ সম্ভব কিনা? কারণ 'জনসাধারণ' নামে যে প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ পৃথিবীতে বাস করে তাদের এই ধারণাটা ক্রমেই সুদৃঢ় হচ্ছে যে, সমাজে যত সমস্যা, যত অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, হিংসা এবং শ্রেণীবিশেষকে পুষ্ট করতে বাকী মানুষের শ্রমফল নিয়োগ, এই সব কিছুই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ওই প্রশ্নটির সঙ্গে। আর এ ধারণাও এদের স্পষ্ট হয়েছে, ওই প্রশ্নের যুক্তিসিদ্ধ সঠিক উত্তর দিতে হলে যে সামাজিক বিধি-বিধান অপরিহার্য হয় তার সাক্ষাৎ পেলে মাত্র ৫ থেকে ১০ বছরের ভিতর পৃথিবী থেকে সমগ্র বেকার দশা মুছে যাবে, মানুষের শ্রম অপচয়ের প্রয়োজন অনাবশ্যক হবে এবং প্রতিটি মানুয়ের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি যাবতীয় চাহিদা মিটেও উৎপাদন এমন এক স্তরে উন্নীত হবে, যেখানে এলে মানুষের অন্যায়, অবিচার, অবিশ্বাস ও হিংসার প্রবৃত্তিটাই স্তব্ধ হয়ে যায়।

সম্ভবতঃ শ্রীমতী গান্ধীর মনেও ঠিক এমনই একটি প্রশ্ন, এমনই সম্ভাবনাময় চিত্র কেবল উঁকি দেওয়া নয়, হয়ত ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকবে যার ফলে ব্লিৎস সম্পাদক সহজেই তাঁর ওই অতিমূল্যবান মন্তব্যটি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তাঁর বহু কথা ও কাজে ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের যে-সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে তা থেকেই এ-ধারণা অনেকের জেগেছে। ইতিহাসের এ এক অবশ্যম্ভাবী সন্ধিক্ষণও বটে। মানবজাতি জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিবিদ্যায় এমন এক স্থানে আজ উপনীত যেখানে পুরাতন ধ্যানধারণা শুধু নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিধিবিধানগুলির দ্রুত রূপান্তর অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যেমন একজন চোরের পিছনে পিছনে পাঁচজন পুলিশ

ছোটেন, হয়ত চোরকেও ধরেন কিন্তু চুরি তাতে বন্ধ হয় না। ফলে পুলিশের সংখ্যা বাড়ে এবং এঁদের উৎপাদনহীন শ্রম আর অপরের শ্রমফলে এঁদের প্রতিপালন করতে যেয়ে গোটা সমাজই দুর্বল হয়। কাজেই অর্থ চিন্তা নয়, চাই এই চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্ত করা। আর একজন শক্তিশালী রাষ্ট্রনায়ককে অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে সেই অবশ্যম্ভাবী রূপান্তরকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

মানুষ মাত্রই জানে, তার অর্জিত সম্পদ কিছু সঞ্চিত থাকলে তবেই তার এবং বংশধরদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়। আর সঞ্চয় যত বাড়ে স্বাচ্ছন্দ্যও তত বাড়ে। এটা ব্যক্তিজীবনের কথা। কিন্তু রাষ্ট্রজীবনেও ত এ কথাই সত্য। কারণ কেউ ত রাষ্ট্রের বাইরে নয়। যা আমি নিচ্ছি বা নেব তা থেকে অবশ্যই কিছু বেশী দিতে হবে। ব্যক্তিজীবনে ব্যয় থেকে আয় বেশী না হলে যেমন সঞ্চয় হয় না, রাষ্ট্রের বেলায়ও নেওয়া থেকে দেওয়া বেশী না হলে রাষ্ট্রের দেবার সঙ্গতি জন্মে না। আর রাষ্ট্রের কিছু দেবার সঙ্গতি যদি না জন্মে তবে আমার বা আমার বংশধরদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে কি করে? কিন্তু নেওয়া থেকে বেশী দেবার এই যে চেতনা অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে শোষণ না করে পুষ্ট বা সমৃদ্ধ করার ধারণা, এ কেবল তখনই স্থায়ী হতে পারে এবং মনকে সক্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে, যখন কারো দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে তাঁর ভবিষ্যৎটা সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু কর্তৃত্ব না থাকলে এ-বোধ কারো জাগলেও তা মূল্যবান হয় না। বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই কর্তৃত্ব অবশ্যই অপরিহার্য। সকলকে অর্থনৈতিক কর্তৃত্বে অংশীদার না করে একজনকেও পার্থিব জীবনের হাহাকার থেকে মুক্ত করা যাবে না। আর এই হাহাকার থেকে মুক্ত না হলে মানবজাতি আরও বৃহত্তর সম্ভাবনার দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতেও পারবে না। সাধু-সন্ত বা মুনি-ঋষিরা ভিন্ন অর্থে এই হাহাকার থেকে মুক্তির পথ বাৎলেছেন ঠিক, কিন্তু আর সব বাদ দিতে পারলেও উদরের চাহিদা তাঁরাও অস্বীকার করতে পারেন নি। ভক্তগণ এর দায়িত্ব না নিলে তাঁদের নিজেদেরই কিছু তৎপর হতে হোত। সুতরাং সংসারী মানুষের কাছে ও পথ মোটেই মূল্যবান নয়।

আমি জানি, আমার লেখনী দুর্বল। যা বলতে চেয়েছি তার সবটুকু ব্যক্ত হয়নি। আর যা-ও বা হয়েছে তারও সবটা স্পষ্ট হয়নি। পরন্তু, যে-শব্দ সমষ্টি একত্র হলে মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার তুলতে পারে, সেখানে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে সঠিক তথ্য সন্ধানে আকৃষ্ট ও সংকল্পে সুদৃঢ় করতে পারে আমি তারও কিছুমাত্র সমাবেশ ঘটাতে পারিনি। এর উপরও ত আছে পারিপার্শ্বিকতা। আছে সংস্কার। যার প্রভাব কাটিয়ে বের হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই বিশ্বাসই আমাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে; সত্য দুর্বল কণ্ঠে উচ্চারিত হলেও তার নিজস্ব শক্তি ক্ষুণ্ণ হয় না। মানুষের চিনে নিতেও কষ্ট হয় না। আর এও আমি বিশ্বাস করি, আজ হোক দু-দিন বাদে হোক, কিংবা আরো দীর্ঘকালের অবিচারের দহন থেকে হোক, সমগ্র মানবজাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের তাগিদে একদিন রাজনীতির নাগপাশমুক্ত মানুষকে হতেই হবে। যে কয়েকজন, কয়েকশ' অথবা কয়েক হাজার রাজনীতিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে হাতিয়ার করে পৃথিবীর প্রায় ৪শ' কোটি মানুষকে তাঁদের আজ্ঞাবহ করে রেখেছেন, অনবরত জীববিশেষের মত যথেচ্ছা তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন, কখনও বা এঁদেরই কেউ এক বিপুল সংখ্যক মানুষকে গিনিপিগের মত ব্যবহার করেও আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ পাচ্ছেন, মানুষকে একদিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই এর অবসান চাইতে হবে। 'তন্ত্র' নামক এক একটি মায়ামৃগ শিখণ্ডী করে যেসব রাজনীতিক মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগকে নিয়ত নানা প্রলোভনে বা নানা সমস্যায় জড়িয়ে রাখছেন, তাদের মনীষা, কর্মশক্তি আর জীবনী শক্তিকেও থেতলে দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার রসদ কুড়াচ্ছেন, একদিন ওই সমগ্র মানুষকে মেরুদণ্ড সোজা করে বজ্রকঠিন দীপ্ত কণ্ঠে বলতেই হবে 'অনেক হয়েছে, আর নয়; শক্তি থাকে নেতৃত্ব দিন কিন্তু কর্তৃত্ব, সে ভাল করার যুক্তিতে হলেও, নিষ্কৃতি চাই।' সম্বিৎ ফিরে এলে একথা একদিন অবশিষ্ট মানুষকে বলতেই হবে।

এ আমার অনুমানমাত্র নয়, কামনার বিলাসও এ নয়, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ঘটনার সঠিক মূল্যায়ন শেষে সত্য উপলব্ধি। আর

যে-মূর্তি আজ আবছা হয়ে রইলো, উপযুক্ত শিল্পীর তুলির স্পর্শে তা স্পষ্ট হলে প্রতিটি যুক্তিবাদী ও স্বাধীনচেতা মানুষই এই সমাজ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হবেন এতেও আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

কোন শিল্পী আজই হয়ত আসবেন না। ডাকলেও কেউ হয়ত সাড়া দেবেন না। আর পরেও যে কোন শিল্পী তাঁর স্বকীয় শিল্প সৃষ্টির প্রেরণায় কিংবা করুণায় বিগলিত হয়ে এর উপর তুলি বুলাবেন তাও হয়ত নয়। শিল্পীকে আসতে হবে যে-দহনকার্য সমাজে চলেছে এবং আরও বহুজনের সঙ্গে ওই শিল্পীকেও দগ্ধ করছে, তাকেই নিভাবার তাগিদে। চরম ঝুঁকি নিয়েও সেদিন এই নতুন সমাজ পত্তনের পথ তাঁকে স্পষ্ট করে দিতেই হবে।